মিখাইল লেরমন্তভ

আমাদের সময়কার নায়ক



ম. লেরমন্তভ আমাদের সময়কার নায়ক

মিখাইল লেরমন্তভ

আমাদের সময়কার নায়ক

বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষের দিকে রাশিয়ায় আবির্ভাব ঘটল এমন একটি গ্রন্থের যার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল কেবল তার সমসাময়িকদের উপর নয়, পরবর্তী বহু প্রজন্মের জীবনেও অনপনেয় ছাপ ফেলার। গ্রন্থটি ছিল অপূর্ব রুশ কবি মিখাইল লেরমন্তভ (১৮১৪-১৮৪১) রচিত উপন্যাস 'আমাদের সময়কার নায়ক'।

উপন্যাসের নায়ক — রুশ ককেশাস সেনাবাহিনীর অফিসার পেচোরিন। অসাধারণ বুদ্ধিমান, প্রতিভাদীপ্ত, সুশিক্ষিত এই মানুষটিকে সারা গ্রন্থ জুড়ে দেখতে পাওয়া যায় নিঃসঙ্গতার ভারে পীড়িত; বন্ধুত্বের আনন্দ, প্রেমের সুখ তার জানা ছিল না, তার মন অবিশ্বাস, মোহভঙ্গ ও একঘেয়েমির গুরুভারে জর্জরিত। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বরে জারতন্ত্র যখন অভিজাত বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান দমন করে এবং তখনকার কালের রাশিয়ার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাণসংহার করে তারই অব্যবহিত পরে যে বদ্ধাবস্থার সংকটযুগ সূচিত হয় এই মানুষটির ট্র্যাজিক ভাগ্য তাঁরই ফল।

লেরমন্তভের এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশের পর শতবর্ষেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। রুশ ভাষায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির ভাষায় কোটি কোটি কপিতে এর বিপুল সংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন লেরমন্তভের রচনার বিখ্যাত গবেষক ইরাক্লি আন্দ্রোনিকভ।

ISBN 5-05-000492-6

গভীর ও মহাশক্তিধর আত্মা! কী সত্য দৃষ্টিতে না তিনি দেখেছেন শিল্পকে, কী গভীর ও নির্ভেজাল প্রত্যক্ষ রুচিবোধ সুন্দরের প্রতি...। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করি এবং জীবন ও মানুষের প্রতি তাঁর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, আবেগশূন্য, নির্মম দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ঐ দুয়েরই সদগুণে গভীর বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি।

ভিস্‌সারিওন বেলিন্‌স্কি

১৪ ডিসেম্বরে অংশগ্রহণ করার পক্ষে আমরা সকলে ছিলাম নেহাৎই তরুণ। এই মহান দিনটিতে জাগ্রত হয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম কেবল প্রাণদণ্ড আর নির্বাসন। বাধ্য হয়ে নীরব থেকে, অশ্রু সংবরণ করে আমরা আপনাতে ডুবে থেকে নিজেদের ভাবনাচিন্তা প্রতিপালন করতে শিখলাম — আর কী সেই ভাবনাচিন্তা! তখন তা আর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত উদারতন্ত্রের ভাবধারা, প্রগতির ভাবধারা হয়ে রইল না — হল সন্দেহ, অস্বীকৃতি, ক্ষিপ্ততায় পরিপূর্ণ ভাবনাচিন্তা...। লেরমন্তভ একান্তরূপে আমাদের প্রজন্মভুক্ত।

আলেক্সান্দর গের্ৎসেন

মিখাইল লেরমন্তভ

আমাদের সময়কার নায়ক



'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো

অনুবাদ: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অঙ্গসজ্জা: গালিনা ইউরচেন্‌কো

সম্পাদনা: অরুণ সোম

Михаил Лермонтов

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

На языке бенгали

M. Lermontov

A HERO OF OUR TIME

In Bengali

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · মুখবন্ধ · টীকাটিপ্পনী ·
'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Л $\frac{4702010100—257}{031(05)—85}$ 257—83

ISBN 5-05-000492-6

সূচি

মিখাইল লেরমন্তভের
'আমাদের সময়কার নায়ক' উপন্যাস প্রসঙ্গে

১৮৪০ সালের মে মাসে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের বইয়ের দোকানগুলিতে 'আমাদের সময়কার নায়ক' নামে একটি বই আত্মপ্রকাশ করে। লেখক ছিলেন মিখাইল লেরমন্তভ নামে ২৫ বছরের এক কবি, যাঁর আশ্চর্য কবিতাগুলি ইতিমধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করে তাঁকে প্রসিদ্ধ করেছিল।

নতুন বইটি অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিক্রি হচ্ছিল। প্রত্যেকেই সেই চরিত্রটির উপর কৌতূহলী ছিল যেটি লেখকের মতে তৎকালীন সময়কার নায়ক অর্থাৎ যাকে নায়কের আদর্শ বলে অনুকরণ করা হয়...। উপন্যাসের নামটাই দারুণ কৌতূহল উদ্রেক করেছিল।

উপন্যাসটির বিন্যাস ছিল অদ্ভুত ধরনের: সেটি ছিল পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। তাদের মধ্যে তিনটি ইতিপূর্বে 'অতেচেস্ত্‌ভেন্নীয়ে জাপিস্কি' নামে প্রগতিশীল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলিকে আলাদা করে পড়ার সময় কেউ অনুমান করে নি যে সেগুলি ছিল একটি সমগ্র উপন্যাসের অংশ। সব গল্পগুলিতেই ছিল একই প্রধান চরিত্র: পেচোরিন নামে এক অফিসার, যে ককেশাসের সৈন্যদলে নির্বাসিত হয়েছিল।

'বেলা', 'মাক্সিম মাক্সিমীচ', 'তামান', 'রাজকুমারী মেরি', 'অদৃষ্টবাদী' নামে উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজানো হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের যে ঘটনাবলী লেরমন্তভ বিবৃত করেছেন সেগুলি প্রথম খণ্ডের আগে ঘটেছে। ধারাবাহিকভাবে সাজালে তারা নিম্নোক্ত চিত্র দেয়: ১) গন্তব্যস্থান ককেশাসে যাবার পথে পেচোরিন তামানে থামে ('তামান')। ২) এক সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করার পর পেচোরিন এক স্বাস্থ্যকর স্থানে যায়; পিয়াতিগোর্স্কে ও কিস্‌লভোদ্‌স্কে থাকে এবং ডুয়েলে গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে

হত্যা করে ('রাজকুমারী মেরি')। ৩) উক্ত ডুয়েলের শাস্তি হিসেবে পেচোরিনকে বদলি করা হয় 'ককেশাস সীমানা' বাহিনীর বাঁ পাশের এক দুর্গে, যেটি ক্যাপ্টেন মাক্সিম মাক্সিমীচের প্রভুত্বে ছিল ('বেলা')। ৪) দুর্গ থেকে পক্ষকালের জন্য পেচোরিন এক কসাক গ্রামে যায় এবং ভুলিচের সঙ্গে বাজি ধরে ('অদৃষ্টবাদী')। ৫) ৫ বছর পরে পারস্যে যাবার পথে ভ্লাদিকাভ্‌কাজে ইতিমধ্যে অবসরপ্রাপ্ত পেচোরিনের সঙ্গে মাক্সিম মাক্সিমীচের সাক্ষাৎ হয় ('মাক্সিম মাক্সিমীচ')। ৬) পারস্য থেকে ফেরার পথে পেচোরিনের মৃত্যু হয় ('পেচোরিনের ডায়েরির' মুখবন্ধ)।

গল্পগুলির ধারাবাহিকতা ত্যাগ করে লেরমন্তভ পেচোরিনকে প্রথম উপস্থিত করেন এক ভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষ হিসেবে — এক বিনয়ী ক্যাপ্টেন তাকে যে-রকম দেখেছিলেন; পরের গল্পে ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক স্বয়ং পেচোরিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বর্ণনা করেন। তারপর পাঠকদের বলা হয় পেচোরিনের মৃত্যুর কথা এবং তাঁরা জানতে পারেন তার ডায়েরির বিষয়বস্তু। এইভাবে নায়কের বহুমুখী এবং পরস্পর-বিরোধী চরিত্র প্রকাশিত হয়।

পেচোরিন বুদ্ধিমান, উচ্চ-শিক্ষিত পর্যবেক্ষণশীল মানুষ। সে তরুণ, সুদর্শন এবং ধনী কিন্তু তার জীবনযাত্রা উদ্দেশ্যহীন, পৃথিবীর সবকিছু সম্বন্ধেই সে উদাসীন। প্রেম কিংবা বন্ধুত্ব — কিছুই তাকে আনন্দ দেয় না। তার জীবনের সবচেয়ে ভালো দিনগুলো সে নিষ্ক্রিয়তায় কাটিয়েছে। তার অন্তর্নিহিত বিরাট ক্ষমতাগুলির মৃত্যু ঘটে কাজে না লেগে। তার মহৎ কাজের স্বপ্নগুলি নিষ্ফল। সে নিঃসঙ্গ এবং অসুখী। অদৃষ্টক্রমে যে-সব মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয় তাদের জীবনে সে নিয়ে আসে সর্বনাশ বা দুঃখকষ্ট।

কোন অসুখ অমন অসময়ে পেচোরিনের বার্ধক্য এনেছিল? কেন সে যে-সব মহৎ কাজের স্বপ্ন দেখত সেগুলিকে সম্পন্ন করতে পারে নি? কেন তার বিরাট ক্ষমতাগুলির মৃত্যু হয় কাজে না লেগে? কেন সে চেষ্টা না করে আলস্যের মধ্যে তার জীবনকে তিল-তিল করে ক্ষয় করেছিল এবং কেন তার জীবন কেটেছিল বিনা সংগ্রামে?

কারণ হল এই যে তৎকালীন প্রথম নিকোলাইয়ের রাজত্বে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল সময়ের মধ্যে সে কোনো উদ্দেশ্য কিংবা সেই সংগ্রামের কোনো সম্ভাবনাকে দেখতে পায় নি। বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী আলেক্সান্দর

গের্ৎসেনের চিত্রোপম উক্তি অনুসারে তার সাবালকত্ব প্রাপ্তি সেই একই ঘণ্টাধ্বনি ঘোষিত করেছিল যে-ঘণ্টাধ্বনি রাশিয়ায় ঘোষণা করেছিল ডিসেম্ব্রিস্ট দলের পেস্তেল এবং তাঁর বন্ধুদের ফাঁসি এবং প্রথম নিকোলাইয়ের রাজ্যাভিষেকের কথা। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বরের একটি দিনে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের সেনাৎস্কায়া স্কোয়ারে এক সামরিক বিদ্রোহকে দমন করা হয়। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বিপ্লবী কয়েকজন সৎ রুশ স্বদেশপ্রেমিক দ্বারা এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল। সেই দিনে স্বাধীনতাকামী তৎকালীন যুগের যুবকদের আশা ধূলিসাৎ করা হয়েছিল। যারা ছিল পেচোরিনের বয়সী উক্ত ষড়যন্ত্রে যোগ দেবার পক্ষে তাদের বয়স ছিল নিতান্ত কম। পরবর্তী ১০ বছরে তাদের 'বয়স বাড়তে পারে নি, কিন্তু তাদের জীবনীশক্তি হয়েছিল লুপ্ত; উদাসীন, কাপুরুষ, দাসভাবাপন্ন সমাজের মধ্যে তারা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিল,' গের্ৎসেন লিখেছিলেন।

একদা লক্ষ-লক্ষ মানুষের লজ্জাকর দাসত্বের চিন্তায় পেচোরিন দুঃখ পেত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে হৃদয়ের গভীরে তার সর্বোৎকৃষ্ট আবেগগুলিকে কবর দিয়েছিল এবং অন্য লোকদের দুঃখকষ্টে অবিচলিত থাকতে শিখেছিল। প্রথমে কোনো কিছুকে পরিবর্তন করার নিজের অক্ষমতার জন্যে সে হতাশ হয়েছিল, তারপর ধীরে-ধীরে নিজেকে সে শিখিয়েছিল কোনো কিছুর উপর আস্থা না রাখতে, কিছুই আশা না করতে। এইভাবে তার নিজের কথায়, সে হয়ে উঠেছিল আধ্যাত্মিক পঙ্গু ব্যক্তি। এবং এই আধ্যাত্মিক পঙ্গু ব্যক্তিকে লেরমন্তভ বিবেচনা করেছিলেন তাঁর সময়কার নায়ক বলে।

'কিন্তু বাস্তবিকই কি সে নায়ক?' পাঠকরা বিস্মিত হয়েছিলেন। 'এটা হল তিক্ত বিদ্রূপ!'

উপন্যাসের মুখবন্ধে লেরমন্তভ উত্তর দিয়েছেন: ''আমাদের সময়কার নায়ক'... একটি চিত্র, কিন্তু একটি মানুষের নয়; আমাদের যুগের পাপের পূর্ণ প্রকাশ নিয়ে এই চিত্র সৃষ্ট হয়েছে।'

পাঠকরা তাই বোঝে: পেচোরিন হল সেই যুগের নায়ক নিকোলাইয়ের রাজত্বকালে যে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল, তার প্রকৃতির জন্যে তার উপর দোষারোপ করা যায় না। মন্দটা তার নিজের মধ্যে কিংবা তার প্রকৃতির মধ্যে ছিল না, ছিল জারের আমলের একনায়কত্বের মধ্যে, ভূমিদাস প্রথার জন্য যে-অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে। উক্ত যুগের প্রপঞ্চ হিসেবে

পেচোরিনের ‘আত্মার কাহিনীকে’ লেরমন্তভ উপস্থিত করেছিলেন। ‘আমাদের সময়কার নায়ক’ হল একাধারে মনস্তত্ত্বমূলক ও সামাজিক উপন্যাস।

লেরমন্তভের উপর আবার কুনজর যখন পড়েছিল ঠিক সেই সময়েই ‘আমাদের সময়কার নায়ক’ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয়বার তাঁকে ককেশাসে যখন নির্বাসিত করা হয়, তখন সেখানে এক নিষ্ঠুর ও নিরতিশয় ক্লান্তিকর যুদ্ধ চলছিল (প্রথমে ১৮৩৭ সালে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন পুশ্‌কিনকে উৎসর্গীকৃত ‘কবির মৃত্যু’ নামক কবিতার জন্যে)। লেরমন্তভের স্বাধীন আচরণ, অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব এবং তাঁর রচনার মূল তাৎপর্যের জন্যে — যে-রচনা তৎকালীন সমাজের নানা পাপকে নির্ভীক এবং গভীর ক্রোধের সঙ্গে নিন্দা করেছিল, যে রচনায় ছিল স্বাধীনতা ও সংগ্রামের উৎসাহ — প্রথম নিকোলাই এবং তাঁর সভাসদদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। ১৮৪০ সালের গোড়ার দিকে লেরমন্তভের শত্রুরা তাঁকে এক ডুয়েলের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছিল। সে-কারণে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। নির্বাসন থেকে লেরমন্তভ ফিরে আসেন নি: ১৮৪১ সালের ২৭ শে জুলাই প্রায় ২৭ বছর বয়সে এক ডুয়েলে তিনি নিহত হন।

লেরমন্তভ এবং তাঁর উপন্যাসকে অপবাদ দেবার চেষ্টা করার প্রত্যুত্তরে বিখ্যাত গণতন্ত্রী সমালোচক ভিস্‌সারিওন বেলিন্‌স্কি পেচোরিন সম্বন্ধে লিখেছিলেন: ‘কোনো-কোনো কড়া নীতিবাগীশ হয়ত সমবেতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠছেন: নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর, দুরাত্মা, এক দানব বিশেষ!..’ হ্যাঁ, আপনারা একেবারে খাঁটি কথাই বলেছেন। কিন্তু এ-কারণেই কি আপনারা এ-ধরনের সোরগোল তুলেছেন? এ-কারণেই কি বাস্তবিক আপনারা ক্রুদ্ধ হয়েছেন? তার পাপের জন্যে তাকে আপনারা অভিশাপ দিচ্ছেন না — কারণ তার চেয়েও আপনারা নিজেরা বেশী পাপী আর আপনাদের পাপ হল আরো বেশী সাংঘাতিক এবং আরো বেশী নোংরা — অভিশাপ দিচ্ছেন যে দুঃসাহসী স্বাতন্ত্র্য ও তিক্ত স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে সে তাদের সম্বন্ধে বলেছে বলে...’ রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী সমালোচক উপন্যাসটিকে মনে করেছিলেন স্বাধীন চিন্তার এক অসাধারণ অভিব্যক্তি বলে এবং পেচোরিনের চরিত্রকে মনে করেছিলেন সুদূরব্যাপী সামাজিক প্রপঞ্চের এক প্রতিচ্ছবি; সমগ্র যুগের আধ্যাত্মিক অসুস্থতার প্রতিমূর্তি বলে।

পেচোরিন ছিল এক মধ্যবর্তী যুগের নায়ক: ডিসেম্ব্রিস্টদের বিদ্রোহের

পর সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পরবর্তী বিপ্লবী যুগের পূর্বেই তার মৃত্যু হয়, যখন রাশিয়ার সামাজিক জীবনে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা উপস্থিত হন। ঠিক এই কথাই বেলিন্‌স্কি বলতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন পেচোরিনের আধ্যাত্মিক সত্তার ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের কথা, 'যখন পুরাতন আদর্শের হয়েছে ধ্বংস এবং নতুন আদর্শ যখন পর্যন্ত আকার গ্রহণ করে নি, যার ফলে ভবিষ্যতে মানুষের বাস্তব ধরনের কিছু একটা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে এবং বর্তমানে যে থাকে একেবারে ছায়ার মতো'।

পেচোরিন নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিল এবং সেটাকে সে পাবে ভেবেছিল সেই ঘৃণ্য অভিজাত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে, সেই লোকদের সঙ্গে বিচ্ছেদের মধ্যে, যারা তার চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। নিজের খোলসের মধ্যে নিজেকে সে বন্দী করে রেখেছিল এবং তার মৃত্যু হয় বিষাদময় নিঃসঙ্গতায়। বিরূপ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যুদ্ধ করার তার কোনো হাতিয়ার নেই।

লেরমন্তভের সে-ধরনের হাতিয়ার ছিল: তা হল তাঁর কাব্য।

ই. আন্দ্রোনিকভ

যে কোনো বইয়ের মুখবন্ধ হল তার প্রথম আর শেষ কথা। হয় তাতে বইয়ের উদ্দেশ্যের কথা থাকে নয় সেটা তার সমালোচকদের কাছে লেখকের কৈফিয়ৎ ও জবাব হয়। সাধারণত কিন্তু পাঠকরা বইয়ের নৈতিক উপদেশ কিংবা তার উপর পত্রপত্রিকার আক্রমণ—কিছুই গ্রাহ্য করেন না। তাই তাঁরা মুখবন্ধ পড়েন না। তবু ব্যাপারটা এরকম হওয়া দুঃখের কথা, বিশেষত আমাদের দেশে। আমাদের জনসাধারণ এখনও এত অপরিণত ও সরল-হৃদয় যে তাঁরা উপকথার শেষে কোনো নৈতিক উপদেশ না থাকলে তা বুঝতে পারেন না। তাঁরা ঠাট্টা ধরতে পারেন না, শ্লেষ বুঝতে পারেন না। তাঁদের খারাপভাবে মানুষ করা হয়েছে। এখনও তাঁরা জানেন না যে সুস্পষ্ট নিন্দা বা ভর্ৎসনার স্থান সম্ভ্রান্ত সমাজে কিংবা সম্ভ্রান্ত পুস্তকে নেই; তাঁরা জানেন না যে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা তার চেয়ে ধারালো, প্রায় অদৃশ্য অথচ মারাত্মক এক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, যেটি চাটুকারিতার ছদ্মবেশে এমনভাবে আঘাত হানে যা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, যাকে কখনও ঠেকানো যায় না। আমাদের জনসাধারণ সেই গ্রাম্য লোকের মতো, যে পরস্পরবিরোধী দুই দেশের দুই কূটনীতিজ্ঞের আলাপ লুকিয়ে শুনে এই ধারণায় উপনীত হয় যে তাঁরা প্রত্যেকেই পারস্পরিক মধুর বন্ধুত্বের জন্য নিজেদের সরকারকে ঠকাচ্ছেন।

কয়েকজন পাঠক, এমন কি কয়েকটি পত্রিকা বর্তমান পুস্তকটিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করায় তাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। কেউ-কেউ সত্যিকারের ভয়ংকর চটেছিলেন 'আমাদের সময়কার নায়কের' মতো এমন একটি নীতিজ্ঞানহীন মানুষকে আদর্শ হিসেবে উপস্থিত করায়। অন্যেরা সূক্ষ্মভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে লেখক নিজের এবং তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের চিত্র এঁকেছেন... বস্তাপচা আর দুর্বল রসিকতা! কিন্তু স্পষ্টই

রাশিয়া এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছে যে অন্যান্য সবদিক দিয়ে তার যতই উন্নতি হোক না কেন এ-ধরনের নির্বুদ্ধিতাকে সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। আমাদের দেশে সবচেয়ে আজগুবি রূপকথারও এই সমালোচনা থেকে পরিত্রাণ পাবার প্রায় আশাই নেই যে সেটি কোনো ব্যক্তিকে নিন্দা করার একটি প্রচেষ্টা।

প্রিয় মহাশয়বৃন্দ, 'আমাদের সময়কার নায়ক' বাস্তবিকই একটি চিত্র, কিন্তু একটি মানুষের নয়; আমাদের যুগের পাপের পূর্ণ প্রকাশ নিয়ে এই চিত্র সৃষ্ট হয়েছে। হয়ত আপনারা আবার আমাকে বলবেন কোনো লোক অত বদ হতে পারে না। আমি কিন্তু উত্তর দেব যে আপনারা যদি বিয়োগান্তক নাটক আর রমন্যাসের সমস্ত বদমাইশদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে পারেন তা হলে কেন পেচোরিনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করবেন না? যদি আপনারা আরও অনেক বেশী ভীতিকর ও ন্যক্কারজনক চরিত্রকে তারিফ করতে পারেন, তা হলে কাল্পনিক হলেও এই চরিত্র কেন আপনাদের আরও করুণা উদ্রেক করতে পারে না? তার কারণ এটা নয় কি যে এর মধ্যে এত বেশী সত্য আছে যেটা আপনারা পছন্দ করেন না?..

আপনারা হয়ত বলবেন যে এই বই থেকে নৈতিক কোনো উন্নতি হবে না? আমি কিন্তু এক মত নই। জনসাধারণকে যথেষ্ট মিষ্টি খাওয়ানো হয়েছে; তাতে তাদের বদহজম হয়েছে। এখন প্রয়োজন তিক্ত ওষুধ আর তীব্র সত্যের। তাই বলে আপনারা কিন্তু মনে করবেন না যে মানবীয় পাপ সংশোধন করার মতো উচ্চাশা এই বইয়ের লেখকের কোনো কালে ছিল। ঈশ্বর তাঁকে যেন সে-রকম আনাড়িপনা থেকে রক্ষা করেন। তাঁর শুধু ভালো লেগেছিল আধুনিক মানুষের চিত্র আঁকতে, যেমনটি তাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন আর — তাঁর এবং আপনাদের দুর্ভাগ্য — দেখেছেন অতি ঘনঘন। এটুকুই যথেষ্ট যে রোগ ধরা পড়েছে; কী করে যে সেটা সারানো যায় একমাত্র ঈশ্বরই জানেন!

প্রথম খণ্ড

১

বেলা

তিফ্‌লিস থেকে ঘোড়ায়-টানা ডাক-গাড়িতে আমি যাচ্ছিলাম।*) গাড়িতে একমাত্র মাল ছিল ছোটো একটি সুটকেস। সেটা অর্ধেক ভরা ছিল জর্জিয়া ভ্রমণ সম্পর্কে নোট করা নানা কাগজপত্রে। আপনাদের সৌভাগ্য, তার অধি-কাংশই গেছে হারিয়ে। কিন্তু আমার সৌভাগ্য, সুটকেস আর তার বাকি জিনিসপত্র বেঁচে গেছে।

যখন আমি কোইশাউর উপত্যকায় পেঁছিলাম তখন বরফ-ঢাকা এক পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। ওসেতীয় গাড়োয়ান গলা ছেড়ে গান গাইতে-গাইতে ঘোড়াগুলোকে ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছিল যাতে রাত্রির আগেই কোইশাউর পাহাড়ের চুড়োয় পেঁছনো যায়। কী আশ্চর্য সুন্দর এই উপত্যকাটি! চারিধারে দুর্গম পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। লালচে খাড়া পাহাড়ের গায়ে সবুজ লতা ঝুলছে, তাদের চুড়োয় প্লেন গাছের ঝাড়। হলুদ গিরিপৃষ্ঠে ঝর্ণা খাত কেটেছে। অনেক উঁচুতে উজ্জ্বল বরফের ঝালর। নীচে আরাগ্‌ভা*) আলিঙ্গন করছে এক নামহীন স্রোতকে। সেই স্রোত এক কালো অন্ধকারময় গিরিখাত ফুঁড়ে সশব্দে বেরিয়েছে, আর তারপর দূরে চলে গেছে রুপোলি ফিতের মতো, তার গাটা চকচক করছে যেন সাপের পিঠের খোলস।

কোইশাউর পাহাড়ের পাদদেশে পেঁছে আমরা একটি দুখানের* বাইরে থামলাম। সেখানে জনা কুড়ি জর্জীয় আর পাহাড়ী লোক জমা হয়ে হৈচৈ করছে; কাছেই রাত কাটাবার জন্য এক দল উট থেমেছে। আমার গাড়িটাকে

---

*) চিহ্নিত স্থানগুলির জন্য টীকা-টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

* ককেশীয় সরাইখানা। — সম্পাঃ

ঐ বিকট পাহাড়টার উপর টেনে তোলার জন্য আমাকে কতকগুলো ষাঁড় ভাড়া নিতে হল, কারণ ইতিমধ্যেই শরৎকাল এসে গেছে এবং জমির উপর বরফের পাতলা প্রলেপ জমেছে। প্রায় দুই ভার্স্ট* পথ উঠতে হবে।

ছ'টি ষাঁড় আর জনকয়েক ওসেতীয় ভাড়া করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাদের মধ্যে একজন আমার সুটকেসটা কাঁধে তুলল আর বাকি সবাই ষাঁড়গুলোকে সাহায্য করতে গেল — সাহায্য মানে কিন্তু শুধুই চেঁচামেচি করা আর কি।

আমার গাড়ির পিছনে চারটি ষাঁড়ে-টানা আর একটি গাড়ি আসছিল। তাদের খুব পরিশ্রম হচ্ছিল বলে মনে হল না, যদিও গাড়িটার মধ্যে মালপত্র উঁচু হয়ে উঠেছে। এ-ঘটনায় আমি কিছুটা আশ্চর্য হলাম। গাড়িটার পিছনে রুপোয় মোড়া কাবার্দীয় পাইপ টানতে-টানতে তার মালিক হেঁটে চলেছেন। পরনে তাঁর সামরিক কোট, তার কাঁধের উপর কোনো সামরিক চিহ্ন নেই। মাথায় তার লোমশ চের্কেশীয় টুপি। দেখে মনে হয় তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁর মুখের পোড়াটে রঙ্ দেখে বোঝা যায় ককেশীয় সূর্যের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পরিচয়ের কথা আর তাঁর অসময়ে পেকে-যাওয়া গোঁফ তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ ও শক্তিশালী চেহারার সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না। তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি অভিবাদন করলাম। ধোঁয়ার এক বিরাট মেঘ ছেড়ে নিঃশব্দে তিনি আমার অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিলেন।

'মনে হচ্ছে আমরা সহযাত্রী?'

আবার তিনি সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালেন কিন্তু একটিও কথা বললেন না।

'নিশ্চয়ই আপনি স্তাভ্রোপলে যাচ্ছেন?'*)

'হ্যাঁ মশাই, সেখানেই যাচ্ছি... কিছু সরকারী মালপত্র নিয়ে।'

'দয়া করে আমাকে কি বুঝিয়ে দেবেন, কী করে চারটে ষাঁড়ে আপনার ভারি গাড়িটা অনায়াসে টেনে নিয়ে চলেছে আর এদিকে এই সব ওসেতীয়-দের সাহায্য সত্ত্বেও ছ'টা জন্তু মিলে আমার খালি গাড়িটা প্রায় টানতেই পারছে না?'

ধূর্ত হেসে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানলেন তিনি।

---

* ভার্স্ট — আগেকার রাশিয়ায় প্রচলিত দৈর্ঘ্যের মাপ। এটি কিলোমিটারের প্রায় সমান ছিল। — সম্পাঃ

'মনে হয় আপনি ককেশাসে বেশীদিন আসেন নি?'

'প্রায় এক বছর,' আমি উত্তর দিলাম।

আবার তিনি হাসলেন।

'কেন এ কথা জিগ্‌গেস করছেন?'

'কোনো বিশেষ কারণে নয়, মশাই। এই এশীয়গুলো দারুণ শয়তান! আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন এদের চিৎকার চেঁচামেচি খুব একটা সাহায্য করছে? শুধু শয়তান জানে কী সব মাথামুণ্ডু এরা চিৎকার করছে। কিন্তু ষাঁড়গুলো এদের কথা ঠিক বোঝে। ইচ্ছে করলে কুড়িটা জন্তুকে খোঁচা মারুন, সেগুলো কিন্তু এক পা-ও নড়বে না এ লোকগুলো যদি নিজেদের ভাষায় চিৎকার করতে থাকে। এরা দারুণ ঠক! আর তাদের সঙ্গে আপনি কী-ই বা করতে পারেন?.. পথিকদের এরা দুয়ে নিতে ভালোবাসে...। উচ্ছন্নে গেছে বদমাইশগুলো। আপনি দেখবেন, আপনার কাছ থেকে ওরা বকশিশও আদায় করে ছাড়বে। এখন এদের আমি চিনে ফেলেছি, আমাকে আর বোকা বানাতে পারবে না!'

'এখানে আপনি কি বহুদিন ধরে চাকরি করছেন?'

'হ্যাঁ, যত দিন ধরে আলেক্সেই পেত্রোভিচ এখানে রয়েছেন,'*) সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি উত্তর দিলেন। 'লাইনে তিনি যখন আসেন*) আমি তখন সাব-লেফ্‌টেনাণ্ট। পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তাঁর অধীনে দু'বার আমার পদোন্নতি হয়েছিল।'

'আর এখন কী করছেন?..'

'এখন আমি তৃতীয় সীমানা-বাহিনীতে আছি। আর আপনি? যদি কিছু মনে না করেন!..'

আমি তাঁকে জানালাম।

এরপর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে চললাম। পাহাড়ের চুড়োয় এসে আমরা তুষার পেলাম। সূর্য অস্ত গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে দিনের পর রাত নেমে এলো, দক্ষিণ অঞ্চলে যেমন হয়ে থাকে। উজ্জ্বল তুষারকে ধন্যবাদ — আমরা অনায়াসে পথ খুঁজে যেতে পারলাম। পথ এখনও খাড়াই উঠছে, যদিও আগের মতো অত খাড়া এখন আর নয়। আমার সুটকেসটা গাড়ির মধ্যে রাখতে এবং ষাঁড়গুলোর বদলে ঘোড়া জুততে আদেশ দিলাম, তারপর নীচের উপত্যকাকে শেষ দেখা দেখবার জন্য ফিরে তাকালাম। কিন্তু খাদ থেকে ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে-আসা ঘন কুয়াশা তাকে

সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে। তার ভিতর থেকে একটিও শব্দ আমাদের কাছে পেঁাছল না। ওসেতীয়রা ভোদ্‌কা কেনার জন্য টাকার দাবি জানিয়ে হট্টগোল করতে-করতে আমাকে ছেঁকে ধরল কিন্তু ক্যাপ্টেন এমন ভয়ংকর ধমকে উঠলেন যে মুহূর্তের মধ্যে তারা সরে পড়ল।

'কী জাত!' তিনি বললেন। 'রুশ ভাষায় রুটি কী করে বলতে হয় তারা জানে না, কিন্তু বকশিশ চাইতে তারা শিখে ফেলেছে: 'অফিসার, ভোদ্‌কার জন্যে টাকা দিন!' এমন কি তাতাররাও এদের চেয়ে ভালো; তারা অন্তত মদ খায় না...'

ঘোড়া বদলাবার স্টেশন তখনও এক ভার্স্ট দূরে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, এত নিস্তব্ধ যে গুণগুণুনি শুনে মশা কোথায় উড়ে চলেছে সে-কথা আপনি জানতে পারবেন। বাঁ পাশে গভীর এক অন্ধকার খাদ হাঁ করে রয়েছে। সেটার ওপারে আর আমাদের সামনে গিরিসংকট আর ঝর্ণাখাতের রেখাঙ্কিত এবং মাথায় তুষারের স্তরগুলো নিয়ে গাঢ় নীল পাহাড়ের চুড়োগুলো ফ্যাকাশে আকাশের উপর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশে তখনও শেষ গোধূলির আলো লেগে রয়েছে। অন্ধকার আকাশে তারাগুলো মিটমিট করতে শুরু করল, আর আশ্চর্য, আমার মনে হতে লাগল এখানে সেগুলো যেন আমাদের উত্তর দেশের আকাশের চেয়ে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছে। পথের দু'পাশেই মাটি থেকে নগ্ন কালো পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে আর এখানে সেখানে তুষারের ভেতর থেকে আগাছা উঁকি মারছে; একটিও শুক্‌নো পাতা খসখস শব্দ করছে না এবং প্রকৃতির এই প্রাণহীন ঘুমন্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর নাকের শব্দ আর রুশ গাড়ির ঘণ্টার এলোমেলো টিং টিং শুনতে ভালো লাগে।

'কালকের আবহাওয়াটা সুন্দর হবে,' আমি মন্তব্য করলাম।

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন না। আমাদের একেবারে সামনের পাহাড়ের দিকে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন।

'ওটা কী?' আমি প্রশ্ন করলাম।

গুডপাহাড়।'*)

'কিন্তু তাতে কী?'

'দেখছেন ওটা দিয়ে কেমন ধোঁয়া উঠছে?'

বাস্তবিকই গুড পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ধোঁয়া উঠছে; তার গা বেয়ে টুকরো-টুকরো হালকা কুয়াশা আসছে উঠে আর কালো এক মেঘ তার চুড়োর

উপর রয়েছে, এত কালো যে অন্ধকার আকাশের ওপরেও তাকে একটা কালো ছোপের মতো দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই আমরা ঘোড়া বদলাবার স্টেশন এবং তার চারপাশের পাহাড়ী কুঁড়েগুলোর ছাদ দেখতে পাচ্ছি আর আমাদের সামনে স্বাগত জানিয়ে আলোগুলো মিটমিট করছে। এমন সময় ঠাণ্ডা ধারালো বাতাসের ঝাপ্‌টা এল, গিরিসঙ্কটে শনশন শব্দ শোনা যাচ্ছে। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। লোমের হাতাশূন্য আলখাল্লা আমি কাঁধের ওপর চড়াতে না চড়াতেই তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের দিকে সসম্ভ্রমে আমি এখন তাকালাম...

বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের এখানে রাত কাটাতে হবে। এই রকম তুষারঝড়ের মধ্যে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে কেউ যেতে পারে না। ক্রেস্তোভায়া পাহাড়ে কোনো হিমানী-সম্প্রপাত দেখেছ কি!'*) গাড়োয়ানকে তিনি প্রশ্ন করলেন।

ওসেতীয়-গাড়োয়ান উত্তর দিল, 'না মশাই। কিন্তু নীচে নামার জন্যে অনেকগুলো একেবারে ওত্‌ পেতে রয়েছে।'

ঘোড়া বদলাবার স্টেশনে যাত্রীদের জন্য ঘর না থাকায় এক ধোঁয়ায় ভরা পাহাড়ী কুঁড়েতে আমাদের থাকতে দেওয়া হল। আমার সহযাত্রীকে আমি নিমন্ত্রণ করলাম আমার সঙ্গে চা পান করতে, কারণ আমার সঙ্গে লোহার একটি কেটলি ছিল — ককেশাসে ভ্রমণের সময় আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

এক খাড়া উঁচু পাহাড়ের গায়ে কুঁড়েটির একটি পাশ লেগে আছে। তিনটি পিছল ভিজে সিঁড়ি দিয়ে দরজায় পোঁছনো যায়। হাতড়ে ভিতরে ঢুকে আমি একটা গোরুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম (এখানকার অধিবাসীরা ভৃত্যদের ঘরকে গোয়াল হিসেবে ব্যবহার করে)। কোথায় যেতে হবে আমি বুঝতে পারলাম না। এক পাশে ভেড়ার দল ডাকছে, অন্য পাশে একটা কুকুর গরগর করছে। এক দিকে সৌভাগ্যক্রমে একটি আলো মিটমিট করছিল, তার সাহায্যে আর একটি ফোকরের কাছে এলাম। সেটিকে দরজার মতো দেখাচ্ছিল। এখানে মোটামুটি এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের সম্মুখীন হলাম: বড়সড় কুঁড়ের ছাতটা ধূমমলিন দুটি খুঁটি ধরে রেখেছে। ভিতরটা লোকে ভরা। ঘরের মাঝখানের খোলা মাটির উপর চড়বড় শব্দে সামান্য আগুন জ্বলছে আর ছাতের ফাঁক থেকে বাতাস এসে ধোঁয়াকে ঠেলে দিচ্ছে ভিতরে। এত ঘন হয়ে সেই ধোঁয়া ভেসে রয়েছে যে আশেপাশের জিনিসকে

চিনতে আমার খানিক সময় লাগল; আগুন ঘিরে বসে রয়েছে দুটি বৃদ্ধা, এক দল ছেলেমেয়ে আর এক শীর্ণ জর্জীয় পুরুষ। প্রত্যেকের পরনেই ছেঁড়া জামাকাপড়। আগুনের পাশে আরাম করে বসা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না। আমরা বসে পাইপ ধরালাম, দেখতে-দেখতে চায়ের কেটলিটা আনন্দে সোঁ-সোঁ করে উঠল।

'বেচারা লোকগুলো,' আমাদের মলিন অতিথিসেবকদের দিকে মাথা নাড়িয়ে ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে আমি মন্তব্য করলাম। তারা আমাদের দিকে নিঃশব্দে কেমন যেন হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

তিনি উত্তর দিলেন, 'লোকগুলো বোকাসোকা। বিশ্বাস করুন, ওরা কোনো কাজ করতে পারে না, কোনো কিছু শিখতেও পারে না। আমাদের কাবার্দীয় বা চেচেনীয়রা ডাকাত আর ভবঘুরে হওয়া সত্ত্বেও অন্তত সাহসী। কিন্তু এরা এমন কি অস্ত্রশস্ত্রেও কোনো উৎসাহ দেখায় না। এদের কারুর কাছে একটা ভালো ছোরা পর্যন্ত আপনি দেখতে পাবেন না। ওসেতীয়দের কাছ থেকে আপনি কী-ই বা আশা করতে পারেন!'

'আপনি কি বহুকাল ধরে চেচ্নায় আছেন?'*)

'বেশ কিছুদিন ধরে — কামেন্নি ব্রদ পথে এক সৈন্যদলের সঙ্গে আমি দশ বছর ধরে দুর্গ পাহারা দিচ্ছি। জায়গাটা আপনি জানেন?'

'জায়গাটার কথা শুনেছি।'

'হ্যাঁ মশাই, খুনেগুলোকে নিয়ে আমাদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এখন অবস্থা অনেক শান্ত। কিন্তু এমন এক সময় ছিল দুর্গপ্রাচীর থেকে এক শ' পা-ও আপনি যেতে পারতেন না, কারণ কোনো-না-কোনো লোমশ শয়তান আপনার জন্যে ওত্ পেতে থাকত। যে-মুহূর্তে আপনাকে সে অসাবধান দেখত সে-মুহূর্তেই আপনার গলায় পরাত ফাঁসির দড়ি কিংবা আপনার মাথার পেছনে করত গুলি। যাই হোক, লোকগুলোর কিন্তু সাহস ছিল!..'

'নিশ্চয়ই আপনার জীবনে অনেক দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটেছে?' কৌতূহলী হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ, অনেক...'

তারপর তিনি তাঁর গোঁফের বাঁ পাশের ডগা ধরে টানতে লাগলেন, মাথাটা তাঁর বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল আর তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তাঁর কাছ থেকে কোনো একটা গল্প শুনতে আমার দারুণ

কৌতূহল হল — যাঁরা ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে নানা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন তাঁদের এই ধরনের ইচ্ছে স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে চা ফুটে উঠল। আমার সুটকেস থেকে ভ্রমণের সময় ব্যবহার করার দুটি পাত্র আমি বার করলাম, চা ঢাললাম এবং একটি পাত্র রাখলাম ক্যাপ্টেনের সামনে। এক চুমুক পান করে তিনি যেন নিজেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকই!' তাঁর স্বগতোক্তিতে আমার আশা বাড়ল, কারণ আমি জানতাম ককেশাসের প্রাচীন কর্মচারীরা কথা বলতে, গল্প করতে ভালোবাসেন, গল্প করার সুযোগ সচরাচর তাঁরা পান না। কারণ পুরো পাঁচ বছর ধরে কোনো সৈন্যদলের সঙ্গে তাঁদের হয়ত রাখা হত শহর থেকে দূরে এমন এক জায়গায় যেখানে পাঁচ বছর তাঁদের 'নমস্কার' বলে অভিবাদন করার কেউ থাকত না (এই ধরনের অভিবাদন' সার্জেণ্ট-মেজরদের কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত নয়)। আর কথা বলার অনেক কিছুই থাকে: চারিপাশের অসভ্য, অদ্ভুত লোকজন, সর্বদাই বিপদের উপস্থিতি আর নানা বিস্ময়কর দুঃসাহসিক ঘটনা; সে কথা এত অল্প আমরা লিখতে পারি যে ভাবলে দুঃখ হয়।

'একটু রাম্ মেশাতে চান কি?' আমার সঙ্গীকে আমি প্রশ্ন করলাম। আমার কাছে তিফ্লিস-থেকে-আনা কিছু সাদা রাম্ আছে। এখন ঠাণ্ডা লাগছে।'

'না, ধন্যবাদ, আমি মদ খাই না।'

'সে কী কথা?'

'সত্যিই, প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিয়েছি। জানেন, যখন আমি সাব-লেফ্-টেনাণ্ট ছিলাম তখন একদিন আমরা প্রচুর মদ্যপান করি আর সেই রাত্রেই বিপদ-সঙ্কেত বাজে। সৈন্য শ্রেণীতে তাই আমরা হাজির হলাম বেশ মত্ত অবস্থায়। আলেক্সেই পেত্রোভিচ যখন আমাদের সে অবস্থায় আবিষ্কার করলেন*) তখন কী বকুনিটাই না খেতে হল। ঈশ্বর করুন, আমাকে যেন ও-রকম রাগী কোনো মানুষের মুখোমুখি হতে না হয়। অল্পের জন্যে সামরিক আদালতে হাজির হতে-হতে আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম। আমাদের অবস্থাটা এই রকমের: মাঝে মাঝে গোটা একটা বছর কাটাতে হয় কারুর মুখদর্শন না করে — আর আপনি যদি মদ্যপানের অভ্যেস করেন তা হলে আর আপনার উদ্ধার নেই।'

কথাটা শুনে আমি প্রায় আশা ছেড়ে দিলাম।

'চের্কেসীয়দের কথাই ধরুন', তিনি বলে চললেন, 'বিয়েবাড়িতে কিংবা

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় বুজা* পান করে মাতাল হবার সঙ্গে-সঙ্গে মারামারি শুরু হয়ে যায়। একবার আমি ত কোনো রকমে বেঁচে ফিরেছিলাম, যদিও আমি ছিলাম এক শান্তিপ্রিয় রাজড়ার অতিথি।'

'কী ঘটেছিল?'

পাইপটা ভরে তিনি জ্বালালেন, দীর্ঘ টান দিলেন আর তারপর গল্প শুরু করলেন:

'জানেন, এক সময় আমি তেরেকের অন্য পারে এক দুর্গে এক সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলাম*) — প্রায় পাঁচ বছর আগে। এক শরতে খাদ্যসামগ্রী পাহারা দিয়ে এক দল সৈন্য এলো, তাদের মধ্যে ছিল এক অফিসার, প্রায় বছর পঁচিশের এক যুবক। পুরো সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে আমার কাছে হাজির হল আর বলল দুর্গে আমার সঙ্গে চাকরি করার আদেশ সে পেয়েছে। তার চেহারা এত ছিপছিপে ও ফ্যাকাশে আর তার পোশাক এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে সঙ্গে-সঙ্গে আমি বুঝলাম ককেশাসে সে নতুন এসেছে। 'নিশ্চয়ই আপনি রাশিয়া থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন?' আমি তাকে প্রশ্ন করলাম। 'ঠিক বলেছেন, মশাই,' সে উত্তর দিল। তার হাত ধরে আমি বললাম, 'এখানে আপনাকে পেয়ে খুশি হলাম, খুব খুশি হলাম। জায়গাটা আপনার কাছে খানিক একঘেয়ে লাগবে... কিন্তু আমরা যে পরস্পরের সঙ্গে বেশ মানিয়ে চলতে পারব সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আর দয়া করে আমাকে শুধু মাক্সিম মাক্সিমীচ বলে ডাকবেন, আর একটা কথা, পুরো সামরিক পোশাক পরার আপনার দরকার নেই। অফিসারের টুপি পরেই আসবেন।' তার বাসস্থান তাকে দেখিয়ে দেওয়া হল আর দুর্গের মধ্যে সে গুছিয়ে বসল।'

'তার নাম কী?' মাক্সিম মাক্সিমীচকে আমি প্রশ্ন করলাম।

'তার নাম... গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ পেচোরিন। আপনাকে বলব কি — সে ছোকরা খুব ভালো ছিল, যদিও কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। যেমন, বর্ষা আর ঠাণ্ডার মধ্যে সারা দিন ধরে সে শিকার করে কাটাত; অন্য যে কারুরই তাইতে ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট আর খুব ক্লান্ত হবার কথা, কিন্তু সে হত না। অথচ মাঝে মাঝে তার ঘরে সামান্য একটু বাতাসের ঝাপ্টা এলেই সে বলত তার ঠাণ্ডা লেগেছে; জানালার খড়খড়ির জোরে বন্ধ হবার শব্দে সে চমকে

* ককেশাসের এক জাতের হালকা মদ। — সম্পাঃ

ফ্যাকাশে হয়ে উঠত, যদিও আমি স্বচক্ষে দেখেছি তাকে একলা বুনো শুয়োরের দিকে এগিয়ে যেতে; মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাকে আপনি কথা কওয়াতে পারতেন না, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সে গল্প বলতে শুরু করত হাসতে-হাসতে পেট যেন ফেটে যেত...। হ্যাঁ মশাই, ভারি অদ্ভুত ধরনের ছোকরা সে ছিল, আর দেখলে মনে হত বেশ অবস্থাপন্ন — তার কাছে যে-সব দামী-দামী ছোটোখাটো নানা জিনিসপত্র ছিল তাই দেখে এ ধারণা হয়েছিল!..'

'কত দিন সে আপনার কাছে ছিল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'বছরখানেক। আমার পক্ষে স্মরণীয় সেই বছরটি। আমার যথেষ্ট অসুবিধের সৃষ্টি সে করেছিল, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন! কিন্তু, যাই হোক, এমন ধরনের লোক আছে আগে থেকেই যাদের ভাগ্যে লেখা থাকে নানা অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে বলে!'

'অদ্ভুত ঘটনা?' আরো একটু চা ঢালতে-ঢালতে বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'গল্পটা আপনাকে বলব। আমাদের দুর্গের প্রায় ছয় ভার্স্ট দূরে এক শান্তিপ্রিয় রাজড়া থাকতেন। তাঁর প্রায় পনেরো বছর বয়সের ছেলে ঘোড়ায় চেপে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত। এমন একটা দিনও যেত না যে-দিন সে কোনো-না-কোনো ছুতোয় দেখা করতে না আসত। আর বাস্তবিক গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ আর আমি তাকে বিগড়ে দিয়েছিলাম। কী গোঁয়ার ছিল ছেলেটা, সবকিছু করতেই প্রস্তুত — ঘোড়ায় চেপে দৌড়ে আসতে-আসতে জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে টুপি তুলে নেওয়া কিংবা লক্ষ্যভেদ করা*) — সব রকম ব্যাপারেই। কিন্তু তার একটা খারাপ স্বভাব ছিল: টাকা-পয়সার ওপর দারুণ দুর্বলতা। একবার নিতান্ত ঠাট্টাচ্ছলেই গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ বলেছিল যে সে যদি তার বাবার ছাগলের পাল থেকে সবচেয়ে ভালো ছাগলটা চুরি করে আনতে পারে তা হলে তাকে সে একটি স্বর্ণমুদ্রা দেবে। আর তারপর কী হয়েছিল, মনে করেন? পরের রাত্রেই জন্তুটার শিং ধরে টানতে-টানতে সে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু, মাঝে মাঝে তার পেছনে আমরা সামান্য লাগলেই রেগে, চোখদুটো লাল করে তার ছোরাটা সে বার করতে যেত। আমি বলতাম, 'আজামাৎ, এই গরম মাথাটা নিয়ে তুমি বিপদে পড়বে। তোমার মাথার পক্ষে এটা য়ামান*!'

---

* খারাপ (তুর্কী ভাষায়)।

'একদিন বৃদ্ধ রাজা নিজেই এলেন বিয়ের নেমন্তন্ন করতে; তাঁর বড় মেয়ের বিয়ে দিতে চলেছেন তিনি, আর যে-হেতু আমরা দুজনে কুনাক* সে-হেতু — তিনি তাতার হলেও — প্রত্যাখ্যান করার উপায় ছিল না। অতএব আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামে পেঁছবার পর এক দল কুকুর চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে আমাদের কাছে এলো। আমাদের দেখেই মেয়েরা লুকিয়ে পড়ল; যাদের মুখ আমরা এক ঝলক দেখতে পেলাম মোটেই তারা সুন্দরী নয়। 'চের্কেসীয় মহিলাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা অনেক উঁচু ছিল,' গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ আমাকে বলল। 'একটু সবুর করুন,' হেসে আমি বললাম। আমার মাথায় একটা মতলব ছিল।

'রাজার কুঁড়েতে অনেক লোক জমেছে। আপনি তো জানেন যে এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথা হল, যার সঙ্গে দেখা হয় বিয়েবাড়িতে তাকেই নিমন্ত্রণ করা। যথাবিধি সম্মানের সঙ্গে আমাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে অতিথিদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু আমাদের ঘোড়াগুলোকে তারা কোথায় রাখল সেটা লক্ষ্য করতে আমি ভুললাম না, পাছে অদৃষ্টপূর্ব কিছু একটা ঘটে, আপনি বুঝছেন ত।'

'তারা কী করে বিয়ের উৎসব করে?' ক্যাপ্টেনকে আমি প্রশ্ন করলাম।

'এই, সাধারণভাবে। প্রথমে মোল্লা কোরান থেকে তাদের কিছু পড়ে শোনান, তারপর নববিবাহিতদের আর তাদের আত্মীয়দের উপহার দেওয়া হয়। তারা খায় আর বুজা পান করে, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে নানা রকম খেলা শুরু হয়। সর্বদাই সেখানে থাকে নোংরা আর ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়-পরা একটা লোক, খোঁড়া আর রুগ্ন একটা ঘোড়ায় চড়ে ভাঁড়ামি করে সবাইকে হাসাবার জন্যে। পরে, অন্ধকার হয়ে গেলে অতিথিদের ঘরে আমরা যাকে বল-নাচ বলি তাই শুরু হয়। এক হতভাগা বুড়ো তিন-তারওলা একটা যন্ত্র বাজিয়ে চলে... মনে পড়ছে না সেটাকে তারা কী বলে... আমাদের বালালাইকার মতো খানিকটা দেখতে। মেয়েরা আর যুবকরা দু'সারিতে মুখোমুখি দাঁড়ায়, হাততালি দেয় আর গান গায়। তারপর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ঘরের মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পরের উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে, যেতে-যেতে মুখে-মুখে তারা গান বাঁধে আর অন্যরা ধুয়ো ধরে। পেচোরিন আর আমি সম্মানের আসন অধিকার

---

* বন্ধু (লেখকের মন্তব্য)।

করেছিলাম আর আমরা যখন বসেছিলাম গৃহকর্তার ছোটো মেয়েটি, ষোল-সতেরো বছরের, সামনে এসে তার উদ্দেশ্যে গান গেয়ে চলল... কী তাকে বলি?.. এক ধরনের প্রশংসা।'

'মেয়েটি কী গান গেয়েছিল তা আপনার মনে নেই কি?'

'হ্যাঁ, মনে হয় গানটা এই ধরনের ছিল: 'আমাদের তরুণ অশ্বারোহীরা ছিপছিপে আর তাদের কোটের ওপর রুপোর জরি, কিন্তু এই তরুণ রুশ অফিসারটি আরো বেশী ছিপছিপে আর তাঁর জরিগুলো সোনার। অন্যদের মধ্যে তিনি যেন পপলার গাছ, তবুও আমাদের বাগানে তিনি বাড়বেন না বা প্রস্ফুটিত হবেন না।' পেচোরিন উঠে দাঁড়াল, তার সামনে নত হয়ে অভিবাদন জানাল এবং হাত দিয়ে নিজের কপাল আর বুক স্পর্শ করে আমাকে অনুরোধ করল মেয়েটিকে প্রত্যুত্তর দিতে। তাদের ভাষা আমি ভালো জানতাম। তার উত্তর আমি তর্জমা করে দিলাম।

'মেয়েটি চলে যাবার পর গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচকে আমি ফিসফিস করে বললাম, 'বলুন, ওকে কেমন লাগল?' 'অপূর্ব!' উত্তরে সে বলল। 'মেয়েটির নাম কী?' 'ওর নাম বেলা,' আমি উত্তর দিলাম।

'আর বাস্তবিক, মেয়েটি অপরূপ রূপসী: দীর্ঘ, ছিপছিপে আর হরিণের মতো তার কালো চোখের দৃষ্টি, আপনার হৃদয়ের অন্তস্তলে যেন পেঁছিয়। পেচোরিন চিন্তায় ডুবে গেল, তার ওপর থেকে চোখ ফেরালো না, আর মেয়েটিও বারবার তার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। কিন্তু পেচোরিনই একমাত্র নয় যে এই সুন্দরী রাজকুমারীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল। ঘরের কোণ থেকে আর এক জোড়া স্থির আর জ্বলন্ত চোখ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ভালো করে তাকিয়ে আমার অনেক দিনের পরিচিত কাজ্‌বিচকে চিনতে পারলাম। সে-লোকটাকে আপনি ঠিক বন্ধু বলতে পারেন না, যদিও তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যাতে বলা যায় আমাদের প্রতি সে শত্রুভাবাপন্ন। তাকে অনেকবার সন্দেহ করা হয়েছিল কিন্তু কখনই তাকে কোনো রকম প্রতারণার ব্যাপারে ধরা যায় নি। মাঝে মাঝে দুর্গে আমাদের কাছে সে ভেড়াগুলো বিক্রি করতে আসত, আর সস্তা দরেই বিক্রি করত, কিন্তু কখনই দরদস্তুর করত না: সে যে-দাম চাইবে তা-ই দিতে হবে; কখনই দাম সে কমাত না, এমন কি যদি তার উপর তার জীবন নির্ভর করে তবু না। তার সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল যে কুবান পেরিয়ে আব্রেকদের সঙ্গে সে ঘোড়ায় চড়ে যেত,*) আর সত্যি কথা বলতে কি তার চেহারাটাও

ছিল ডাকাতের মতো: বেঁটে, মাংসপেশীবহুল আর চওড়া কাঁধওলা...। আর কী ধূর্তই না সে ছিল, একেবারে শয়তানের মতো ধূর্ত! যে-বেশ্‌মেৎটা* সে পরত সর্বদাই সেটা থাকত ছেঁড়া আর তালি-মারা, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলো ছিল সেরা। আর তার ঘোড়াটা সমস্ত কাবার্দার মধ্যে ছিল বিখ্যাত*) — বাস্তবিকই তার চেয়ে ভালো ঘোড়ার কথা আপনি কল্পনা করতে পারেন না। সে-অঞ্চলের অশ্বারোহীদের তাকে হিংসে করার যথেষ্ট কারণ ছিল — বারবার তারা চেষ্টা করেছিল ঘোড়াটাকে চুরি করতে, কিন্তু পারে নি। এখনও ঘোড়াটাকে যেন আমি দেখতে পাই, সেটা যেন আমার চোখের সামনে রয়েছে: পিচের মতো কালো, পাগুলো যেন বেহালার তারের মতো টান-টান আর চোখগুলো বেলার চোখের চেয়ে খারাপ নয়। কী শক্তিশালীই না ছিল জন্তুটা! একটানা পঞ্চাশ ভার্স্ট ছুটতে পারত। শিক্ষার ব্যাপারে বলা যায় — কুকুরের মতো তার প্রভুর অনুগামী সে ছিল, এমন কি তার গলার স্বর পর্যন্ত চিনতে পারত! কাজ্‌বিচ কখনও তাকে বেঁধে রাখত না। বাস্তবিক একেবারে আসল ডাকাতের ঘোড়া!..

'সেই সন্ধেয় কাজ্‌বিচ অত্যন্ত বিষণ্ণ ছিল, আগে এত বিষণ্ণ তাকে আমি কখনও দেখে নি। তার বেশ্‌মেৎ-এর তলায় আমি একটা বর্মও লক্ষ্য করলাম। আমি ভাবলাম, 'নিশ্চয়ই একটা বিশেষ কারণে বর্মটা রয়েছে। নিশ্চয়ই ও একটা মতলব আঁটছে।'

'ঘরের ভেতরটা গুম্‌সোনো, তাই আমি বাইরের খোলা বাতাসে বেরিয়ে এলাম। পাহাড়ের ওপর রাত্রি নামছে, এঁকেবেঁকে কুয়াশা গিরিসঙ্কটগুলোতে ঢুকছে আর সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে।

'যে-ছাউনিতে আমাদের ঘোড়াগুলো ছিল মনে হল সেটার ভেতরে গিয়ে দেখি সেগুলোকে খাওয়ানো হচ্ছে কিনা, তাছাড়া সব সময়েই সাবধান থাকা ভালো: আমার ঘোড়াটাও ছিল খুব ভালো আর অনেক কাবার্দীয় লোক তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে মন্তব্য করেছিল: 'ইয়কশি থে, চেক ইয়কশি**!'

'বেড়ার ধার দিয়ে আমি সাবধানে যাচ্ছিলাম, এমন সময় নানা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এক কণ্ঠস্বর আমি তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলাম; কথা বলছিল সেই গোঁয়ার আজামাৎ — আমাদের নিমন্ত্রণকারীর ছেলে। অন্য জন

---

* তলাকার বালাপোষের ছোটো জামা। — সম্পাঃ

** ভালো ঘোড়া, খুব ভালো! (তুর্কী ভাষায়)

কালেভদ্রে আর শান্তভাবে বলছিল কথা। আমি ভাবলাম, 'কী জানি কী মতলব ওরা আঁটছে। আমার ঘোড়াটার সম্পর্কে নয় ত?' বেড়াটার পাশে বসে পড়ে আমি কান খাড়া করে রইলাম, চেষ্টা করলাম যাতে প্রত্যেকটি কথাই শুনতে পাই। সব কথা শোনা অসম্ভব ছিল, কারণ তখন বাড়ির ভেতরকার গান আর নানা স্বরের গুঞ্জন এই কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

''তোমার ঘোড়াটা ভারি সুন্দর!' আজামাৎ বলছিল। 'আমি যদি এই বাড়িটার কর্তা আর তিনশ মাদি ঘোড়ার মালিক হতাম তাহলে তাদের অর্ধেক তোমার ঘোড়াটার জন্যে আমি দিয়ে দিতাম, কাজ্‌বিচ!'

''ওহো, এখানে তাহলে কাজ্‌বিচ রয়েছে!' আমি ভাবলাম আর বর্মের কথাটা মনে পড়ে গেল।

'এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে কাজ্‌বিচ উত্তর দিল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, সমস্ত কাবার্দায় এর জুড়ি তুমি খুঁজে পাবে না। একবার তেরেক ছাড়িয়ে*) আব্রেকদের সঙ্গে আমি যাচ্ছিলাম লড়াই করে কিছু রুশ ঘোড়া ছিনিয়ে নিতে। আমাদের কপাল ছিল খারাপ, নানা দিকে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম। চারজন কসাক আমাকে তাড়া করল; ইতিমধ্যেই গ্যাউরদের* চিৎকার আমার পিছনে শুনতে পাচ্ছিলাম আর সামনে ছিল এক ঘন জঙ্গল। জিনের ওপর নীচু হয়ে, আল্লার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে জীবনে সেই প্রথম ঘোড়াটাকে চাবুক মেরে আমি অপমান করেছিলাম। ডালপালার ভেতর সে যেন পাখির মতো উড়ে চলল; কাঁটায় ছিঁড়ে গেল আমার জামা-কাপড় আর কারাগাচ গাছের শুক্‌নো ডালগুলো আমার মুখে চাবুক মারতে লাগল। আমার ঘোড়া কাঁটা গাছের গুঁড়ির উপর দিয়ে লাফিয়ে আর বুক দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে চলল। আমার পক্ষে ভালো হত বনের ধারে তাকে ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়া। কিন্তু তার সঙ্গ ছাড়তে কিছুতেই মন চাইল না। আর পয়গম্বর আমাকে তার জন্য পুরস্কারও দিলেন। কতকগুলো গুলি আমার মাথার ওপর দিয়ে সাঁ-সাঁ করে চলে গেল; কসাকরা তখন ঘোড়া থেকে নেমে আমার পেছনে দৌড়তে শুরু করেছে এটা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম...। হঠাৎ আমার সামনে এক গভীর খাদ দেখা গেল;

---

* অবিশ্বাসীদের প্রতি মুসলমানদের অপমানজনক কথা, যার অর্থ 'নাস্তিক কুকুর'। — সম্পাঃ

এক মুহূর্তের জন্যে আমার ঘোড়াটা ইতস্তত করল, আর তারপর লাফাল। কিন্তু অন্য পাশ থেকে তার পিছনের পাগুলো পিছলে গেল আর তার সামনের পাগুলো দিয়ে মাটি আঁকড়ে সে ঝুলতে লাগল। লাগাম ছেড়ে দিয়ে আমি খাদের মধ্যে পড়লাম। এতে ঘোড়াটা বেঁচে গেল, কোনো রকমে নিজেকে সে ওপরে টেনে তুলল। কসাকরা এই সব ঘটনা দেখেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই খাদের মধ্যে নেমে আমার খোঁজে এলো না; সম্ভবত তারা ভেবেছিল আমি পড়ে মরে গেছি। তারপর আমি শুনতে পেলাম আমার ঘোড়াটার পেছন-পেছন তাদের দৌড়তে। আমার বুক যেন ভেঙে যেতে লাগল; খাদের লম্বালম্বি ঘন ঘাসের ভেতর গুঁড়ি মেরে যাচ্ছি, দেখলাম: আমি তখন জঙ্গলের বাইরে — জঙ্গল থেকে কয়েক জন কসাককে ঘোড়ায় চড়ে ফাঁকা জায়গায় বেরুতে দেখলাম, আর আমার কারাগিওজকে দেখলাম তাদের দিকে সোজা দৌড়ে আসতে। চিৎকার করে তার দিকে সবাই ছুটল। অনেকক্ষণ ধরে তারা তাকে তাড়া করে চলল। তাদের মধ্যে একজন দু-একবার একটা ফাঁস তার গলাতে প্রায় পরিয়েও ফেলেছিল; আমি কাঁপতে লাগলাম, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে ফিরিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম: বাতাসের মতো আমার কারাগিওজ মুক্ত অবস্থায় ছুটে চলেছে, তার ল্যাজ লম্বা হয়ে উড়ছে, আর এদিকে গ্যাউররা সমতলভূমিতে তাদের ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর পিঠে একের পর এক অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। আল্লার নামে শপথ করে বলছি এই কথাগুলো সত্যি! অনেক রাত পর্যন্ত খাদের মধ্যে বসে রইলাম। আর কী ঘটল ধারণা করতে পার, আজামাৎ? হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে শুনতে পেলাম খাদের পাশ দিয়ে একটা ঘোড়াকে ছুটে যেতে — নাক দিয়ে সে শব্দ করছে, ডাকছে আর ক্ষুরগুলো ঠুকছে; আমার কারাগিওজের স্বর আমি চিনতে পারলাম, সে-ই — আমার সঙ্গী!.. তারপর থেকে আর কখনও আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি।'

'ঘোড়াটার মসৃণ গলাটা চাপড়াবার শব্দ আর তাকে নানা আদরের নামে সম্বোধন করার কথা শোনা যেতে লাগল।

'আজামাৎ বলল, 'আমার যদি হাজারটা মাদী ঘোড়া থাকত তা হলে তোমার কারাগিওজের বদলে আমি দিয়ে দিতাম।'

''ইওক*, আমি নিতাম না,' কাজ্‌বিচ উদাসীন স্বরে উত্তর দিল।

---

* না (তুর্কী ভাষায়)।

‘‘শোনো, কাজ্‌বিচ,’ আজামাৎ খোসামোদ করে বলল। ‘তুমি ভালো লোক আর সাহসী ঘোড়সওয়ার, আর আমার বাবা রুশদের ভয় পান। আমাকে পাহাড়ে যেতে দেন না। তোমার ঘোড়াটা আমায় দিয়ে দাও আর তুমি যা চাইবে তাই আমি করব। তোমার জন্যে বাবার সবচেয়ে ভালো বন্দুক কিংবা তরোয়ালটা আমি চুরি করে আনব — যেটা তুমি চাও। আর তাঁর তরোয়ালটা আসল গুরদা,*) তার ফলাটা তোমার হাতের ওপর রাখো আর সেটা নিজে থেকেই গভীর হয়ে তোমার মাংসের মধ্যে কেটে বসবে; তোমার এই রকম বর্ম তাকে ঠেকাতে পারবে না।’

‘কাজ্‌বিচ চুপ করে রইল।

‘‘যখন প্রথম তোমার ঘোড়াটা দেখি,’ আজামাৎ বলে চলল, ‘তোমাকে নিয়ে লাফাতে-লাফাতে পাক খাচ্ছে, তার নাক ফুলে উঠেছে, তার ক্ষুর থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকোচ্ছে, আমার বুকটা যেন কেমন করে উঠল, আর আমি সবকিছুর ওপর আকর্ষণ হারালাম। আমার বাবার সবচেয়ে ভালো-ভালো ঘোড়াগুলোকে আমার তুচ্ছ মনে হচ্ছে, সেগুলোয় চড়ে কারুর সামনে যেতে আমার লজ্জা হয়; আমার মনে আর সুখ নেই। মনের দুঃখে দিনের পর দিন কাটিয়েছি একটা পাহাড়ের ওপর বসে, আর শুধু ভেবেছি তোমার কালো ঘোড়াটার কথা — তার ছিমছাম চলন, তার তীরের মতো সোজা মসৃণ পিঠ আর আমার দিকে সোজা তাকিয়ে-থাকা তার জ্বলন্ত দৃষ্টি, যেন আমার সঙ্গে সে কথা বলতে চায়। আমাকে তুমি যদি ওটা বিক্রি না কর তাহলে, কাজ্‌বিচ, আমি মরে যাব,’ কাঁপা-কাঁপা গলায় আজামাৎ বলল।

‘আমার মনে হল যেন তাকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুনতে পেলাম, আর আপনাকে বলব কী — আজামাৎ বড় একগুঁয়ে ছেলে। যখন সে আরও ছোটো ছিল কোনো কিছুই কখনও তাকে কাঁদাতে পারে নি।

‘তার কান্নার বদলে আমি হাসির মতো একটা শব্দ শুনলাম।

‘‘শোনো!’ আজামাৎ বলল, এখন তার স্বর দৃঢ়। ‘তুমি দেখো আমি যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। তুমি যদি ইচ্ছে কর তা হলে আমার বোনকে চুরি করে এনে দিতে পারি। কী সুন্দর সে নাচতে আর গাইতে পারে! আর তার সোনার সুতোর কাজ বাস্তবিক আশ্চর্য! তুরস্কের পাদিশারও তার মতো কোনো বউ ছিল না...। তাকে পেতে চাইলে কাল রাতে পাহাড়ের খাতের কাছে, যেখান দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে, আমার জন্যে অপেক্ষা

কোরো; পরের গ্রামে যাবার পথ ধরে তাকে নিয়ে আমি যাব — আর সে তোমার হয়ে যাবে। বেলার দাম কি তোমার ঘোড়ার সমান নয়?'

'অনেক অনেকক্ষণ ধরে কাজ্‌বিচ চুপ করে রইল। অবশেষে উত্তর দেবার বদলে সে মৃদু গলায় একটি পুরনো গান ধরল*:

আমাদের দেশে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে,
তাদের চোখের অন্ধকারে তারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে চমকাচ্ছে,
মধুর তাদের ভালোবাসা, অন্যের ঈর্ষা জাগায়।
কিন্তু যুবকদের কাছে স্বাধীনতা মধুরতর,
অনেক অনেক স্ত্রী কিনতে পাওয়া যায় সোনা দিয়ে,
কিন্তু এক দামাল ঘোড়া অতুল ঐশ্বর্যের সমান,
প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘূর্ণিবাত্যার মতো সে উড়ে যায়,
তোমাকে কখনও প্রতারণা করে না, কখনও তোমার বিশ্বাস ভঙ্গ করে না।

'বৃথাই আজামাৎ তার কাছে অনুনয়-বিনয় করে চলল; সে কাঁদল, খোসামোদ করল, তোষামোদ করল, অবশেষে কাজ্‌বিচ তার ওপর রেগে উঠল:

''ছোকরা, এখান থেকে ভাগো! তুমি কি পাগল হয়েছ? আমার ঘোড়ায় কখনই তুমি চড়তে পারবে না! প্রথম তিন পা গিয়েই সে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলবে আর পাথরে ঠুকে তোমার মাথা চুরমার হয়ে যাবে।'

''আমি?' রাগে আত্মহারা হয়ে আজামাৎ চিৎকার করে উঠল, আর তার ছোট্ট ছোরাটা বর্মের ওপর ঝনঝন করে উঠল। এক বলশালী হাত তাকে ছুঁড়ে ফেলল আর সে কঞ্চির বেড়াটার ওপর এমন জোরে আছড়ে পড়ল যে সেটা উঠল কেঁপে। 'এইবার তামাসা শুরু হবে,' আমি ভাবলাম আর আস্তাবলে ছুটে গিয়ে আমাদের ঘোড়াগুলো জুতে সেগুলোকে পেছন দিকের উঠোনে নিয়ে এলাম। দু'মিনিট বাদে বাড়ির মধ্যে দারুণ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম: আজামাৎ বাড়ির মধ্যে ছেঁড়া বেশ্‌মেৎ পরে ছুটে গিয়ে বলেছিল যে কাজ্‌বিচ তাকে কাটতে গিয়েছিল। প্রত্যেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে তাদের বন্দুকগুলো হাতে নিল — আর তামাসা গেল শুরু হয়ে। আর্তনাদ আর চিৎকার শুরু হয়ে গেল, বন্দুকের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল, কিন্তু ইতিমধ্যে কাজ্‌বিচ তার ঘোড়ায় চড়ে

---

* কাজ্‌বিচের গানটি অবশ্যই আমাকে গদ্যে বলা হয়েছিল। সেটিকে ছন্দে লেখার জন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি; কিন্তু অভ্যাস যাবে কোথায়? (লেরমন্তভের বক্তব্য)।

ভিড়ের মধ্যে দৈত্যের মতো চরকি-পাক খাচ্ছে আর তার তরোয়াল দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটাচ্ছে।

''এর মধ্যে জড়িয়ে পড়া খুব খারাপ হবে,' গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচের হাত ধরে আমি বললাম। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালানো ভালো নয় কি?'

''একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক কী ভাবে এটা থামে।'

''নিশ্চয়ই খুব খারাপভাবে শেষ হবে; এই সব এশীয়দের বেলায় এই কাণ্ডই ঘটে থাকে: যখনি তারা আকণ্ঠ বুজা পান করে তখনি তারা একে অন্যকে কাটাকাটি করার জন্যে ছোটে।'

'ঘোড়ায় চড়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম।'

'কাজ্‌বিচের কী হল?' অসহিষ্ণু হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

'এই সব লোকদের কী হতে পারে?' ক্যাপ্টেন তাঁর চায়ের গেলাস শেষ করে বললেন। 'অবশ্যই সে পালাতে পেরেছিল।'

'সে আহতও হয় নি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'একমাত্র ভগবানই জানেন। এই শয়তানগুলো ভারি শক্ত। তাদের কয়েকজনকে লড়তে আমি দেখেছি; একজনকে হয়ত বেয়োনেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলা হয়েছে, তবুও সে তরোয়াল ঘোরাতে থাকে।'

অল্প থেমে মাটিতে পা ঠুকে ক্যাপ্টেন বলে চললেন:

'একটা ব্যাপারের জন্যে নিজেকে আমি কোনোদিন ক্ষমা করব না। দুর্গে ফিরে যাবার পর কোন শয়তান যেন আমাকে দিয়ে গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচকে বলল বেড়ার পেছন থেকে আমি যা শুনেছি সেই কথাগুলো। সে হাসতে লাগল — বড় ধূর্ত — যদিও ইতিমধ্যেই সে একটা মতলব ভেবে বার করেছিল।'

'কী সেটা? আমাকে বলুন।'

'মনে হচ্ছে আপনাকে বলতে হবে। গল্পটা শুরু করেছি, তাই সেটা শেষ করা দরকার।'

'প্রায় চারদিন পরে ঘোড়ায় চেপে আজামাৎ দুর্গে এলো। যথারীতি সে গেল গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে দেখা করতে। আজামাৎ-এর জন্যে কিছু-না-কিছু সুখাদ্য সর্বদাই সে রাখত। আমিও সেখানে ছিলাম। ঘোড়া সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল, আর পেচোরিন কাজ্‌বিচের ঘোড়ার প্রশংসা শুরু করল; ঘোড়াটা হরিণের মতো তেজস্বী আর সুন্দর, আর পেচোরিন বলল সমস্ত পৃথিবীতে তার জুড়ি নেই।

'তাতার ছোকরার চোখ জ্বলে উঠল, কিন্তু পেচোরিন এমন ভাব দেখাল যেন সে লক্ষ্য করে নি; আলোচনার বিষয় আমি বদলাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে আলোচনাকে নিয়ে আনল কাজ্‌বিচের ঘোড়ার ওপর। আজামাৎ এলে প্রতিবারেই এই ঘটনা ঘটে। তিন সপ্তাহ পরে আমি লক্ষ্য করলাম আজামাৎ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছে আর শুকিয়ে যাচ্ছে, প্রেমের জন্যে উপন্যাসের নায়করা যেমন যায়। এ-সব ব্যাপারের কারণ কী?..

'পরে পুরো গল্পটা আমি শুনেছিলাম। গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ তাকে উত্তেজিত করে এমন অবস্থায় এনে ফেলেছিল যে শেষ পর্যন্ত ছেলেটা একেবারে মরিয়া হয়ে পড়েছিল। একবার সে তাকে সোজাসুজি বলল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আজামাৎ, যে ঘোড়াটা তোমার চাই-ই চাই। তবু সেটাকে তোমার পাবার সম্ভাবনা হচ্ছে তোমার মাথার পেছন দিকটা দেখতে পাবার সমান। এখন বল, যদি সেটাকে কেউ তোমাকে দেয় তা হলে কী তাকে তুমি দেবে?..'

''সে যা চাইবে তাই,' আজামাৎ উত্তর দিল।

''তা হলে তোমার জন্যে ঘোড়াটা আমি এনে দোব, কিন্তু এক কড়ারে...। দিব্যি করে বল সে-কাজ তুমি করবে...'

''আমি দিব্যি করছি...। তোমাকেও কিন্তু শপথ করতে হবে!'

''ভালো কথা! আমি দিব্যি করে বলছি ঘোড়াটা তুমি পাবে, তার বদলে শুধু তোমার বোন বেলাকে আমায় দিতে হবে। কারাগিওজ হবে তার কালীম*! আশা করি এই চুক্তি তোমার মনঃপূত হবে।'

'আজামাৎ চুপ করে গেল।

''তুমি চাও না? যা তোমার মর্জি! ভেবেছিলাম তুমি মানুষ হয়ে উঠেছ, কিন্তু দেখছি এখনও তুমি শিশু: জিনে চড়ার পক্ষে তুমি নেহাৎই ছেলেমানুষ...'

'আজামাৎ জ্বলে উঠল।

''কিন্তু আমার বাবা?' সে প্রশ্ন করল।

''কখনও কি তিনি কোথাও যান না?'

''সে-কথা ঠিক...'

''তা হলে তুমি রাজী ত?'

---

* উপজাতির প্রথা অনুসারে স্ত্রীর জন্য যে-সম্পত্তি লোকে দেয়। — সম্পাঃ

''আমি রাজী,' ফিসফিস করে আজামাৎ বলল একেবারে মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে। 'কখন?'

''পরের বার কাজ্‌বিচ যখন এখানে আসবে; গোটা দশেক ভেড়া সে নিয়ে আসবে বলেছে। বাদবাকিটা — আমার মাথাব্যথা। আর চুক্তির তোমার দিকটা খেয়াল রেখো, আজামাৎ!'

'এই ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে তারা একমত হল... আমি নিশ্চয়ই বলব ব্যাপারটা বাস্তবিক কুৎসিত। পরে সে-কথা আমি পেচোরিনকে বলেছিলাম। সে কিন্তু উত্তরে বলেছিল যে আদিম জাতের চের্‌কেসীয় মেয়ের তার মতো সুন্দর স্বামী পাওয়ায় খুশি হওয়া উচিত, কারণ স্থানীয় প্রথামতো সে তার স্বামীই হবে। আরও বলেছিল যে কাজ্‌বিচ হচ্ছে ডাকাত এবং যে-ভাবেই হোক তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। আপনিই বলুন, এর বিরুদ্ধে কী আমি বলতে পারি?.. সে-সময় কিন্তু এই ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। তারপর একদিন কাজ্‌বিচ এসে জিগ্‌গেস করল ভেড়া আর মধু আমাদের দরকার আছে কিনা, আর আমি তাকে বললাম পরের দিন কিছু নিয়ে আসতে।

'ছেলেটিকে গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ বলল, 'আজামাৎ, কাল কারাগিওজ আমার কবলে পড়বে। আজ রাতে বেলাকে যদি এখানে নিয়ে না এসো, কাল তুমি তা হলে ঘোড়াটা দেখতে পাবে না...'

''বেশ!' বলে আজামাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে তার গ্রামে চলে গেল।

'সন্ধেয় গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গ থেকে ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেল। সবকিছু তারা কী করে হাসিল করেছিল সে-কথা আমি জানি না — রাত্রে কিন্তু তারা দু'জনেই ফিরল আর প্রহরী দেখল আজামাৎ-এর ঘোড়ার জিনে একটি মেয়েকে হাত-পা বাঁধা আর চাদরে ঢাকা অবস্থায় শুয়ে থাকতে।'

'আর ঘোড়াটা?' ক্যাপ্টেনকে আমি প্রশ্ন করলাম।

'এক মিনিট সবুর করুন, এক মিনিট সবুর করুন। পরের দিন ভোরে যে গোটা দশেক ভেড়াকে সে বিক্রি করতে চেয়েছিল সেগুলোকে তাড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে কাজ্‌বিচ এলো। একটা বেড়ায় তার ঘোড়াটাকে বেঁধে আমার সঙ্গে সে দেখা করতে এলো আর তাকে আমি চা পান করতে দিলাম, কারণ সে ডাকাত হওয়া সত্ত্বেও আমার কুনাকও বটে।

'নানা বিষয়ে আমরা কথা বলতে লাগলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কাজ্‌বিচ

চমকে উঠল; তার চেহারা বদলে গেল আর সে ছুটল জানালাটার দিকে। দুর্ভাগ্যক্রমে জানালাটা পেছনকার উঠোনমুখো ছিল।

‘‘কী হল?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

‘‘আমার ঘোড়াটা!.. ঘোড়াটা!..’ সে বলল, সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কাঁপছে।

‘আর বাস্তবিকই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ আমি শুনতে পেলাম। ‘নিশ্চয়ই কোন কসাক এসে পেঁৗচেছে...’

‘‘না! উরুস্ ইয়ামান, ইয়ামান*,’ সে গর্জন করে উঠল আর বুনো চিতাবাঘের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল। দু’লাফে পেঁৗছল সে উঠোনে; দুর্গের ফটকে এক প্রহরী তার বন্দুক দিয়ে পথ আটকাল, কিন্তু বন্দুকটাকে লাফিয়ে টপকে পথ ধরে সে ছুটল...। দূরে ধুলোর মেঘ উড়ছে — আজামাৎ তেজস্বী কারাগিওজকে ছুটিয়ে চলেছে। ছুটতে-ছুটতে খাপ থেকে কাজ্‌বিচ তার বন্দুকটা বার করে গুলি ছুঁড়ল। এক মিনিট সে স্থির হয়ে দাঁড়াল, যতক্ষণ না নিঃসন্দেহ হল সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে; তারপর সে আর্তনাদ করে উঠল, পাথরে আছড়ে ফেলে বন্দুকটাকে টুকরো-টুকরো করে ফেলল, আর মাটির ওপর পড়ে বাচ্চার মতো কাঁদতে লাগল...। দুর্গের ভেতরকার লোকজন তার চারধারে ভিড় করে দাঁড়াল, কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পেল না। খানিক দাঁড়িয়ে নানা কথা বলাবলি করে তারা সবাই ফিরে গেল। আমি আদেশ দিলাম ভেড়ার দাম বাবদ টাকা তার পাশে রেখে দিতে, সে কিন্তু ছুঁলও না। সে শুধু মুখ নীচু করে মড়ার মতো পড়ে রইল। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সমস্ত রাত ধরে সে ওই ভাবে শুয়েছিল? পরের দিন সকাল সে শুধু দুর্গে ফিরেছিল জিগ্‌গেস করতে কেউ জানে কিনা চোরটা কে? একজন প্রহরী, যে আজামাৎকে দেখেছিল ঘোড়াটা খুলতে আর সেটা ছুটিয়ে চলে যেতে, মনে করে নি কথাটা লুকোবার দরকার আছে। নামটি শোনবার পর কাজ্‌বিচের চোখগুলো জ্বলে উঠল আর সে যাত্রা করল আজামাৎ-এর বাবার গ্রামের দিকে।’

‘তার বাবা কী করলেন?’

---

* রুশরা খারাপ, খারাপ! (তুর্কী ভাষায়)

'মুশকিল হল কাজ্‌বিচ তাঁর দেখা পায় নি। দিন ছয়েকের জন্যে তিনি কোথায় যেন গিয়েছিলেন। তিনি না গেলে কি আজামাৎ তার বোনকে চুরি করে আনতে পারত?

'বাপ ফিরে দেখলেন ছেলে আর মেয়ে কেউই নেই। ছেলেটা ছিল ধূর্ত; সে ভালো করেই জানত ধরা পড়লে তার মাথাটার দাম কাণাকড়িও নয়। তাই তারপর থেকেই সে ফেরার। খুব সম্ভব সে কোনো আব্রেক দস্যুদলে যোগ দিয়েছিল, আর সম্ভবত তার উন্মত্ত জীবন তেরেকের কিংবা কুবানের ওপারে শেষ হেয়ছিল।*) তা-ই তার প্রাপ্য!..

'স্বীকার করতেই হবে যে ব্যাপারটা আমার পক্ষেও সহজ হয় নি। যেই শুনলাম চের্‌কেসীয় মেয়েটি গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে রয়েছে, আমি সামরিক পোশাক পরে তরোয়াল ঝুলিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

'প্রথম ঘরের বিছানায় সে শুয়েছিল। একটা হাত তার মাথার নীচে, অন্য হাতে অনেকক্ষণ-নিভে-যাওয়া একটা পাইপ। পরের ঘরে যাবার দরজাটা চাবি বন্ধ, আর তালার গায়ে চাবিটা আঁটা নেই; এক লহমায় এই সমস্ত আমি লক্ষ্য করলাম...। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিলাম, চৌকাঠে পা ঠুকলাম, কিন্তু সে এমন ভাব দেখাল যেন শুনতে পায় নি।

''এনসাইন মশাই!' যত কঠোরভাবে আমার পক্ষে বলা সম্ভব বললাম। 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি?'

''ওহো, কেমন আছেন মাক্সিম মাক্সিমীচ! একটা পাইপ ধরাতে চান?' না উঠেই সে উত্তর দিল।

''আমাকে ক্ষমা করবেন! আমি মাক্সিম মাক্সিমীচ নই: আপনার কাছে আমি একজন ক্যাপ্টেন!'

''আহা! তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি কি চা খাবেন? শুধু যদি জানতেন আমার মনে কী রকম ভাবনার বোঝা চেপে আছে!'

''আমি সব্‌ কথা জানি,' বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম।

''তা হলে ত আরোই ভালো। সমস্ত বৃত্তান্ত আবার বলার মতো আমার মানসিক অবস্থা এখন নয়।'

''এনসাইন মশাই, আপনি এমন এক অপরাধ করেছেন যার জন্যে আমাকেও হয়তো জবাবদিহি করতে হতে পারে...'

''নিশ্চয়ই, কেন নয়? আমরা সব সময় কি সবকিছুই সমানভাবে ভোগ করি নি?'

''তামাসা করার সময় এটা নয়। আপনার তরোয়ালটা সমর্পণ করবেন কি?*)

''মিত্‌কা, তরোয়ালটা!..'

'মিত্‌কা তরোয়ালটা এনে দিল। এইভাবে আমার কর্তব্য করে বিছানায় বসে আমি বললাম, 'শোনো গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে কাজটা ভালো কর নি।'

''কী ভালো করি নি?'

''বেলাকে চুরি করে আনা...। আজামাৎটা কী বদমাইশ!.. নাও, এখন এটা স্বীকার করো,' তাকে আমি বললাম।

''স্বীকার করতে যাব কেন? মেয়েটিকে আমার ভালো লাগে!..'

'এ-কথার কী উত্তর দোব, বলুন?.. আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তাকে আমি বললাম যে মেয়েটির বাবা জোর করলে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতেই হবে।

''না, ফিরিয়ে দিতে হবে না!'

''কিন্তু তিনি যদি জানতে পারেন তা হলে কী হবে?'

''তিনি জানতে পারবেন কী করে?'

'আবার আমি কথা খুঁজে পেলাম না।

''শুনুন, মাক্সিম মাক্সিমীচ,' খানিকটা উঠে পেচোরিন বলল। 'আপনি লোক ভালো — বর্বরটার হাতে আমরা যদি মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিই তা হলে হয় সে তাকে মেরে ফেলবে, নয় ত বিক্রি করে দেবে। যা ঘটে গেছে তাকে ফেরানো যায় না, আর অতিরিক্ত তৎপর হয়ে সবকিছু পণ্ড করে লাভ নেই। আপনি তরোয়ালটা রাখুন, মেয়েটিকে কিন্তু আমায় রাখতে দিন...'

''তাকে আমি একবার দেখতে চাই,' আমি বললাম।

''এই দরজার পেছনে সে রয়েছে; আমি আজ নিজেই তাকে দেখতে চেয়ে হতাশ হয়েছি। জড়সড় হয়ে শাল মুড়ি দিয়ে এক কোণে সে বসে আছে। সে কথাও বলে না, মুখ তুলে তাকায়ও না; হরিণের মতো ভীরু সে। তাতার ভাষা-জানা দোকানদারের স্ত্রীকে আমি নিযুক্ত করেছি তার দেখাশোনার জন্যে। আর তার মাথায় এই কথাটা ঢোকাবার জন্যে যে সে আমার, কারণ আমি ছাড়া সে কখনই অন্য কারুর হবে না,' টেবিলের ওপর

ঘ্যষি মেরে সে বলল। কথাটা আমাকেও স্বীকার করতে হল...। আমি কী করতে পারি বল্যন? এমন এক ধরনের লোক আছে যাদের কথায় রাজী না হয়ে পারা যায় না।'

'শেষ পর্যন্ত কী হল?' মাক্সিম মাক্সিমীচকে আমি প্রশ্ন করলাম। 'শেষ পর্যন্ত সত্যিই মেয়েটিকে কি সে জয় করতে পেরেছিল, নাকি মেয়েটি তার নিজের গ্রামের জন্যে মন-কেমন করে মারা গেল?'

'শ্যন্যন, তার গ্রামের জন্যে মেয়েটির মন-কেমন করবে কেন? তার গ্রাম থেকে যে-পাহাড়গ্যলো দেখা যায় দ্যর্গ থেকেও সেই পাহাড়গ্যলো সে দেখতে পেত, এই সব অশিক্ষিত লোকরা শ্যধ্য তাই চায়। তা ছাড়া গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ রোজই তাকে কিছ্য-না-কিছ্য উপহার দিত। প্রথমে সগর্বে সে একটিও কথা না বলে উপহারগ্যলো একপাশে ছ্যঁড়ে ফেলে দিত, ফলে সেগ্যলো দোকানদারের স্ত্রীর সম্পত্তি হয়ে যেত আর তার বাগ্মিতাও বাড়াত। আঃ, উপহার! এক টুকরো রঙীন কাপড়ের জন্যে মেয়েরা কী না করে!.. কিন্তু আমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছি...। তার হৃদয় জয় করার জন্যে গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচকে দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা করতে হয়েছিল; ইতিমধ্যে সে তাতার ভাষা বলা শিখতে লাগল আর বেলাও আমাদের ভাষা ব্যঝতে শ্যর্য করল। ধীরে-ধীরে তার দিকে ম্যখ ফেরাতে লাগল মেয়েটি, প্রথম আড়চোখে। কিন্তু সর্বদাই সে বিষণ্ণ থাকত আর আমারও মন খারাপ না হয়ে পারত না, যখন পাশের ঘর থেকে নীচু গলায় তাকে তার নিজের ভাষায় গান গাইতে শ্যনতাম। জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার যে-দৃশ্য দেখেছিলাম সে-কথা কখনও আমি ভুলব না: বেলা বেঞ্চিতে বসেছিল, তার ম্যখটা ব্যকের ওপর ঝ্যঁকে পড়েছে আর গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

''শোনো, পরী আমার,' সে বলছিল, 'তুমি কি ব্যঝতে পারছ না যে একদিন না একদিন তুমি আমার হবে — কেন তা হলে আমাকে এমন যন্ত্রণা দাও? কিংবা হয়ত তুমি কোনো চেচেনীয়কে ভালোবাস? যদি তাই তুমি বাস, তা হলে এই ম্যহ্যর্তে তোমাকে আমি গ্রামে ফিরে যেতে দেব।' সে এমন ভাবে শিউরে উঠল যে প্রায় তা চোখেই পড়ে না আর মাথা নাড়ল। 'কিংবা,' পেচোরিন বলে চলল, 'তোমার কাছে আমি কি একান্তই ঘৃণার পাত্র?' মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'হয়ত তোমার ধর্ম তোমাকে বারণ করেছে আমায় ভালোবাসতে?' মেয়েটি ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, কিন্তু কথা বলল না। 'আমাকে

বিশ্বাস করো, সমস্ত জাতির জন্যে মাত্র একটি আল্লাই আছেন, তিনি যদি আমাকে তোমায় ভালোবাসবার অনুমতি দিয়ে থাকেন তা হলে কেন তিনি তোমাকে নিষেধ করবেন আমায় ভালোবাসতে?' সে তার মুখের দিকে সোজা তাকাল, যেন এই নতুন চিন্তায় সে দারুণ বিস্মিত হয়েছে; তার চোখে সন্দেহের ছায়া, সে আশ্বাস খুঁজছিল। কী অদ্ভুত তার চোখ ছিল! দুটো জ্বলন্ত কয়লা থেকে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। 'লক্ষ্মী, মিষ্টি বেলা, শোনো!' পেচোরিন বলে চলল। 'তোমাকে কী রকম ভালোবাসি দেখতে পাচ্ছ। তোমাকে খুশি করার জন্যে সবকিছু করতে আমি প্রস্তুত। আমি চাই তুমি আনন্দে থাক; যদি আবার মন-মরা হয়ে থাক তা হলে আমি বাঁচব না। আমাকে কথা দাও, তুমি আরও হাসিখুশি হবে?' এক মুহূর্ত সে ভাবল, তার কালো চোখ দুটি পেচোরিনের মুখ খুঁটিয়ে দেখে চলল, তারপর সে সস্নেহে হেসে রাজী হয়ে মাথা দোলাল। মেয়েটির হাত তুলে নিয়ে তাকে চুম্বন করার জন্য সে সাধ্যসাধনা করে চলল; মেয়েটি কিন্তু দুর্বলভাবে বাধা দিয়ে বারবার বলে চলল, 'দয়া কর, দয়া কর, না, না।' পেচোরিনের জেদ চেপে গেল; মেয়েটি কেঁপে উঠে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

''আমি তোমার বন্দী, তোমার বাঁদী,' সে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি আমার ওপর জোর খাটাতে পার।' আর আবার তার চাখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল।

'গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ নিজের কপালে ঘুষি মেরে পাশের ঘরে দৌড়ে চলে গেল। তার কাছে আমি গেলাম; পেছনে হাত মুড়ে বিষণ্ণ মুখে সে পায়চারি করছিল।

''এবার কী, মশাই?' আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

''ও মেয়ে নয়, পিশাচী!' সে উত্তর দিল। 'কিন্তু আমি আপনার কাছে শপথ করে বলছি যে সে আমার হবে!..'

'আমি মাথা নাড়লাম।

''আপনি বাজী ফেলতে চান?' সে বলল, 'এক সপ্তাহের মধ্যে ওকে আমি জয় করব।'

''বেশ, তাই হোক!'

'আমরা একে অন্যের হাতের ওপর চাপড় মেরে এই বাজীতে রাজী হয়ে বিদায় নিলাম।

'পরের দিন কিজ্‌লিয়ারে নানা জিনিস কেনার জন্য সে এক দূত পাঠাল

আর এত ধরনের পারস্য দেশীয় জামা-কাপড় এসে পেঁাছল যে তার লেখা-জোখা নেই।

‘‘কী মনে করেন, মাক্সিম মাক্সিমীচ?’ উপহারগুলি আমাকে দেখাতে-দেখাতে সে প্রশ্ন করল। ‘এশিয়ার কোনো সুন্দরী কি এই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ঠেকাতে পারবে?’

‘‘চের্‌কেসীয় মেয়েদের আপনি চেনেন না,’ আমি বললাম। ‘তারা জর্জীয় মেয়ে কিংবা ককেশাসের ওপাশের তাতার মেয়েদের মতো একেবারেই নয় — একেবারেই নয়। চরিত্র সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব আইন-কানুন আছে; জানেন ত, অন্য ভাবে তারা মানুষ হয়েছে।’ হেসে গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ এক সামরিক সঙ্গীত শিস দিতে লাগল।

‘যাই হোক, দেখা গেল আমার কথাই ঠিক: উপহারগুলো মাত্র অর্ধেক কাজ করেছে; সে আরও অমায়িক আর প্রত্যয়শীল হয়ে উঠল, কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। তাই পেচোরিন ঠিক করল হাতের শেষ তাসটা খেলতে। একদিন সকালে সে আদেশ দিল ঘোড়ায় জিন লাগাতে, চের্‌কেসীয়দের মতো পরল জামা-কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিল আর তারপর তার কাছে গেল। ‘বেলা!’ সে বলল, ‘তুমি জান, তোমায় আমি কী রকম ভালোবাসি। তোমাকে চুরি করব স্থির করেছিলাম এই বিশ্বাসে যে যখন তুমি আমাকে চিনতে পারবে তুমিও আমাকে ভালোবাসবে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম; তাই, বিদায়! আমার যা-কিছু আছে সমস্তই তোমাকে দিয়ে গেলাম, ইচ্ছে হলে তোমার বাবার কাছে তুমি ফিরে যেতে পার — তোমাকে মুক্তি দিলাম। তোমার ওপর আমি অন্যায় করেছি, তাই আমার শাস্তি পাওয়া দরকার। বিদায়, ঘোড়ায় চড়ে আমি চলে যাব — কোথায়? জানি না! হয়ত অল্প দিনের মধ্যেই আমি গুলি কিংবা তরোয়ালের আঘাতে মারা যাব; সে-ঘটনা ঘটলে পর আমার কথা ভেব আর আমাকে ক্ষমা করতে চেষ্টা কোরো।’ মুখ ফিরিয়ে বিদায় নেবার জন্য তার দিকে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল। মেয়েটি হাত গ্রহণ করল না কিংবা একটি কথাও বলল না। দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে ফাঁক দিয়ে তার মুখ আমি দেখতে পেলাম। তার জন্য আমার দুঃখ হল — তার ছোট্ট সুন্দর মুখটা মড়ার মতো কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে! কোনো উত্তর শুনতে না পেয়ে দরজার দিকে পেচোরিন কয়েক পা এগিয়ে গেল। সে কাঁপছিল, আর জানেন, সত্যি আমি বিশ্বাস করি সে যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল সত্যিই তা করতে পারত। ঈশ্বর জানেন, সেই প্রকৃতির

লোকই সে ছিল। কিন্তু দরজায় সে হাত দিতে-না-দিতে মেয়েটি লাফিয়ে উঠে, ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। বিশ্বাস করুন, দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে আমিও কাঁদতে লাগলাম, মানে সত্যি-সত্যি কাঁদি নি, কিন্তু — কী বলি, যাই হোক সে এক বোকার মতো কাণ্ড!..'

ক্যাপ্টেন চুপ করলেন।

'স্বীকার করতে লজ্জা নেই,' খানিক পরে নিজের গোঁফ ধরে টানতে-টানতে তিনি বললেন, 'আমার বিরক্ত লাগছিল কারণ কোনো মেয়ে কখনও আমাকে অমন ভাবে ভালোবাসে নি।'

'তাদের আনন্দ কত দিন টিকেছিল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'মেয়েটি স্বীকার করেছিল যে প্রথম দিন তাকে দেখার পর থেকে পেচোরিনকে প্রায়ই সে স্বপ্নে দেখত আর অন্য কোনো পুরুষ তার মনে ও-রকম রেখাপাত কখনও করে নি। হ্যাঁ, তারা সুখী হয়েছিল!'

'কী একঘেয়ে!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি বলে উঠলাম। বাস্তবিক আমি আশা করছিলাম শেষটা বিয়োগান্তক হবে। আমার আশা এমন অকস্মাৎ চুরমার হয়ে যেতে দেখে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেলাম!.. আমি বলে চললাম, 'তার বাবা কি তাহলে অনুমানই করতে পারেন নি যে সে আপনাদের সঙ্গে দুর্গের মধ্যে ছিল?'

'মনে হয় খানিকটা তিনি অনুমান করেছিলেন। যাই হোক, দিন কয়েক পরে আমরা শুনেছিলাম তিনি নিহত হয়েছিলেন বলে। ঘটনাটা এই...'

আবার আমার কৌতূহলের উদ্রেক হল।

'আপনাকে বলা দরকার যে কাজ্‌বিচের ধারণা হয়েছিল যেন আজামাৎ তার বাবার সমর্থন পেয়েই ঘোড়াটা চুরি করেছে, অন্তত আমার ত তা-ই মনে হয়। তাই সে একদিন গ্রাম থেকে তিন ভার্স্ট দূরে রাস্তার কাছে ওত্‌ পেতে রইল; বৃদ্ধ তখন তাঁর মেয়ের নিষ্ফল খোঁজ করে ফিরছিলেন। বৃদ্ধ তাঁর প্রজাদের পেছনে ফেলে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে মিলিয়ে-আসা গোধূলিতে পথের ওপর দিয়ে ধীরে-ধীরে যখন ঘোড়ায় চড়ে ফিরছিলেন, কাজ্‌বিচ তখন অকস্মাৎ এক ঝোপের ভেতর থেকে বেড়ালের মতো লাফ মেরে ঘোড়ার ওপর তাঁর পেছনে উঠে, ছোরা দিয়ে আঘাত করে তাঁকে মাটিতে ফেলে ঘোড়ার লাগাম ধরে বসে তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক জন প্রজা এক পাহাড়ের ওপর থেকে ঘটনাটা দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু পেছন-

পেছন তাড়া করে যাওয়া সত্ত্বেও তারা কাজ্‌বিচকে ধরতে পারে নি।'

'অতএব সে তার ঘোড়ার ক্ষতিপূরণ করেছিল আর প্রতিশোধও তুলেছিল,' আমার সঙ্গীর কাছ থেকে মতামত জানবার জন্য আমি বললাম।

'তাদের আইন অনুসারে সে ঠিকই করেছিল,' ক্যাপ্টেন বললেন।

যে-সব জাতের মধ্যে তাদের থাকতে হয় সে-সব জাতের প্রথাকে রুশী মানুষের মেনে নেবার ক্ষমতা দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি বিস্মিত হলাম। আমি জানি না মানসিক এই চরিত্র পাপ না পুণ্যের পরিচয়; কিন্তু এর থেকে প্রকাশিত হয় এক আশ্চর্য মানসিক নমনীয়তা ও সেই সংযত স্বাভাবিক বুদ্ধি যা অন্যায়কে ক্ষমা করে, যখনি সে-অন্যায় প্রয়োজনীয় কিংবা যাকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব বলে মনে হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের চা পান শেষ হয়েছে। বাইরে অনেকক্ষণ আমাদের ঘোড়াগুলো জোতা হয়েছে আর তুষারের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। পশ্চিম আকাশে চাঁদ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে আর ডুবতে চলেছে সেই কালো মেঘের মধ্যে যেগুলো দূর-পাহাড়ের চুড়োর ছেঁড়া পর্দার মতো ভেসে আসছে। আমরা বাইরে বেরুলাম। আমার সঙ্গীর ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে উঠল, আর শান্ত ঊষার আভাস পাওয়া গেল। পূব দিকের পাণ্ডুর আলো ক্রমশ বেগণী রঙের আকাশে ছড়িয়ে পড়ার এবং তার আভা অক্ষত তুষার-ঢাকা খাড়াই পাহাড়ের গায়ে প্রসারিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক উপরকার আশ্চর্যভাবে পরস্পরকে জড়ানো তারার মালাগুলো একের পর এক মিলিয়ে যেতে লাগল। ডাইনে বাঁয়ে হাঁ করে আছে অন্ধকার রহস্যময় অতলস্পর্শ গহ্বরগুলো। উঁচু পাহাড়ের ফাটল আর গুহার মধ্যে দিয়ে সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আর এঁকেবেঁকে কুয়াশারা সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে, যেন আসন্ন দিনের ভয়ে।

আকাশে আর পৃথিবীতে এক বিপুল শান্তি, সকালে প্রার্থনা করার সময় মানুষের বুকে যে-রকম শান্তি থাকে। মাঝে মাঝে ঘোড়াদের হিম-শুভ্র কেশর এলোমেলো করে ঠাণ্ডা পূব বাতাসের ঝাপ্‌টা আসছে। আমরা যাত্রা শুরু করলাম। গুডপাহাড়ের*) আঁকাবাঁকা পথে পাঁচটা রোগা ঘোড়া আমাদের গাড়িগুলো অতি কষ্টে টেনে নিয়ে চলল। আমরা পিছন-পিছন চললাম। ঘোড়াগুলো যখন টানতে পারছিল না গাড়ির চাকায় তখন আমরা পাথর আটকাতে লাগলাম; মনে হল পথটা সোজা আকাশের দিকে তাকিয়ে

রয়েছে, কারণ যতদূর নজর চলে সেটা ক্রমাগত ওপরে উঠেই চলেছে আর অবশেষে মেঘের মধ্যে গেছে মিলিয়ে। সেই মেঘগুলো শিকার-সন্ধানী শকুনের মতো আগের দিন থেকে গুড পাহাড়ের চুড়োয় বসেছিল। পায়ের তলায় তুষার মর্মর শব্দ করছে। বাতাস এত হালকা হয়ে গেছে যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ক্রমাগতই মনে হতে লাগল আমার রক্ত ছুটেছে মাথার দিকে। তবুও সেই সঙ্গে আমার সত্তার মধ্যে এক আনন্দের প্রবাহ বইতে লাগল। কেন জানি না পৃথিবীর এত ওপরে থাকতে ভালো লাগল। স্বীকার করি, অনুভূতিটা ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু সমাজের নিয়ম-কানুন থেকে যত দূরে আমরা চলে আসি আর প্রকৃতির যত কাছে পেঁছিই ততই আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার ছেলেমানুষ হয়ে পড়ি। আত্মা যা-কিছু সংগ্রহ করেছে তার ভার মুক্ত হয় — আর সেটা হয়ে যায় একদিন সে যা ছিল এবং আবার ভবিষ্যতে একদিন হয়ত সে যা হবে। আমার মতো যাকেই নির্জন পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, ক্রমাগত দেখতে হয়েছে তাদের অদ্ভুত গড়ন আর সাগ্রহে নিশ্বাস নিতে হয়েছে তাদের গিরিসংকটের প্রাণবন্ত বাতাসে — তিনি অবশ্যই বুঝবেন এই রহস্যময় ছবিগুলিকে বর্ণনা করা, আঁকা আর রঙীন করে তোলার ব্যাপারে আমার অদম্য আগ্রহের কথা। অবশেষে আমরা গুড পাহাড়ের চুড়োয় পেঁছিলাম আর আমাদের চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখার জন্য থামলাম: একটা ধূসর মেঘ এই পাহাড়ের চুড়োয় বিশ্রাম নিচ্ছে আর তার ঠান্ডা নিশ্বাসে আসন্ন তুষার-ঝঞ্ঝার সংকেত। কিন্তু পুব দিকটা এত পরিষ্কার আর সোনালী যে আমরা, অর্থাৎ ক্যাপ্টেন আর আমি, সে-কথা বেমালুম ভুলে গেলাম...। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেনও: কারণ আমাদের মতো উল্লসিত গল্প-বলিয়ে আর লিখিয়েদের চেয়েও সরল হৃদয়রা প্রকৃতির সৌন্দর্য আর মহিমা হাজার গুণ বেশী অনুভব করতে পারে।

'নিশ্চয়ই আপনি এ-ধরনের আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত,' তাঁকে আমি বললাম।

'হ্যাঁ মশাই, মানুষ এমন কি গুলির শব্দেও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে, অর্থাৎ যে হৃদ্‌স্পন্দন অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্রুত হয়ে উঠেছে তাকে লুকাতে পারে।'

'আমি কিন্তু অন্য কথা শুনেছি। আমি শুনেছি যে কোনো-কোনো অভিজ্ঞ যোদ্ধার কাছে সে-শব্দ সঙ্গীতের মতো।'

'হ্যাঁ, সে-শব্দ মিষ্টিও — যদি আপনি জানতে চান; কিন্তু তার একমাত্র

কারণ সে-শব্দ হৃদয়ের স্পন্দন আরও দ্রুত হয়ে ওঠে। দেখুন,' পূব দিকে হাত তুলে তিনি বললেন, 'কী সুন্দর দেশ!'

বাস্তবিক এ-রকম দৃশ্য আবার দেখতে পাবার আশা আমার কম: আমাদের নীচে কোইশাউর উপত্যকা, আরাগ্‌ভা ও আরেকটি নদী তার উপর দিয়ে দুটি রুপোলি সুতোর মতো বয়ে গেছে; তার উপর এক নীলচে কুয়াশা হামাগুড়ি দিয়ে আসছে, সবচেয়ে কাছের ছায়াচ্ছন্ন গিরিসংকটে সকালের উষ্ণ রশ্মি থেকে আশ্রয় নিতে চাচ্ছে; ডাইনে আর বাঁয়ে পর্বতশ্রেণী, একটি অন্যটির চেয়ে উঁচু, পরস্পরকে কাটাকাটি করে তুষার ও ঝোপঝাড়ে আবৃত হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়, কিন্তু কোনো দুটি পাহাড় এক রকমের নয় — আর এই সমস্ত তুষার গোলাপী আভা বিচ্ছুরিত করে এত প্রফুল্ল আর উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে যে সেখানে চিরকাল ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। সূর্য সবে মাত্র বেরুচ্ছে এক গাঢ় নীল রঙের পাহাড়ের পিছন থেকে যেটাকে শুধু অভ্যস্ত দৃষ্টি ঝড়ের মেঘ বলে চিনতে পারে। কিন্তু সূর্যের খানিকটা উপরে বিছিয়ে রয়েছে রক্তিম একটি আলোর ফিতে। তার দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন আমার সঙ্গী। 'আমি আপনাকে বলেছিলাম,' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সামনে দুর্যোগ। আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে, নইলে ক্রেস্তোভায়ার পথে*) ওটা আমাদের ধরে ফেলবে। ওহে, চটপট কর!' গাড়োয়ানদের উদ্দেশে তিনি বললেন।

ব্রেকের কাজ করার জন্য গাড়ির চাকায় চেন জড়ানো হল, যাতে সেগুলো পিছলে না যায়। ঘোড়ার রাশ ধরে আমরা নামতে শুরু করলাম। আমাদের ডান দিকে এক উঁচু পাহাড় আর বাঁ দিকে এত গভীর একটা খাদ যে তলাকার এক ওসেতীয় গ্রামকে সোয়ালো পাখির বাসার মতো ছোটো দেখাচ্ছে; ভেবে শিউরে উঠলাম যে বছরে বার দশেক এই পথ দিয়ে রাত্রিবেলা বার্তাবাহীরা তাদের ঝাঁকুনি-দেওয়া গাড়ি থেকে না নেমেই যায় — পথটা এত সরু যে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে না। আমাদের একজন গাড়োয়ান রুশী ইয়ারস্লাভ্‌ল্‌-এর চাষী, অন্য জন ওসেতীয়। ওসেতীয় পাশের দুটো ঘোড়াকে সময়মতো খুলে মাঝের ঘোড়াটার লাগাম ধরে সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে চলেছে। কিন্তু আমাদের অসাবধান রুশীটি চালকের আসন থেকে নামবার পরিশ্রম পর্যন্ত করে নি! যখন তার কাছে আমি প্রস্তাব করলাম যে আমার সুটকেসটার জন্য অন্তত — যেটাকে খাদের

মধ্যে নেমে পুনরুদ্ধার করার বাসনা আমার নেই — তার কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত ছিল, সে উত্তর দিল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, মশাই! ভগবানের দয়ায় ঠিক অন্যদের মতোই ওখানে আমরা পেঁছব। এই প্রথম আমরা ওখানে যাচ্ছি না।' আর সে ঠিকই বলেছিল; কথাটা সত্যি যে সেখানে হয়ত আমরা নিরাপদে পেঁছতে না-ও পারতাম, তবু আমরা নিরাপদেই পেঁছলাম। আর সব মানুষই যদি ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবে তা হলে তারা দেখতে পাবে জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই...

সম্ভবত বেলার গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনতে আপনারা চান? প্রথমত, আমি কিন্তু উপন্যাস লিখতে বসি নি, বসেছি ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে। তাই ক্যাপ্টেন যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবিক আবার সেটা বলতে শুরু করেছিলেন তার আগে তাঁকে দিয়ে বলাতে পারি না। তাই, আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে, নয়ত ইচ্ছে হলে কয়েকটা পাতা উল্টে যেতে হবে। আমি কিন্তু উপদেশ দেব উল্টে না যেতে, কারণ ক্রেস্তোভায়া পাহাড় (অথবা ল্য মণ্ট সেণ্ট ক্রিস্তোফ*, জ্ঞানী গাম্বা*⁾ যে-নাম দিয়েছিলেন) অতিক্রম করা আপনাদের কৌতূহলের উপযুক্ত। তারপর আমরা গুড পাহাড় থেকে চের্‌তোভা উপত্যকায় নামতে লাগলাম...। কি রোমাণ্টিক নামটা! অগম্য উঁচু পাহাড়গুলোয় ইতিমধ্যেই হয়তো আপনারা মন্দ আত্মাদের আড্ডা বলে কল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছেন — কিন্তু করে থাকলে ভুল করছেন: চের্‌তোভা উপত্যকা নামটা এসেছে 'চের্‌তা' থেকে, 'চের্‌ত্‌' থেকে নয়,*⁾ কারণ জর্জিয়ার সীমানা একদা এখান দিয়ে অতিক্রম করেছিল। উপত্যকাটি বায়ুতাড়িত তুষাররাশি দ্বারা আবৃত। ফলে সারাতভ, তাম্বোভ*⁾ এবং আমাদের দেশের অন্যান্য সুন্দর জায়গার সঙ্গে তার গভীর সাদৃশ্য আছে।

'ওইখানে ক্রেস্তোভায়া,' চের্‌তোভা উপত্যকার দিকে নেমে আসার সময় ক্যাপ্টেন তুষার-ঢাকা এক পাহাড়ের দিকে হাত তুলে দেখালেন। চুড়োর উপর পাথরের ক্রস্‌-চিহ্নের একটি কালো পরিলেখ দেখা যাচ্ছে, তাকে ছাড়িয়ে গেছে অতি অস্পষ্ট এক পথ। পাহাড়ের পথ যখন তুষারে ডুবে যায় তখন এই পথ ব্যবহৃত হয়। আমাদের গাড়োয়ানরা বলল যে এখনও তুষারের ধস নামে নি। ঘোড়াগুলোর যাতে পরিশ্রম না হয় সেজন্য তারা আমাদের ঘুর-পথে নিয়ে চলল। পথের এক মোড় ঘোরার পর আমরা পাঁচজন

---

* সাধু ক্রিস্তোফের পাহাড় (ফরাসী ভাষায়)।

ওসেতীয়ের দেখা পেলাম। তারা আমাদের কাছে কাজ করতে চাইল আর চাকাগুলোকে ধরে চিৎকার করতে-করতে আমাদের গাড়িগুলো চালাতে সাহায্য করল। বাস্তবিক পথটা বিপজ্জনক। আমাদের ডান দিকে মাথার উপর তুষারের স্তূপ ঝুলছে। সম্ভবত বাতাসের প্রথম ঝাপ্টাতেই তারা খাদের মধ্যে পড়তে উদ্যত হয়ে রয়েছে। সরু পথের কয়েক অংশ তুষারে-ঢাকা, এখানে-সেখানে পা ডুবে যায়। অন্যগুলো রৌদ্রে আর রাত্রির তুহিনের প্রভাবে জমে বরফ হয়ে গেছে। তাই আমরা নিজেরা অতি কষ্টে এগুতে লাগলাম। ঘোড়াগুলো বারবার পিছলে পড়ে যেতে লাগল। আমাদের বাঁ পাশে গভীর একটা ফাটল হাঁ করে রয়েছে। তার তলায় এক জলস্রোত। বরফের আবরণের জন্য কখনও সেটা চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, কখনও বা কালো পাথরের টুকরোর মধ্যে সবেগে ফেনিল হয়ে উঠছে। ক্রেস্তোভায়া পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে পুরো দু'ঘণ্টা কেটে গেল — দু'ঘণ্টা লাগল দু'ভার্স্ট পথ অতিক্রম করতে! ইতিমধ্যে মেঘগুলো নীচে নেমে এলো আর তুষার আর শিল পড়তে শুরু করল। বাতাস গিরিসংকটগুলোর মধ্যে সবেগে প্রবেশ করে বিকট চিৎকার আর শিস দিয়ে উঠল। দেখতে-দেখতে পুব-থেকে-আসা কুয়াশার ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে পাথরের ক্রস্‌টা অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রত্যেকটি ঢেউ অন্যটির চেয়ে ঘন...। প্রসঙ্গত, এই ক্রস্ সম্পর্কে অদ্ভুত অথচ সাধারণ্যে স্বীকৃত এক উপাখ্যান আছে — সেটি নাকি ককেশাসের মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় সম্রাট প্রথম পিওতর*) খাড়া করেছিলেন। কিন্তু, পিওতর প্রথমত কেবল দাগেস্তানে ছিলেন*) এবং দ্বিতীয়ত, ক্রসের উপর বড়-বড় হরফে খোদাই করে লেখা আছে যে জেনারেল ইয়েরমোলভের আদেশে*) সেটিকে বসানো হয়েছিল — নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে — ১৮২৪ সালে। লেখাটা খোদাই করা থাকা সত্ত্বেও উপাখ্যানটি এমন দৃঢ়মূল বিস্তার করেছে যে কোন্‌টা যে বিশ্বাসযোগ্য সে-কথা বোঝা কঠিন। বিশেষ করে আমরা যখন খোদাই করে লেখা বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত নই।

কোবি-র স্টেশনে পেঁছতে আমাদের এখনও জমা-বরফ-ঢাকা পাথরের স্তর আর নরম তুষারের ভিতর দিয়ে আরও পাঁচ ভার্স্ট নামতে হবে। ঘোড়াগুলোর ওপর দিয়ে নিদারুণ ধকল গেছে, আর আমরা সম্পূর্ণ জমে গেছি — আর এদিকে তুষার-ঝঞ্ঝা দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে বইতে শুরু করেছে, অনেকটা আমাদের উত্তর দেশের তুষার-ঝঞ্ঝার মতো, শুধু তার উন্মত্ত একঘেয়ে ধ্বনি আরও করুণ আর আরও শোকাবহ। আমি ভাবলাম,

'হে আমার নির্বাসিত,*) তুমিও কাঁদছ তোমার বিশাল, সীমাহীন প্রান্তরের জন্যে, যেখানে তোমার বরফের ডানা মেলবার বিস্তৃতি আছে — আর এখানে তোমার নিশ্বাস আসছে রুদ্ধ হয়ে, তুমি বন্দী হয়ে রয়েছ ঈগলের মতো, যে তার লোহার খাঁচার জাফরির ওপর চিৎকার করে ডানা ঝাপ্‌টায়।'

'ভালো মনে হচ্ছে না!' ক্যাপ্টেন বললেন। 'দেখুন, চারিধারে কুয়াশা ও তুষার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সাবধান, হয় ফাটলের মধ্যে পড়বেন নয়ত কোনো জঘন্য গর্তে যাবেন আটকে, আর নীচেকার বায়দারা*) সম্ভবত এমন ফেঁপে উঠবে যে পেরুনো যাবে না। এই হচ্ছে এশিয়া! মানুষের মতো নদীগুলোকেও বিশ্বাস নেই!'

নাক-দিয়ে-শব্দ-করা আর থেমে-থেমে-যাওয়া ঘোড়াগুলোর উপর চাবুক হাঁকাতে-হাঁকাতে গাড়োয়ানরা চিৎকার আর গালাগালি করে চলল। চাবুক কশানো সত্ত্বেও ঘোড়াগুলো আর এক পা-ও এগুতে চাইছে না।

অবশেষে একজন গাড়োয়ান বলল, 'কর্তা, আজ আমরা কোবি পেঁছিতে পারব না। সময় থাকতে-থাকতে বাঁয়ে মোড় নিতে আদেশ দেবেন না কি? ওই ঢালু জায়গাটায় একটা কালো স্তূপ দেখতে পাচ্ছি — কয়েকটা পাহাড়ী কুঁড়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। যাত্রীরা খারাপ আবহাওয়ায় সব সময় ওখানে থামেন।' তারপর এক ওসেতীয়কে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওরা বলছিল ভোদ্‌কার জন্যে কিছু টাকা দিলে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

'আমি জানি হে জানি, তোমায় বলতে হবে না!' ক্যাপ্টেন বললেন। 'এই হচ্ছে শয়তানরা! যে-কোনো ছুতোয় ভোদ্‌কার জন্যে টাকা পেলে ওরা খুব খুশি হয়।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে যে ওরা না থাকলে আমাদের আরও অসুবিধেয় পড়তে হত।'

তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'হয়ত, হয়ত। কিন্তু এ-রকম পথ-দেখিয়েদের আমি চিনি। সহজাত বুদ্ধি দিয়ে তারা জানতে পারে কখন আপনাকে ঠকানো যায়। ওরা না থাকলে আপনি যেন পথ চিনতে পারেন না।'

অতএব আমরা বাঁয়ে মোড় নিলাম আর তারপর কোনো মতে বহু

অসুবিধের পর ছোট্ট এক আশ্রয়-স্থানে পেঁাছলাম। সেখানে পাথরের চাঁই ও খণ্ড দিয়ে তৈরি দুটি পাহাড়ী কুঁড়ে, ঐ রকমেরই দেয়ালে ঘেরা। ছেঁড়া জামা-কাপড়-পরা সেখানকার লোকরা আমাদের সাদর স্বাগত জানাল। পরে জেনেছিলাম সরকার তাদের ভরণ-পোষণ করেন এই শর্তে যে পথিকরা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়লে তাদের আশ্রয় দিতে হবে।

আগুনের পাশে বসে আমি বললাম, 'এতে ভালোই হবে। এবার আমাকে আপনি বেলার গল্পের শেষটা বলবেন; আমি নিশ্চিত জানি ওখানে সেটা শেষ হয় নি।'

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, 'অত নিশ্চিত কী করে হলেন?' মুখে তাঁর ধূর্ত হাসি, চোখদুটো ঝিকমিক করে উঠল।

'কারণ ওটা স্বাভাবিক নয়। অমন আশ্চর্য যার শুরু, শেষটাও তার তেমনি হওয়া উচিত।'

'ঠিক ধরেছেন...'

'শুনে খুশি হলাম।'

'আপনি খুশি হতে পারেন, আমার কিন্তু ভাবতে বসলে বাস্তবিক খারাপ লাগে। ভারি ভালো ছিল মেয়েটা, বেলা! শেষের দিকে নিজের মেয়ের মতো তাকে ভালোবাসতাম, সে-ও আমাকে ভালোবাসত। আপনাকে বলা দরকার সংসার বলতে আমার কিছু নেই। আজ বারো বছর হল আমার বাবা-মার কোনো খবর পাই নি। আর বিয়ে করা দরকার বলে এর আগে আমার মনে হয় নি। এখন আর বিয়ে করা যে শোভন নয় আপনাকে সে-কথা স্বীকার করতে হবে। তাই কাউকে আদর করতে পেরে আমি খুশি হয়ে উঠলাম। আমাদের কাছে সে গান গাইত আর লেজ্গিংকা নাচ নাচত...। আর সে কী নাচতেই না পারত! আমাদের প্রদেশের তরুণীদের আমি দেখেছিলাম আর একবার মস্কোর নোব্‌ল্‌স ক্লাবে*) — প্রায় কুড়ি বছর আগে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেউই তারা তার পায়ের নখের যোগ্যও নয়!.. গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ তাকে পুতুলের মতো করে সাজাত, আদর আর সোহাগ করত। সে এত সুন্দর হয়ে উঠল যা বিস্ময়কর। তার মুখ আর হাত থেকে রোদ-পোড়া ভাবটা অদৃশ্য হল, আর তার গালদুটো হয়ে উঠল গোলাপী...। কী হাসিখুশি ছিল মেয়েটা, আর আমার পেছনে কী লাগাটাই না লাগত, দুষ্টুটা...। ঈশ্বর তাকে যেন ক্ষমা করেন!..'

'তার বাবার মৃত্যুসংবাদ আপনি তাকে জানাবার পর কী হল?'

'তার নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে খাপ খাইয়ে না নেওয়া পর্যন্ত অনেকদিন আমরা খবরটা চেপে গিয়েছিলাম। তাকে বলবার পর দু'দিন ধরে সে কাঁদল, তারপর সব ভুলে গেল।

'প্রায় চার মাস চমৎকার কাটল। আপনাকে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বলেছি যে গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচের দারুণ শিকারের নেশা ছিল। এক অদম্য শক্তি বনের কাছে তাকে টানত বুনো শুয়োর কিংবা ছাগল শিকার করার জন্যে। এখন কিন্তু দুর্গের সীমানার বাইরে যেতে তার আর ইচ্ছে হয় না। তারপর আমি লক্ষ্য করলাম আবার সে বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। পেছনে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করে বেড়াত। একদিন কাউকে কিছু না বলে তার বন্দুকটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল; সমস্ত সকাল তার আর দেখা নেই। এ-ঘটনা ঘটল একবার, দু'বার, তারপর ক্রমশ ঘন ঘন। আমার মনে হল, 'সবকিছু ভালো চলছে না, নিশ্চয়ই ঝগড়া হয়েছে!'

'একদিন সকালে তাদের দেখতে গিয়ে দেখি কালো সিল্কের বেশ্‌মেৎ পরে বেলা বিছানায় বসে রয়েছে। এত ফ্যাকাশে আর বিষণ্ণ তার চেহারা যে দেখে বাস্তবিক আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

'জিগ্‌গেস করলাম, 'পেচোরিন কোথায়?'

''শিকার করতে গেছে।'

''কখন গেছে সে? আজ?' সে উত্তর দিল না, মনে হল কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছে।

''না, গতকাল,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অবশেষে সে বলল।

''আশা করি তার কোনো বিপদ ঘটে নি?'

''গতকাল সমস্ত দিন ধরে আমি কেবল ভেবেছি আর ভেবেছি,' সে বলল, জলে চোখদুটো ভরে গেছে, 'আর নানা কথা কল্পনা করে ভয় পেয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম, একটা বুনো শুয়োর তাকে আহত করেছে, তারপর ভেবেছিলাম চেচেনীয়রা হয়তো তাকে পাহাড়ে ধরে নিয়ে গেছে...। আর এখন আমার মনে হতে শুরু হয়েছে যে সে আর আমাকে ভালোবাসে না।'

''সত্যি বলছি, লক্ষ্মীটি, এর চেয়ে খারাপ আর কিছু ভাবা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়!'

'কান্নায় সে ভেঙে পড়ল, তারপর সগর্বে মাথা তুলে, চোখ মুছে, বলে চলল:

''আমাকে সে যদি ভালো না-ই বাসে কেন তাহলে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে না? আমি ত জোর করে তার গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাচ্ছি না। আর এভাবে চললে আমি চলে যাব; আমি ত তার বাঁদী নই, আমি রাজার মেয়ে!..'

'তাকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

''শোনো বেলা, তোমার আঁচলের তলায় সমস্তক্ষণ ত সে বসে থাকতে পারে না। সে যুবক, আর শিকার করতে ভালোবাসে। সে যাবে আবার ফিরেও আসবে। কিন্তু তুমি যদি মন-মরা হয়ে থাক তা হলে ফল হবে এই—তোমাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

'সে বলল, 'ঠিকই বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। আমি খুব হাসিখুশি থাকব।' এই বলে হাসতে-হাসতে তার খঞ্জনি নিয়ে সে গাইতে আর নাচতে আর লাফাতে শুরু করল আমার চারিধারে। শীগ্‌গিরই কিন্তু আবার বিছানায় আছড়ে পড়ে হাত দিয়ে সে মুখ ঢাকল।

'তাকে নিয়ে কী আমি করি? আপনি ত জানেন, মেয়েদের সঙ্গে কখনই আমার সম্বন্ধ ছিল না। আমি মাথা ঘামাতে লাগলাম কোনো রকমে তাকে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু ভেবে কিছুই পেলাম না। খানিকক্ষণ দু'জনেই আমরা চুপ করে রইলাম...। আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি খুবই অপ্রীতিকর অবস্থা সেটা!

'অবশেষে তাকে বললাম, 'আমার সঙ্গে দুর্গের প্রাকারে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে করছে কি? ভারি সুন্দর আবহাওয়া!' তখন সেপ্টেম্বর মাস, দিনটা বাস্তবিকই সুন্দর, রোদ উঠেছে অথচ খুব গরম নয়, পাহাড়গুলো এত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যেন মনে হয় কেউ তাদের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম, প্রাকারের মধ্যে এদিক ওদিক চুপচাপ পায়চারি করলাম। খানিক পরে ঘাসের চাপড়ার ওপর সে বসল, আমিও তার পাশে বসলাম। ভাবতে বাস্তবিক মজা লাগে পরিচারিকার মতো আমি তার পেছন পেছন কী রকম ঘুর ঘুর করছিলাম।

'একটু উঁচু জায়গায় ছিল আমাদের দুর্গটা। প্রাকারের ওপর থেকে ভারি সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে: এক দিকে মস্ত খোলা জায়গা, তার ওপর কয়েকটা খাদের দাগ। সেটা শেষ হয়েছে এক জঙ্গলে। সেই জঙ্গল বিছিয়ে রয়েছে পাহাড়ের সারির চুড়ো পর্যন্ত। এই খোলা জায়গার এখানে-সেখানে নানা গ্রাম-থেকে-ওঠা ধোঁয়া চোখে পড়ে আর দেখা যায় ঘোড়ার দলকে চরে

বেড়াতে। অন্য পাশে বয়ে চলেছে ছোট্ট এক নদী, এক পাশে তার ঘন ঝোপ, সেই ঝোপ ঢেকে রেখেছে পাথরের পাহাড়গুলোকে, আর সেই পাহাড়গুলো মিশেছে ককেশাসের প্রধান শ্রেণীর সঙ্গে। আমরা প্রাকারের এক কোণে বসেছিলাম। সেখান থেকে দু'দিকের দৃশ্যই সুন্দর চোখে পড়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্য মন দিয়ে দেখতে-দেখতে লক্ষ্য করলাম ধূসর রঙের ঘোড়ায় চেপে একটা লোক বন থেকে বেরিয়ে ক্রমশ কাছে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ছোট্ট নদীটার ওপারে সে থামল — আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে প্রায় এক শ'সাজেন* দূরে আর তারপর পাগলের মতো ঘোড়াশুদ্ধ ঘুরপাক খেতে লাগল। ব্যাপারটা কী?..

''আমার চেয়ে তোমার চোখ অনেক তরুণ, বেলা। দেখ ত ঘোড়সওয়ারকে চেনো কিনা,' আমি বললাম। 'ভেবে পাচ্ছি না কাকে দেখতে এসে সে ধন্য করছে।'

'লক্ষ্য করে বেলা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও ত কাজ্‌বিচ!'

''ও, সেই ডাকাতটা! আমাদের উপহাস করতে এসেছে নাকি?' খুঁটিয়ে দেখে চিনতে পারছিলাম কাজ্‌বিচকে: সেই রোদে-পোড়া কালচে মুখ আর সেই ময়লা ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়।

'আমার হাত চেপে ধরে বেলা বলল, 'ওটা আমার বাবার ঘোড়া।' পাতার মতো সে কাঁপতে লাগল আর জ্বলে উঠল তার চোখদুটো। মনে-মনে আমি ভাবলাম, 'ওরে আমার বাচ্চা, তোর শিরার মধ্যেও দস্যুর রক্ত বইছে।'

'এক প্রহরীকে ডেকে আমি বললাম, 'ওহে শোনো, তাক করে ও লোকটাকে মাটিতে ফেল দিকিনি। তাহলে রুপোর একটা রুব্‌ল পাবে।'

''ফেলছি প্রভু। মুশকিল শুধু ও স্থির হয়ে থাকছে না...।'

'হেসে আমি বললাম, 'ওকে স্থির হতে আদেশ দাও।'

'প্রহরী হাত নাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হেই ছোকরা, দাঁড়া এক মিনিট, লাট্টুর মতো ঘোরা থামা!'

'বাস্তবিক কাজ্‌বিচ শোনবার জন্য থামল, সম্ভবত ভেবেছিল তার সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই — কিন্তু কথা বলতে আমরা চাই নি। সৈনিক টিপ

---

* সাজেন — রাশিয়ায় পূর্বব্যবহৃত দৈর্ঘ্যের মাপ। এক সাজেন প্রায় দেড় গজের সমান। — সম্পাঃ

করল...। গ্রুড়ুম!.. আর ফস্কাল, কারণ যেই না বারুদ জবলে উঠল, কাজ্‌বিচ ঘোড়াটাকে খোঁচা মারল যাতে সে এক পাশে লাফিয়ে সরে যায়। রেকাবের ওপর সে দাঁড়িয়ে উঠল, নিজের ভাষায় কী যেন চিৎকার করে উঠল, বাতাসে নাড়াল তার চাবুক — আর পলকের মধ্যে হল অদৃশ্য।

'প্রহরীকে আমি বললাম, 'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!'

'উত্তরে সে বলল, 'প্রভু, ও মরতেই গেছে। এরা এমন অভিশপ্ত জাত যে এক গুলিতে এদের আপনি মারতে পারবেন না।'

'মিনিট পনেরো পরে পেচোরিন শিকার থেকে ফিরল। বেলা তার কাছে গিয়ে দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল আর দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য একটিও তিরস্কার, একটিও অনুযোগ আমি শুনলাম না...। এমন কি তার ওপর আমিও রেগে উঠলাম।

''মশাই,' আমি বললাম, 'নদীর ওপাশে একটু আগে কাজ্‌বিচ এসেছিল, তার ওপর আমরা গুলি চালিয়েছিলাম; সহজেই তার সঙ্গে দেখা আপনার হয়ে যেতে পারত। এই পাহাড়ীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ জাত, আর আপনি কি জানেন না সে সন্দেহ করে নি আজামাৎকে আপনি কিছু সাহায্য করেছিলেন? হলফ করে বলতে পারি বেলাকে এখন সে দেখে চিনতে পেরেছে। আমি জানি এক বছর আগে তার ওপর সে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল — আমাকে নিজেই সে-কথা সে বলেছিল। মোটা কালীম যোগাড় করতে পারলে নিশ্চয়ই তাকে সে বিয়ে করত...।'

'পেচোরিন গম্ভীর হয়ে গেল। সে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের আরও সাবধান হতে হবে...। বেলা, এখন থেকে দুর্গ-প্রাকারে তোমাকে আর যেতে হবে না।'

'সেই সন্ধেয় অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হল; দুর্ভাগা মেয়েটির প্রতি তার মনোভাব বদলে গেছে দেখে আমার দুঃখ হল, কারণ অর্ধেক সময়েরও বেশী শিকার করতে যাওয়া ছাড়াও তার সঙ্গে সে উদাসীন ব্যবহার করে চলল, ক্বচিৎ তার প্রতি সে ভালোবাসা দেখায়। চোখের সামনে বেলা শুকিয়ে যেতে লাগল, তার গালগুলো গেল ভেঙে, তার বড়-বড় চোখদুটো এলো নিষ্প্রভ হয়ে। যখনি তাকে প্রশ্ন করতাম, 'দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ কেন, বেলা? তোমার কি মন খারাপ?' সে উত্তর দিত, 'না।' 'তোমার কিছু চাই?' 'না!' 'তোমার আত্মীয়স্বজনের জন্যে কি মন-কেমন করছে?' 'আমার আত্মীয় কেউ নেই।' দিনের পর দিন তার মুখ থেকে 'হ্যাঁ' বা 'না' ছাড়া আর কিছু শোনা যেত না।

'পেচোরিনের সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি কথা বলতে শুরু করলাম। সে উত্তর দিল, 'শুনুন, মাক্সিম মাক্সিমীচ। আমার চরিত্র দুর্ভাগ্যমণ্ডিত; তার জন্যে আমার শিক্ষা-দীক্ষা দায়ী না ঈশ্বর, যিনি আমাকে এ ধরনের সৃষ্টি করেছেন, সে-কথা আমি জানি না। আমি শুধু এ-কথা জানি যে কারুর মনে আমি যদি দুঃখ দিই আমি তার চেয়ে কম দুঃখ পাই না। জানি এ ব্যাপারে তারা সান্ত্বনা পাবে না — কিন্তু তবুও, ব্যাপারটা এই। যৌবনের প্রথমে, সেই সময় থেকে, বাবা-মার আওতা থেকে বেরিয়ে, টাকা দিয়ে যত সব আনন্দ কেনা যায় তার মধ্যে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আর স্বভাবতই এই সব আনন্দে আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। তারপর আমি অভিজাত সমাজে মিশলাম, কিন্তু দেখতে-দেখতে তাতেও ক্লান্তি ধরে গেল। সমাজের সুন্দরী মেয়েদের প্রেমে আমি পড়তাম, তারাও ভালোবাসত আমাকে। কিন্তু তাদের ভালোবাসা কেবল আমার উচ্চাশা আর অহংকারকে বাড়িয়ে দিত, আমার হৃদয় থাকত শূন্য হয়ে...। আমি লেখাপড়া শুরু করলাম, কিন্তু তাতেও ক্লান্তি এসে গেল; আমি দেখলাম যশ কিংবা আনন্দ তার ওপর একটুও নির্ভর করে না, কারণ সবচেয়ে সুখী লোক হচ্ছে অশিক্ষিতরা আর যশ হচ্ছে কপালজোর, সেটা পেতে হলে শুধু ধূর্ত হতে হয়। তখন আমার একঘেয়ে লাগতে লাগল...। অল্পদিনের মধ্যেই ককেশাসে আমি বদলি হয়ে গেলাম; এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়। আমি আশা করলাম চেচেনীয়দের গুলির মধ্যে একঘেয়েমি থাকবে না — কিন্তু তাও নিষ্ফল হল। এক মাসের মধ্যে তাদের ঘ্যানঘ্যানানি আর মৃত্যুর সান্নিধ্যে আমি এত অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে, সত্যি বলতে কি, মশারা আমাকে তাদের চেয়ে বেশী বিরক্ত করত — ফলে জীবন হয়ে উঠল আরও একঘেয়ে, কারণ এখন আমার প্রায় শেষ আশা হারালাম। যখন বেলাকে আমি আমার বাড়িতে দেখলাম, যখন প্রথম তাকে আমার কোলে চেপে ধরে প্রথম তার কালো কোঁকড়া চুলগুলো চুম্বন করলাম, বোকার মতো আমার মনে হয়েছিল যে সে বুঝি স্বর্গের দূত, আমার সমব্যথী ভাগ্য তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে...। আবার আমি ভুল করলাম: অসভ্য মেয়ের প্রেম ভালো বংশের মেয়ের চেয়ে কিছুটা ভালো; কিন্তু একের মূর্খতা আর সরলতা অন্যের ছলাকলার মতোই সমান একঘেয়ে। যদি জানতে চান, শুনুন, এখনও ওকে ভালোবাসি, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ কয়েকটি খুব আনন্দিত মুহূর্তের জন্যে। তার জন্যে আমি জীবনও দিয়ে দিতে

পারি — তবু তাকে নিয়েও আমার একঘেয়ে ধরে গেছে...। আমি জানি না আমি নির্বোধ না বদমাইশ; কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে তার মতোই আমিও অনুকম্পার যোগ্য, হয়ত বেশীই; অভিজাত সমাজ আমার আত্মাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে, মন আমার অস্থির, আমার হৃদয়ে তৃপ্তি নেই; কিছুই আমার কাছে যথেষ্ট নয়: আনন্দের মতো দুঃখেও আমি চটপট অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। দিনের পর দিন আমার জীবন নিঃস্বতর হয়ে চলেছে। আমার কেবল একটিমাত্র উপায় অবশিষ্ট আছে — সেটা হচ্ছে ঘুরে বেড়ান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বেরিয়ে পড়ব — ঈশ্বর করুন ইউরোপে নয় — আমেরিকা, আরব, ভারতবর্ষে — আর হয়ত পথের মধ্যে কোথাও আমি মরব! অন্তত আমি নিশ্চিত যে ঝড় আর খারাপ পথের সাহায্যে এই শেষ অবলম্বন শীগ্‌গিরই আমাকে সান্ত্বনা দেবে।' এই ভাবে অনেকক্ষণ ধরে সে বকে চলল আর তার কথাগুলো আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল, কারণ সে-ই কথা আমি প্রথম শুনলাম এক পঁচিশ বছরের পুরুষের কাছে, আর ঈশ্বরের কাছে আশা করি সে-ই যেন শেষ বার হয়...। আশ্চর্য! সম্ভবত হালে আপনি রাজধানীতে গিয়েছিলেন; হয়ত আপনি আমাকে বলতে পারবেন,' ক্যাপ্টেন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে চললেন, 'সেখানকার যুবকরা সবাই এ-রকম কিনা।'

উত্তরে বললাম সেখানে অনেকেই এ-রকম বলে থাকে, আর খুব সম্ভব তারা অনেকেই সত্যি কথা বলে; বললাম, মোটের উপর, সমাজের উপরের স্তরের অন্যান্য ফ্যাশনের মতো মোহমুক্তি শুরু হবার ফলে সেটা নেমে এসেছে নীচের স্তরে। সেটা জীর্ণ করে ফেলছে তাকে। এখন, যারা বাস্তবিকই সবচেয়ে বেশী একঘেয়েমিতে ক্লান্ত সেটাকে তারা প্রকাশ না করতে এমন প্রাণপণ চেষ্টা করে, যে মনে হয় সেটা পাপ-বিশেষ। ক্যাপ্টেন এই সূক্ষ্মতা বুঝতে পারলেন না। তিনি মাথা নেড়ে ধূর্ত হাসি হাসলেন:

'মনে হয় ফরাসীরাই প্রথম একঘেয়েমির ফ্যাশন চালু করেছিল?'

'না, ইংরেজরা।'

'ও, তাই বুঝি!..' তিনি উত্তর দিলেন। 'তারা অবশ্য সব সময়েই পাঁড় মাতালের জাত!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে পড়ে গেল মস্কোর এক ভদ্রমহিলার কথা, যিনি বলেছিলেন বাইরন মাতাল ছাড়া আর কিছুই না।*) ক্যাপ্টেনের উক্তি অবশ্য বেশী ক্ষমার যোগ্য, কারণ নিজে মদ্যপান না করার জন্য স্বভাবতই

নিজেকে তিনি বিশ্বাস করাতে চাইতেন যে পৃথিবীর যাবতীয় অনর্থের কারণ হল অতিমাত্রায় পান করা।

আবার তিনি গল্পটা বলে চললেন এই ভাবে:

'কাজ্‌বিচ আর আসে নি, তবু কী এক অজানা কারণে; মন থেকে আমি এই ধারণাটা ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না যে তার আসাটা অনর্থক নয় এবং সে একটা বদ মতলব আঁটছে।

'একবার পেচোরিন আমাকে রাজী করাল তার সঙ্গে বুনো শুয়োর শিকার করতে যেতে। আমি যেতে চাই নি, কারণ আমার কাছে আর বুনো শুয়োরের মানে কী! শেষ পর্যন্ত কিন্তু তার সঙ্গে আমাকে যেতে সে বাধ্য করাল। খুব সকাল-সকাল আমরা বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে নিলাম পাঁচজন সৈনিক। দশটা পর্যন্ত আমরা নল-খাগড়ার ঝোপ আর বন খুঁচিয়ে চললাম, কিন্তু একটা জানোয়ারেরও দেখা মিলল না। 'ফিরলে কেমন হয়?' আমি বললাম। 'একগুঁয়ে হয়ে লাভ কী? আপনি ত নিজেই দেখতে পাচ্ছেন দিনটা অপয়া।' কিন্তু গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ গরম এবং ক্লান্তি সত্ত্বেও খালি হাতে ফিরতে চাইল না। ওর স্বভাবটাই এই রকম। কোনো কিছুর ওপর খেয়াল চাপলে তাকে সেটা পেতেই হবে; তার মা নিশ্চয়ই ছেলেবেলায় তার মাথা খেয়েছিলেন...। অবশেষে প্রায় দুপুর নাগাদ আমরা একটা অভিশপ্ত শুয়োর দেখতে পেলাম! গুড়ুম!.. গুড়ুম!.. কিন্তু না: জন্তুটা নল-খাগড়ার ঝোপে সেঁধিয়ে গেল...। হ্যাঁ, বাস্তবিকই দিনটা আমাদের অপয়া ছিল!.. খানিক বিশ্রাম করে আমরা বাড়িমুখো রওনা হলাম।

'পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে আমরা চললাম, চুপচাপ, লাগামগুলো ঢিলে। প্রায় দুর্গ পর্যন্ত পেঁৗছেছি, যদিও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, এমন সময় বন্দুকের একটা শব্দ হল...। পরস্পরের দিকে আমরা তাকালাম: একই সন্দেহ আমাদের মনে বিদ্যুতের মতো ঝলকে উঠল...। শব্দের দিকে তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে আমরা দেখলাম এক দল সৈন্য দুর্গের প্রাকারের ওপর এক জায়গায় জড় হয়ে মাঠের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে — সেখান দিয়ে ছুটে চলছে এক ঘোড়সওয়ার পড়িমরি করে, তার জিনে সাদা মতো কী একটা জিনিস। গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ চেচেনীয়দের মতোই চিৎকার করে, খাপ থেকে বন্দুকটা বার করে তাড়া করে ছুটল, আমিও ছুটলাম তার পেছন-পেছন।

'সৌভাগ্যক্রমে, শিকারে আমাদের কপাল ভালো না থাকায়, আমাদের

ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয় নি; তারা প্রাণপণে দৌড়তে লাগল আর প্রতি মুহূর্তে আমরা আমাদের শিকারের নিকটতর হতে লাগলাম...। শেষ পর্যন্ত কাজ্‌বিচকে আমি চিনতে পারলাম, যদিও বুঝতে পারলাম না সামনের দিকে কী সে ধরে আছে। পেচোরিনের পাশাপাশি এসে আমি চিৎকার করলাম, 'লোকটা কাজ্‌বিচ!..' সে আমার দিকে তাকিয়ে, মাথা নাড়িয়ে ঘোড়াটাকে চাবুক মারল।

'অবশেষে কাজ্‌বিচকে আমরা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পেলাম। তার ঘোড়াটা আর সামনে এগোতে পারছিল না। ঘোড়াটা পীড়নে পীড়নে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, নাকি সেটা আমাদের চেয়ে নিরেস ছিল — জানি না। প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে কিন্তু জন্তুটাকে জোরে ছোটাতে পারছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই মুহূর্তে তার কারাগিওজের কথা মনে পড়ছিল...

'সামনে চেয়ে দেখি পেচোরিন ঘোড়ায় চেপে ছুটতে-ছুটতে টিপ করছে। 'গুলি করবেন না!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'ঘোটাটা বাঁচান, শীগ্‌গিরই ওকে আমরা ধরে ফেলব।' কিন্তু যৌবন এই রকমই জিনিস! সব সময় কারণে অকারণে মাথা গরম করে ফেলে...। গুলির শব্দ শোনা গেল আর বুলেটটা ঘোড়ার পেছনের পা জখম করল; জন্তুটা উত্তেজিত হয়ে আরও গোটা দশ লাফ দিয়ে হাঁটু দুমড়ে পড়ল। জিন থেকে লাফিয়ে নামল কাজ্‌বিচ, আর তখন আমরা তার হাতে দেখতে পেলাম চাদর-দিয়ে-জড়ানো একটি মেয়ে। মেয়েটি বেলা... বেচারা বেলা! নিজের ভাষায় কাজ্‌বিচ আমাদের উদ্দেশে কী যেন চেঁচিয়ে উঠল আর তার ছোরাটা বেলার ওপর তুলে ধরল...। নষ্ট করার মতো সময় আর নেই, আমিও এলোপাতাড়ি গুলি চালালাম। আমার গুলি হয়ত তার কাঁধে বিঁধেছিল কারণ হঠাৎ তার হাতটা ঝুলে পড়ল...। ধোঁয়া যখন পরিষ্কার হয়ে গেল দেখলাম আহত ঘোড়াটা মাটিতে পড়ে রয়েছে আর বেলা ঠিক তার পাশেই; এদিকে কাজ্‌বিচ তার বন্দুকটা ফেলে বেড়ালের মতো নীচেকার ঝোপের ভিতর দিয়ে খাড়া পাহাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে। আমি তাকে পেড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বন্দুকটায় আর গুলি এখন নেই! জিন থেকে লাফিয়ে নেমে বেলার দিকে আমরা দৌড়লাম। স্থির হয়ে বেচারা পড়ে রয়েছে, তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তস্রোত ঝরছে...। কী শয়তান! তার বুকে ছুরি বসালে মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু শেষ হয়ে যেত, কিন্তু এ রকম

জঘন্যতমভাবে তার পিঠে ছুরি মারা! সে জ্ঞান হারিয়েছিল। ফালি-ফালি করে চাদরটা ছিঁড়ে আমরা যত জোরে পারলাম পট্টি দিলাম। মিথ্যেই পেচোরিন তার ঠাণ্ডা ঠোঁট চুম্বন করতে লাগল, কিছুতেই তার জ্ঞান ফেরান গেল না।

'পেচোরিন তার ঘোড়ায় চড়ল। মাটি থেকে তাকে তুলে দিলাম, কোনো রকমে তার সামনে জিনের ওপর রাখলাম বেলাকে। হাত দিয়ে তাকে সে জড়িয়ে ধরল। আমরা ফিরে চললাম। কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ বলল, 'শুনুন মাক্সিম মাক্সিমীচ, এভাবে চললে কিছুতেই আমরা একে জীবিত অবস্থায় বাড়ি নিয়ে পেঁছিতে পারব না।' 'ঠিক বলেছেন,' আমি বললাম, আর প্রাণপণে ঘোড়া ছোটালাম। দুর্গের ফটকে আমাদের জন্যে লোকে ভিড় করে অপেক্ষা করছিল। সাবধানে আমরা আহত মেয়েটিকে পেচোরিনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সার্জেনকে খবর পাঠালাম। যদিও সে মাতাল অবস্থায় ছিল তবু আমাদের ডাকে এসে হাজির হল আর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বলল যে মেয়েটি এক দিনের বেশী বাঁচবে না, তার কিন্তু ভুল হয়েছিল...'

'সে তা হলে বেঁচে উঠেছিল?' ক্যাপ্টেনের হাত ধরে আমি প্রশ্ন করলাম, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই আমি খুশি হলাম।

'না,' তিনি উত্তরে বললেন, 'সার্জেনের শুধু এইটুকু ভুল হয়েছিল — মেয়েটি আরও দু'দিন বেশী বেঁচেছিল।'

'আচ্ছা আমাকে বলুন ত, কাজ্বিচ কী করে তাকে চুরি করতে পেরেছিল?'

'ঘটনাটা ঘটে এই ভাবে: পেচোরিনের আদেশ অমান্য করে সে দুর্গ ছেড়ে নদীতে গিয়েছিল। ভারি গরম ছিল। জলে পা ডুবিয়ে একটা পাথরে সে বসেছিল। কাজ্বিচ পা টিপে-টিপে এসে, তাকে ধরে মুখ বেঁধে ফেলে, ঝোপের মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে, লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয়! কোনো রকমে বেলা চিৎকার করতে পেরেছিল, আর প্রহরীরা হৈচৈ করে উঠে তার ওপর গুলি চালিয়েছিল — কিন্তু তারা ফস্কায় আর সেই সময় আমরা পেঁছিই।'

'কাজ্বিচ তাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল কেন?'

'আরে মশাই! সবাই জানে, এই চের্কেসীয়গুলো চোরের জাত। কোনো কিছু অরক্ষিতভাবে পড়ে থাকলেই তাদের আঙুলগুলো নিশপিশ করে;

তাদের সেটা দরকার থাকুক বা না-থাকুক, তারা চুরি করে — চুরি না করে তারা পারে না! তা ছাড়া অনেক দিন থেকেই বেলার ওপর তার নজর ছিল।'

'আর সে মারা গেল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভারি কষ্ট পেয়েছিল, আর আমরাও তার পাশে বসে থাকতে-থাকতে জেরবার হয়ে গিয়েছিলাম। রাত প্রায় দশটার সময় তার জ্ঞান ফিরে এলো; তার বিছানার পাশে আমরা বসেছিলাম। চোখ খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই সে পেচোরিনকে ডাকতে লাগল। 'আমি এখানে, তোমার পাশে, আমার জানেচকা,' (অর্থাৎ রুশ ভাষায় প্রিয়া) তার হাতটা তুলে নিয়ে সে উত্তর দিল। বেলা বলল, 'আমি মরে যাব'। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, বললাম সার্জেন বলেছে নিশ্চয়ই তাকে সারিয়ে দেবে! সে কিন্তু মাথা নাড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল: সে মরতে চায় নি!..

'রাত্রে সে ভুল বকতে শুরু করল। তার মাথাটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল আর থেকে-থেকে জ্বরে সে কাঁপছিল। তখন সে তার বাবা আর ভাইয়ের কথা এলোমেলো বকছিল; সে চাইছিল পাহাড়ে, বাড়িতে ফিরে যেতে...। তারপর পেচোরিন সম্বন্ধেও সে কথা বলল, নানা প্রিয় নামে তাকে সে ডাকল কিংবা বকল এখন আর তাকে ভালোবাসে না বলে...

'হাতের ওপর মাথা নামিয়ে পেচোরিন নিঃশব্দে শুনে চলল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তার চোখের পাতায় এক ফোঁটা জলও আমি দেখতে পেলাম না; আমি জানি না সে বাস্তবিক কাঁদতে পারত না, নাকি নিজেকে চেপে ছিল। আমার কথা বলতে পারি, এরকম মর্মান্তিক কোনো কিছু কখনও দেখি নি।

'সকালের দিকে ভুল-বকা বন্ধ হল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সে স্থির হয়ে পড়ে রইল, সে এত ফ্যাকাশে আর দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তার নিশ্বাস প্রায় বোঝাই যাচ্ছিল না। খানিক পরে সে একটু ভালো বোধ করে আবার কথা বলতে শুরু করল, কিন্তু ভাবতে পারেন সে কী বলছিল?.. সে-সব চিন্তা যারা মরতে বসেছে শুধু তাদের মাথাতেই আসতে পারে!.. সে খ্রীষ্টান নয় বলে দুঃখ করছিল আর বলছিল অন্য জগতে তার আত্মা কখনই গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না, বলছিল স্বর্গে অন্য কোনো মেয়ে পেচোরিনের আত্মার সঙ্গিনী হবে। আমার মনে হল মৃত্যুর আগে তাকে হয়ত খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা উচিত, কিন্তু সে-কথা যখন বললাম অনেকক্ষণ ধরে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আমার দিকে সে

তাকিয়ে রইল, একটি কথাও বলতে পারল না। শেষকালে বলল যে-ধর্মে সে জন্মেছে সেই ধর্মেই সে মরবে। এইভাবে সমস্ত দিন কাটল। সেই দিনের মধ্যে কীভাবেই না সে বদলে গিয়েছিল! তার ফ্যাকাশে গালদুটো চুপসে গিয়েছে, ক্রমশ তার চোখদুটো যেন বড় হয়ে উঠছে, আর তার ঠোঁটদুটো পুড়ে যাচ্ছে। তার জ্বর যেন টকটকে গরম লোহার দণ্ডের মতো তার বুকে চাপ দিচ্ছিল।

'দ্বিতীয় রাত এলো। চোখের পলক না ফেলে আমরা তার বিছানার পাশে বসে রইলাম। ভারি কষ্ট পেয়েছিল সে, সে কাতরাচ্ছিল। কিন্তু একটু সুস্থ বোধ করলেই গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচকে সে আশ্বাস দিচ্ছিল ভালো বোধ করছে বলে, তাকে বলছিল ঘুমুতে, তার হাত চুম্বন করছিল আর নিজের হাতের মধ্যে ধরে থাকছিল। ভোর হবার ঠিক আগেই মৃত্যু-যন্ত্রণা সে অনুভব করতে শুরু করল। বিছানায় সে ছটফট করতে শুরু করল। ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়ে ফেলল, ফলে আবার রক্ত ছুটল। ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার পর এক মুহূর্তের জন্য সে চুপ করল আর পেচোরিনকে বলল তাকে চুম্বন করতে। বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে, বালিশ থেকে মাথাটা তুলে সে তার ঠোঁট বেলার ঠাণ্ডা-হয়ে-আসা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল। বেলা তার কম্পমান হাত দিয়ে জোরে জড়িয়ে ধরল পেচোরিনের গলা, যেন এই চুম্বন দিয়ে নিজের আত্মা তাকে সে দিয়ে দিতে চায়...। হ্যাঁ, ভালোই হয়েছিল সে মারা গিয়ে! গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ ছেড়ে চলে গেলে তার কী হত? আর একদিন না একদিন সে ঘটনা ঘটতই...

'পরের দিনের প্রথম অর্ধেকটা সে শান্ত ছিল। আমাদের সার্জেন পুলটিস আর ওষুধ দিয়ে তাকে যন্ত্রণা দেওয়া সত্ত্বেও সে শান্ত আর বাধ্য ছিল। আমি আপত্তি করে বলেছিলাম, 'শুনুন মশাই! আপনি নিজেই ত বলেছেন সে বাঁচবে না, তা হলে আপনার এ-সব ওষুধপত্রের দরকার কী?' 'তা সত্ত্বেও চেষ্টা করে যেতেই হবে, মাক্সিম মাক্সিমীচ,' তিনি উত্তর দিলেন, 'যাতে আমার বিবেক শান্তি পায়।' বিবেক — চমৎকার!

'বিকেলের দিকে তেষ্টায় সে কষ্ট পেতে লাগল। জানালা আমরা খুলে দিলাম, কিন্তু বাইরেটা ঘরের চেয়েও গরম। তার বিছানার পাশেই আমরা বরফ রাখলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আমি জানতাম, এই অসহ্য তেষ্টাই আসন্ন মৃত্যুর সঙ্কেত। পেচোরিনকে সে-কথা বললাম। 'জল, জল,' বিছানা থেকে মাথা তুলে ভাঙা-ভাঙা গলায় বারবার সে বলতে লাগল।

'কাগজের মতো সাদা হয়ে সে একটা গেলাসে জল ভরে তাকে দিল। হাত দিয়ে নিজের চোখদুটো ঢেকে আমি এক প্রার্থনা-মন্ত্র আওড়াতে লাগলাম, কোন্‌টা মনে নেই...। হ্যাঁ মশাই, জীবনে অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা আমার আছে, হাসপাতালে আর যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ মরতে আমি দেখেছি — কিন্তু এ-রকম কোনো কিছু কখনও দেখি নি!.. আমাকে স্বীকার করতে হবে আরও এক কারণে আমি বিষণ্ণ বোধ করছিলাম; মৃত্যুর আগে একবারও আমার কথা তার মনে পড়ে নি, আর আমার মনে হয় পিতার মতো তাকে আমি ভালোবাসতাম...। যাক, ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন!.. আর সত্যি বলতে গেলে কি, আমিই বা কে, যাকে কেউ তার মৃত্যু-শয্যায় মনে করবে?..

'জলটা খেয়েই সে ভালো বোধ করল, আর প্রায় তিন মিনিট পরে মারা গেল। তার ঠোঁটের ওপর আমরা একটা আয়না চেপে ধরলাম, কিন্তু তার ওপর কিছুই দেখা গেল না!.. পেচোরিনকে আমি ঘরের বাইরে নিয়ে গেলাম। দুর্গের প্রাকারের ওপর অনেকক্ষণ ধরে পাশাপাশি কথা না বলে, পেছনে হাত রেখে এদিকে-ওদিকে পায়চারি করলাম। তার মুখের ওপর কোনো রকম ভাবান্তর নেই দেখে আমার দারুণ বিরক্ত লাগল, কারণ তার অবস্থায় পড়লে আমি ত শোকে মারা যেতাম। অবশেষে সে মাটির ওপর ছায়ায় বসে বালির ওপর কাঠি দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, জানেন, আমি কথা বলতে লাগলাম, আর কিছুর জন্য না হোক, ভদ্রতা দেখাবার জন্য। তাতে সে মুখ তুলে হাসতে লাগল...। সেই হাসিতে আমার শিরদাঁড়া সিরসির করে উঠল...। কফিন তৈরির ফরমাশ দেবার জন্য আমি উঠে পড়লাম।

'স্বীকার করছি যে অন্য দিকে মন দেবার জন্য এই কাজ নিয়ে আমি পড়লাম। আমার কাছে যে এক টুকরো সিল্কের কাপড় ছিল সেটা দিয়ে কফিনটা আমি ঢেকে দিলাম আর গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ তার জন্য যে-সব চের্‌কেসীয় রুপোলী জরি কিনেছিল তাই দিয়ে সেটা সাজালাম।

'পরের দিন ভোরবেলায় তাকে আমরা কবর দিলাম দুর্গ ছাড়িয়ে, নদী-তীরের যেখানে সে শেষ বসেছিল সেই জায়গাটার পাশে; ছোট কবরটা ঘিরে এখন রয়েছে সাদা এ্যাকাশিয়া আর এলডার গাছের ঝোপ। আমি একটা ক্রস্‌ বসাব ভেবেছিলাম, কিন্তু, জানেন ত, সেটা একটু বিসদৃশ দেখায়, কারণ, হাজার হলেও, সে ত খ্রীষ্টান ছিল না...'

'আর পেচোরিনের কী হল?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'পেচোরিন অনেক দিন ধরে ভুগছিল, আর রোগাও হয়ে গিয়েছিল, বেচারা। কিন্তু তারপর থেকে আমরা কখনও বেলার কথা আলোচনা করি নি। আমি জানতাম তাতে সে কষ্ট পাবে, তাই তার উল্লেখ করতে আমি যাব কেন? প্রায় তিন মাস পরে তার ওপর আদেশ এলো অমুক সৈন্যদলে যোগ দেবার। সে জর্জিয়া চলে গেল। তারপর থেকে আমাদের আর দেখা হয় নি। ওঃহো, হ্যাঁ, মনে পড়ছে হালে কে যেন বলছিল যে সে রাশিয়ায় ফিরে গেছে, যদিও সামরিক আদেশ-পত্রে সে-কথার উল্লেখ নেই। সাধারণত এখানে খবর পেঁছতে অনেক সময় লাগে।'

এখানে, সম্ভবত নানা বিষণ্ণ স্মৃতিকে তাড়াবার জন্য, এক-বছর-পুরনো খবর পাবার অসুবিধে সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ এক বক্তৃতা ফাঁদলেন।

তাকে আমি বাধাও দিলাম না, তাঁর কথা শুনলামও না।

এক ঘণ্টা পরেই আবার যাত্রা করা সম্ভবপর হল। তুষার-ঝঞ্ঝা থেমেছে, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পথে অবশ্য বেলা আর পেচোরিন সম্বন্ধে কথার মোড় না ঘুরিয়ে আমি পারলাম না।

'কাজ্‌বিচের কী হল কখনও কি জানতে পেরেছিলেন?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'কাজ্‌বিচ? বাস্তবিক আমি জানি না...। শুনেছি শাপ্‌সুগদের এক কাজ্‌বিচ আছে তাদের ডান দিকের দলে — সাহসী ছোকরা, সর্বদা লাল বেশ্‌মেৎ পরে, আমাদের গোলা বর্ষণের মধ্যে ঘোড়া ধীরে ধীরে ছুটিয়ে যায় আর যখনই তার পাশ দিয়ে গুলি শিস দিয়ে ছোটে সে অতিরিক্ত নম্রতার সঙ্গে নীচু হয়ে অভিবাদন করে। কিন্তু একই লোক কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে!..'

কোবি-তে মাক্সিম মাক্সিমীচ আর আমি বিদায় নিলাম, কারণ আমি ডাক-গাড়ি নিলাম, আর তাঁর ভারি-ভারি মালপত্রের জন্যে আমার সঙ্গে তিনি সমান তাল রাখতে পারলেন না। সে সময় কখনও আমরা ভাবি নি যে আবার আমাদের দেখা হবে। তবু কিন্তু দেখা হয়েছিল, আর আপনারা চাইলে সে-গল্প আমি বলব — কিন্তু সে-গল্পটা স্বয়ংসম্পূর্ণ...। আপনাদের কিন্তু মানতেই হবে যে মাক্সিম মাক্সিমীচ শ্রদ্ধা পাবার মতো মানুষ?.. যদি এ-কথা আপনারা মানেন তা হলে গল্পটির জন্যে — যদিও এটা মস্ত বড় — আমি যথেষ্ট পুরস্কার পেয়েছি বলে মনে করব।

২

মাক্সিম মাক্সিমীচ

মাক্সিম মাক্সিমীচের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি চললাম তেরেক আর দারিয়াল গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে। কাজ্‌বেক-এ প্রাতরাশ খেলাম, লার্‌স্‌-এ চা পান করলাম এবং নৈশভোজের সময় পেঁছিলাম ভ্লাদিকাভ্‌কাজ-এ।*) আমি আপনাদের বিরক্ত করব না পাহাড়পর্বতের বর্ণনা দিয়ে — সেই সব বড় বড় কথা বলে যেগুলোর কোন মানে হয় না, আর এমন সমস্ত চিত্র দিয়ে যা কিছুই বোঝায় না — বিশেষ করে তাদের কাছে, যাঁরা কখনও এ অঞ্চলে আসেন নি, কিংবা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে যা নিশ্চয়ই কষ্ট করে কেউ পড়তে যাবেন না।

আমি এখন উঠলাম একটি পান্থনিবাসে যেখানে সব যাত্রীরাই এসে থামেন এবং যেখানে, প্রসঙ্গত, কেউই নেই যে আপনাকে ফেজেণ্ট-এর রোস্ট কিংবা সুপ রেঁধে দিতে পারে। কারণ যে তিনজন পঙ্গু লোকের উপর তার ভার তারা হয় এত বোকা কিংবা এত মাতাল যে তাদের কিছুই বোঝানো সম্ভব নয়।

শুনলাম সেখানে আমাকে আরও তিন দিন থাকতে হবে, কারণ ইয়েকাতেরিনোগ্রাদ থেকে*) 'ওকাজিয়া'* তখনও এসে পেঁছয় নি, আর সে-কারণে সেটা ফিরতি পথে যাত্রা করতে পারবে না। কী ওকাজিয়া!.. কিন্তু এক বাজে শ্লেষালঙ্কার থেকে কোনো রুশী লোক সান্ত্বনা পেতে পারে না। সময় কাটাবার জন্য আমি ঠিক করলাম মাক্সিম মাক্সিমীচের কাছ থেকে শোনা বেলার গল্পটা লিখে ফেলতে। তখন জানতাম না সেটা দীর্ঘ নানা গল্পগুচ্ছের এক প্রথম খণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। অতএব দেখতে পাচ্ছেন তুচ্ছ একটি ঘটনার কী

---

* ওকাজিয়া'র মানে 'উপলক্ষ', 'অপ্রত্যাশিত'ও হয়; রীতিসিদ্ধ উক্তি 'চ্তো জা ওকাজিয়া!' (কী ওকাজিয়া!) মানে 'কী দুর্ঘট!' — সম্পাঃ

গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হতে পারে!.. কিন্তু হয়ত আপনারা জানেন না 'ওকাজিয়া' জিনিসটা কী? সেটি হচ্ছে পদাতিক বাহিনীর অর্ধেকটা আর একটি কামান, যাদের আশ্রয়ে সরকারী সম্পত্তি ভ্লাদিকাভ্‌কাজ থেকে ইয়েকাতেরিনোগ্রাদের পথে কাবার্দা অতিক্রম করে।*)

প্রথম দিনটা কাটল ভারি একঘেয়েমির মধ্যে; কিন্তু পরের দিন ভোরে একটা গাড়ি উঠোনে এসে পেঁছিল...। তাতে মাক্সিম মাক্সিমীচ!.. পুরনো বন্ধুর মতো পরস্পরকে আমরা অভিবাদন করলাম। আমার ঘরে তাঁকে আমি থাকতে দিলাম। লৌকিকতার ধার তিনি ধারলেন না, এমন কি তিনি আমার কাঁধ চাপড়ালেন, আর তাঁর মুখটা এমনভাবে বিকৃত হল যার অর্থ হচ্ছে মৃদু হাসি। অদ্ভুত লোক!..

রন্ধনবিদ্যায় মাক্সিম মাক্সিমীচ অতিশয় পারদর্শী! ফেজেণ্টের আশ্চর্য রোস্ট তিনি বানালেন, তার সঙ্গে অতি চমৎকার জরানো শসার চাটনি। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তিনি না থাকলে ঠাণ্ডা কিছু খেয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। আমাদের খাদ্য পদের স্বল্পতা এক বোতল কাখেতীয় মদ ভুলতে সাহায্য করল, কারণ দ্বিতীয় কোনো পদ ছিল না। তারপর আমরা পাইপ ধরিয়ে ধূমপানের জন্য জুত করে বসলাম। আমি বসলাম জানালার পাশে, তিনি চুল্লিটার যেখানে আগুন জ্বলছিল সেখানে, কারণ দিনটা ছিল ঠাণ্ডা আর ভিজে। চুপচাপ আমরা বসে রইলাম; বলবার মতো কিছুই নেই...। ইতিমধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক সবকিছু আমাকে তিনি বলেছেন, আর তাঁকে বলার মতো আমারও কিছু নেই। জানালার বাইরে আমি তাকালাম। অনেকগুলো নীচু-ছাতের বাড়ি তেরেকের তীরে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে তেরেক প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে এই বাড়িগুলোকে দেখা যায়। দূরে পাহাড়ের নীল দেয়াল, করাতের দাঁতের মতো কাটা-কাটা, তার সঙ্গে রয়েছে কাজ্‌বেক, কার্ডিন্যালের মতো সাদা টুপি পরে*) মাথা উঁচিয়ে। মনে-মনে তাদের আমি বিদায় জানালাম; তাদের ছেড়ে যেতে আমার দুঃখ হচ্ছিল...

এই ভাবে অনেকক্ষণ আমরা বসে রইলাম। বরফ-জমা চুড়োগুলোর পিছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আর উপত্যকার উপর ছড়িয়ে পড়ছে দুধের মতো সাদা কুয়াশা। ঠিক সেই সময় বাইরে ঘণ্টার টিং টিং আর গাড়োয়ানদের চিৎকার আমরা শুনতে পেলাম। কতকগুলো গাড়ি পান্থনিবাসের উঠোনে প্রবেশ করল, তাদের উপর অপরিচ্ছন্ন আর্মেনীয়রা বসে। তাদের পিছনে

এলো খালি একটা গাড়ি। সেটা এত হালকা, আরামজনক আর সুন্দর যে তার মধ্যে স্পষ্টই বিদেশী ছাপ বোঝা যায়। পিছনে হেঁটে আসছিল একটি লোক, মস্ত বড় তার গোঁফজোড়া, পরনে ডলম্যান। চাকরের পক্ষে তার বেশভূষা বেশ ভালো। কিন্তু যেভাবে পাইপ থেকে সে ছাই ঝাড়ল আর গাড়োয়ানদের বকাবকি করে চলল তাতে তার পদমর্যাদা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এক অলস ভদ্রলোকের সে অতিশয় প্রশ্রয়-পাওয়া ভৃত্য— অনেকটা রুশী ফিগারোর মতো।*)

জানালা থেকে তাকে হেঁকে বললাম, 'ওহে, বল ত ওকাজিয়া এসেছে কি না?'

বেশ উদ্ধতভাবেই সে আমার দিকে তাকাল, গলার টাইটা সোজা করল তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। তার পাশে পাশে হাঁটছিল এক আর্মেনীয়, সে হেসে তার বদলে উত্তর দিল যে এটাই ওকাজিয়া আর সেটা পরের সকালে ফিরতি পথে পাড়ি দেবে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' ঠিক তখনি জানালার কাছে পৌঁছে মাক্সিম মাক্সিমীচ বললেন। 'চমৎকার গাড়িটা!' তিনি আরও যোগ করলেন। 'সম্ভবত কোনো অফিসার তিফ্‌লিসে চলেছেন*) কোনো বিচার-কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে। বোঝা যাচ্ছে আমাদের পাহাড়-টাহার তাঁর জানা নেই। না মশাই, এ ধরনের গাড়ি আপনাদের জন্যে নয়। এমন কি বিলিতি গাড়িও এখানকার ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারবে না।'

'কে হতে পারে — চলুন, বার করা যাক...।'

আমরা দালানে গেলাম, তার অন্য প্রান্তে পাশের ঘরে যাবার দরজাটা খোলা। চাকর আর গাড়োয়ান ঘরের ভিতরে সুটকেসগুলো নিয়ে আসছিল।

'শোনো বন্ধু,' ক্যাপ্টেন চাকরকে প্রশ্ন করলেন, 'এই চমৎকার গাড়িটা কার, হ্যাঁ?.. বাস্তবিক ভারি চমৎকার গাড়িটা!..'

চাকর অস্পষ্ট কী বিড়বিড় করে মুখ না ফিরিয়েই একটা সুটকেসের দড়ি খুলতে লাগল। মাক্সিম মাক্সিমীচের রাগ হল। তিনি রূঢ় লোকটির ঘাড়ে টোকা দিয়ে বললেন, 'ওহে, তোমাকে বলছি...'

'কার গাড়ি?.. আমার কর্তার...'

'আর তোমার কর্তাটি কে?'

'পেচোরিন...'

'কী বললে? পেচোরিন?.. হা ঈশ্বর!.. কখনও কি তিনি ককেশাসে চাকরি করতেন?..' মাক্সিম মাক্সিমীচ আমার আস্তিনে টান দিয়ে চিৎকার করে বললেন। আনন্দে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'তাই ত আমার মনে হয়। কিন্তু আমি তাঁর কাছে অল্পদিন হল কাজ করছি।'

'বেশ বেশ, তা হলেই বোঝো। নাম তাঁর গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ, তাই না?.. তোমার কর্তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল,' চাকরের কাঁধ ইয়ারের মতো চাপড়ে তিনি বললেন। তাতে সে শুধু পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল...

চাকরটা ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ক্ষমা করবেন মশাই, কিন্তু আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন।'

'বাজে বোকো না!.. বুঝতে পারছ না তোমার কর্তার আমি অনেক দিনের বন্ধু? আমরা একসঙ্গে থেকেছিও...। কোথায় এখন তাঁর দেখা পাই?..'

চাকরটা জানাল যে পেচোরিন কর্ণেল ন... এর সঙ্গে নৈশভোজ করবেন এবং সেখানেই রাত্রি কাটাবেন।

'আজ রাত্রে এখানে তিনি ফিরবেন না?' মাক্সিম মাক্সিমীচ প্রশ্ন করলেন। 'হয়ত কোনো কারণে আজকে তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা করবে...। যদি দেখা কর তা হলে বোলো যে মাক্সিম মাক্সিমীচ এখানে আছে। শুধু ওই কথা বললেই তিনি বুঝতে পারবেন...। ভোদ্‌কা কেনবার জন্যে তোমাকে একটা ভস্‌মিগ্রিভেন্নি* দেব...'

এই সামান্য টাকার কথা শুনে চাকরটা বড়মানুষী চাল দেখান সত্ত্বেও কথা দিল মাক্সিম মাক্সিমীচ যা বলেছেন তাই করবে।

সগর্বে মাক্সিম মাক্সিমীচ আমাকে বললেন, 'আমি বলছি সঙ্গে-সঙ্গে সে দৌড়ে আসবে। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি ফটকের বাইরে যাব...। কী দুঃখের কথা ন... কে আমি চিনি না...'

ফটকের বাইরে এক বেঞ্চিতে মাক্সিম মাক্সিমীচ বসে রইলেন। আর আমি আমার ঘরে চলে গেলাম। আমাকেও স্বীকার করতে হবে পেচোরিনের জন্য কিছুটা ঔৎসুক্য নিয়ে আমিও অপেক্ষা করে রইলাম। কারণ ক্যাপ্টেনের গল্প যদিও মানুষটা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো অনুকূল চিত্র আঁকে নি,

---

* রুশ মুদ্রা, মূল্য আশী কোপেক। — সম্পাঃ

তবু তার চরিত্রের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমার মনে হয়েছিল বাস্তবিক অসাধারণ বলে। এক ঘণ্টা পরে পঙ্গুদের মধ্যে একজন ধূমায়িত এক সামোভার আর চায়ের কেটলি নিয়ে এলো। জানালা থেকে তাঁকে আমি হেঁকে বললাম, 'মাক্সিম মাক্সিমীচ, চা খাবেন?'

'ধন্যবাদ, আমি কিছু চাই না।'

'একটু খাওয়া ভালো। ইতিমধ্যেই রাত হয়ে গেছে আর ঠাণ্ডাও পড়ছে।'

'না, ধন্যবাদ...'

'আপনার যা ইচ্ছে!' বলে একলাই চা পান করতে বসলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে বৃদ্ধ ঘরে এলেন।

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন,' বললেন তিনি। একটু চা খাওয়া যাক...। আপনি ত জানেন আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। চাকরটা তার কাছে অনেকক্ষণ হল গেছে; মনে হচ্ছে কোনো ব্যাপারে সে আটকে পড়েছে।'

তাড়াতাড়ি তিনি এক পেয়ালা চা গিললেন, দ্বিতীয় পেয়ালা প্রত্যাখ্যান করলেন, তারপর ফিরে গেলেন ফটকের বাইরে। স্পষ্টই তিনি বিচলিত হয়ে উঠেছেন। বৃদ্ধ যে পেচোরিনের ঔদাসীন্যে আঘাত পেয়েছেন সে-কথা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, বিশেষ করে যে-হেতু হালে তিনি তাঁদের বন্ধুত্বের কথা আমার কাছে বলেছিলেন, আর তিনি এক ঘণ্টা আগে নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর নাম শোনামাত্র পেচোরিন দৌড়ে তাঁর কাছে আসবে বলে।

রাত বেড়ে উঠেছে। অন্ধকার হয়ে গেছে। আবার আমি জানালাটা খুলে মাক্সিম মাক্সিমীচকে হেঁকে বললাম যে শুয়ে পড়বার সময় হয়ে গেছে। উত্তরে বিড়বিড় করে কী যেন তিনি বললেন, আবার তাঁকে চলে আসতে আমি অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না।

বেঞ্চির উপর একটা মোমবাতি রেখে, গদিতে শুয়ে, গ্রেট-কোটে* সর্বাঙ্গ ঢেকে আমি শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। মাক্সিম মাক্সিমীচ অনেক রাতে ঘরে ফিরে আমাকে জাগিয়ে না দিলে শান্তিতে সমস্ত রাত ধরে আমি ঘুমোতাম। টেবিলের উপর পাইপটা ছুঁড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন, তারপর উনুনটায় লাগলেন খুটখাট করতে। অবশেষে শুয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে তিনি কাশলেন, থুথু ফেললেন আর বিছানায় এপাশ ওপাশ করে চললেন...

---

* সামরিক অফিসার যে ধরনের ওভারকোট ব্যবহার করেন। — সম্পাঃ

‘ছারপোকা কামড়াচ্ছে?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

‘হ্যাঁ, ছারপোকা...’ তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন।

পরের দিন ভোরবেলায় আমি জাগলাম, কিন্তু মাক্সিম মাক্সিমীচ ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছেন। তাঁকে দেখলাম ফটকের কাছে বেঞ্চির উপর বসে থাকতে। ‘কম্যাণ্ডাণ্টের সঙ্গে আমায় দেখা করতে হবে,’ তিনি বললেন। ‘অনুগ্রহ করে পেচোরিন যদি আসে তা হলে আমায় ডেকে পাঠাবেন...’

ডেকে পাঠাব বলে আমি কথা দিলাম। তিনি এমনভাবে দৌড় দিলেন যেন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যৌবনের শক্তি আর ক্ষিপ্রতা ফিরে পেয়েছে।

সকালটা ঝরঝরে, সুন্দর। পাহাড়ের উপর সোনালী মেঘ জমেছে ভাসমান নতুন পাহাড়ের চূড়োর সারির মতো। ফটকের সামনে এক চওড়া চক, সেটা ছাড়িয়ে বাজার, রবিবার বলে লোক গিসগিস করছে। ওসেতীয় ছেলেরা খালি পায়ে, বার্চ গাছের ছাল দিয়ে তৈরি মৌচাক-ভরা চুপড়িগুলো পিঠে বেঁধে আমাকে ছেঁকে ধরল। আমি কিন্তু তাদের ভাগিয়ে দিলাম, কারণ আমি অন্য কথা এত গভীরভাবে ভাবছিলাম যে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার ছিল না; ভালোমানুষ ক্যাপ্টেনের উৎকণ্ঠা আমার উপরেও ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

দশ মিনিট কাটে নি এমন সময় যে-লোকের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম চকের অন্য পাশে তাকে দেখা গেল, তার সঙ্গে কর্ণেল ন...। তিনি তাকে পান্থনিবাসে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন আর দুর্গে যাবার জন্য ফিরলেন। পঙ্গুদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে-সঙ্গে আমি পাঠালাম মাক্সিম মাক্সিমীচকে ডেকে আনার জন্য।

পেচোরিনের ভৃত্য তার সঙ্গে দেখা করে জানাল যে ঘোড়াগুলো এখনি প্রস্তুত হবে। ভৃত্য তাকে সিগারের বাক্স এগিয়ে দিল এবং গোটাকয়েক আদেশ পেয়ে সেইমতো কাজ করার জন্য চলে গেল। তার প্রভু একটা সিগার ধরিয়ে, দুয়েকবার হাই তুলে ফটকের ওপাশের এক বেঞ্চিতে বসল, এইবার তার চেহারার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা উচিত।

লম্বায় সে মাঝারি: তার ঋজু ছিপছিপে শরীর আর তার চওড়া কাঁধ থেকে বোঝা যায় পথের কষ্ট আর আবহাওয়ার পরিবর্তন সহ্য করার মতো শক্ত তার কাঠামো — রাজধানীতে লম্পটের জীবন যাপন করা কিংবা ভাবাবেগের সংঘর্ষ, কিছুই তাকে দুর্বল করতে পারে নি। তার ধূলিধূসর ভেলভেটের কোট শেষের দুটো বোতাম ছাড়া সবটাই খোলা, ভিতরে চোখ

ধাঁধানো সাদা জামার অনেকটা দেখা যায়; তাই থেকে বোঝা যায় যে তার অভ্যেস সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতো। তার ময়লা দস্তানাগুলো মনে হয় তার ছোটো, অভিজাত হাতগুলোর জন্য ঠিকই তৈরি হয়েছিল। একটা দস্তানা সে টেনে খুলে ফেলার পর তার ফ্যাকাশে আঙুলগুলোর শীর্ণতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তার হাঁটার ভঙ্গী অলস ও উদাসীন, কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম হাতদুটো সে দোলায় না — চরিত্রের এক বিশেষ ধরনের সংযমের অভ্রান্ত ইঙ্গিত। এগুলি কিন্তু আমার পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত আমার নিজস্ব মতামত। অন্ধভাবে এগুলিকে আপনাদের মেনে নিতে আমি বলব না। বেঞ্চির উপর যখন সে বসল তার উন্নত দেহটা কুঁজো হয়ে গেল, মনে হল যেন তার পিঠে শিরদাঁড়া নেই; তার সমস্ত ভাবভঙ্গীতে এখন প্রকাশ পেল এক ধরনের স্নায়বিক দুর্বলতা; সে বসে পড়ল, বাল্‌জাকবর্ণিত ত্রিশ বছর বয়সের ছেনাল-মেয়েরা*) ক্লান্তিকর বলনাচের পর যেভাবে গদি-মোড়া আরাম-কেদারায় এলিয়ে পড়ে। প্রথম দৃষ্টিতে তার বয়স তেইশ বছরের বেশী বলে মনে হল না, যদিও পরে তার বয়স ত্রিশ বলে মানতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। তার হাসির মধ্যে শিশুদের হাসির ছোঁয়াচ ছিল। মেয়েদের মতো নরম তার গায়ের চামড়া। তার স্বাভাবিক কোঁকড়া সোনালী চুল তার উন্নত ফ্যাকাশে ললাটের সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলে শুধু সেখানে দেখা যায় খুব সূক্ষ্ম রেখার জাল। হয়ত সেগুলো রাগ আর আধ্যাত্মিক অস্থিরতার সময় অনেক বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। তার চুলগুলো সোনালী হলেও ভ্রূ আর গোঁফজোড়া কালো — সাদা ঘোড়ার কালো কেশর আর কালো ল্যাজ যেমন তার কুলজীর নিশ্চিত চিহ্ন, এগুলিও তেমনি। এই বলে তার বর্ণনা শেষ করব যে নাকটা তার সামান্য ওপর-দিকে-ওঠা, দাঁতগুলো চোখঝলসানো সাদা আর চোখগুলো পিঙ্গলবর্ণের; কিন্তু তার চোখ সম্বন্ধে আরও দু'য়েক কথা বলব।

প্রথমত, সে যখন হাসে চোখগুলো হাসে না! মানুষের মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য কখনও কি আপনারা লক্ষ্য করেছেন?.. মন্দ প্রকৃতি অথবা গভীর ও সর্বদা বর্তমান বিষণ্ণতার সেটা লক্ষণ। যদি বলা যায়, তা হলে বলব যে সেগুলো আধ-বোজা চোখের পাতার তলায় জ্বলছে এক ধরনের অনুপ্রভ জ্যোতির মতো। আধ্যাত্মিক উষ্ণতা অথবা উর্বর কল্পনার জন্য নয়; সেটা হচ্ছে মসৃণ ইস্পাতের ঝলকের মতো চোখ-ধাঁধানো কিন্তু ঠাণ্ডা। তার দৃষ্টি চকিত কিন্তু মর্মভেদী ও পীড়াদায়ক, অবিবেচক প্রশ্নের মতো তার প্রভাব

অস্বস্তিকর। যদি না সেটা অমন শান্ত ও উদ্দেশ্যহীন হত তা হলে তাকে উদ্ধত বলে মনে হতে পারত। তার জীবনের কিছু ঘটনা জানি বলেই হয়ত এই সব কথা আমার মনে এলো। অন্য কেউ হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা করতেন। কিন্তু যেহেতু আপনারা আমার কাছ থেকে ছাড়া অন্য কারুর কাছ থেকে তার কথা জানতে পারবেন না, এই বর্ণনা নিয়েই তাই আপনাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পরিশেষে আমাকে বলতেই হবে, মোটামুটি বাস্তবিক তাকে দেখতে সুন্দর, আর তার মুখটা এমন অসাধারণ, অভিজাত সমাজের মেয়েদের কাছে যা বিশেষ করে প্রিয়।

ঘোড়াগুলো জোতা হল, জোয়ালের সঙ্গে আটকানো ঘণ্টাগুলো মাঝে মাঝে টিং টিং করছে, আর ভৃত্য ইতিমধ্যে দুবার পেচোরিনকে বলেছে যে গাড়ি প্রস্তুত। তবু কিন্তু মাক্সিম মাক্সিমীচের দেখা নেই। সৌভাগ্যক্রমে পেচোরিন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল; ককেশাসের নীল খাঁজ-কাটা পাহাড়ের দিকে সে তাকিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায় যাবার তার তাড়া নেই। তার কাছে আমি গেলাম।

'যদি আপনি আর একটু অপেক্ষা করেন,' আমি বললাম, 'তা হলে আপনার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে খুশি হবেন...'

'ওঃহো, ঠিক কথা!' তাড়াতাড়ি সে উত্তর দিল। 'গতকাল তাঁর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু কোথায় তিনি?' চকের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম মাক্সিম মাক্সিমীচ আমাদের দিকে প্রাণপণে ছুটে আসছেন...। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের কাছে তিনি পৌঁছলেন। তাঁর দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, টুপির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা কয়েকটা ভিজে পাকা চুল কপালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে আর হাঁটুগুলো থরথর করে কাঁপছে... প্রায় তিনি পেচোরিনের গলা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলেন, সে কিন্তু আবেগহীনভাবে হাত বাড়িয়ে দিল — যদিও হাসিটা তার মিষ্টি। মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেন হতভম্ব হয়ে গেলেন, তারপর সাগ্রহে নিজের দু'হাত দিয়ে হাতটা চেপে ধরলেন; তখনও তিনি কথা বলতে পারছেন না।

'ভারি আনন্দ হল, মাক্সিম মাক্সিমীচ কেমন আছেন?' পেচোরিন বলল।

'আর... তুমি?.. আর আপনি?..' বৃদ্ধ বাধো-বাধো গলায় বলতে লাগলেন, চোখ জলে ভরে উঠল। 'অনেক বছর পর... অনেক অনেক দিন পর... কিন্তু আপনি চললেন কোথায়?..'

'পারস্যে... তার পর আরও দূরে...'

'আশা করি এখনি যাচ্ছেন না?.. একটু থাকবেন ত!.. এখনি চলে যাবেন?.. অনেক দিন দেখা হয় নি...'

'মাক্সিম মাক্সিমীচ, আমাকে যেতেই হবে,' সে উত্তর দিল।

'হা ঈশ্বর, এত তাড়াহুড়োর কী দরকার?.. আপনাকে কত কথা আছে জিগগেস করার... অন্তত বলুন কী খবর? অবসর গ্রহণ করেছেন কি?.. কী করছিলেন এত দিন?..'

'একঘেয়েমিতে দিন কাটালাম,' হাসতে-হাসতে পেচোরিন উত্তর দিল।

'মনে আছে দুর্গে আমরা কেমন ছিলাম? শিকারের পক্ষে ভারি চমৎকার জায়গা!.. শিকার করতে-করতে আপনার আশ মিটত না...। বেলাকে মনে পড়ে?..'

একটু ফ্যাকাশে হয়ে পেচোরিন মুখ ফেরাল...

'হ্যাঁ, আমার মনে পড়ে,' সে বলল, আর প্রায় সেই সঙ্গেই অস্বাভাবিকভাবে হাই তুলল...

মাক্সিম মাক্সিমীচ তাকে আরও দুয়েক ঘণ্টা থেকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, 'দুপুরের ভোজটা চমৎকার হবে,' তিনি বললেন। 'আমার দুটো ফেজেণ্ট আছে, আর এখানকার কাখেতীয় মদ চমৎকার... অবশ্য জর্জিয়ার মতো নয়, কিন্তু এখানে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো। আর আমরা গল্পসল্পও করতে পারব...। আপনার সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে থাকার গল্প আমাকে বলবেন, কী বলেন?..'

'বাস্তবিক আমার বলবার মতো কিছুই নেই, মাক্সিম মাক্সিমীচ...। আমাকে এখন বিদায় নিতেই হবে, কারণ আমাকে যেতে হবে এখুনি... আমার তাড়া আছে...। আমাকে যে আপনার মনে আছে তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ...' বৃদ্ধের হাতটা চেপে ধরে সে বলল।

বৃদ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন...। তিনি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ দুই-ই হয়েছিলেন, যদিও নিজের অনুভূতিকে চাপতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

'ভুলে যাব!' তিনি বিড়বিড় করে বললেন। 'না, কিছুই আমি ভুলি নি...। আচ্ছা, যাক গে!.. আমি শুধু আশা করি নি এভাবে আমাদের দেখা হবে...'

‘থাক থাক, আর বলবেন না,’ বলে পেচোরিন তাঁকে বন্ধুর মতো আলিঙ্গন করল। ‘আমার মনে হয় না আমি বদলে গেছি...। যাই হোক, এর ওপর হাত নেই। প্রত্যেকের যার যার পথ আছে...। ঈশ্বরই জানেন আবার আমাদের দেখা হবে কিনা...।’ গাড়িতে বসে এই কথাগুলো সে বলল। গাড়োয়ান ইতিমধ্যেই লাগাম গুছিয়ে নিচ্ছিল।

‘এক মিনিট সবুর কর, এক মিনিট সবুর কর!’ গাড়ির দরজাটা ধরে অকস্মাৎ মাক্সিম মাক্সিমীচ চেঁচিয়ে উঠলেন। ‘একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম...। গ্রিগোরি আলেক্সান্দ্রভিচ, আপনার কাগজপত্রগুলো এখনও আমার কাছে আছে... আমার সঙ্গে নিয়েই ঘুরছি... ভেবেছিলাম জর্জিয়ায় আপনার দেখা পাব, স্বপ্নেও কখনও ভাবি নি ঈশ্বর আমাদের এখানে দেখা করাবেন...। সেগুলো নিয়ে কী আমি করব?’

‘আপনার যা খুশি,’ পেচোরিন উত্তর দিল। ‘বিদায়!..’

‘তা হলে আপনি পারস্যে চললেন?.. কবে ফিরবেন বলে মনে করেন?..’ তার উদ্দেশে মাক্সিম মাক্সিমীচ চিৎকার করে বললেন...

ইতিমধ্যে গাড়িটা খানিক দূরে চলে গিয়েছে, কিন্তু পেচোরিন এমনভাবে হাত নাড়াতে লাগল যার মানে এই ভাবে করা যায়: আমি কখনও ফিরব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এমন কোনও কারণও নেই যার জন্য ফিরতে হবে!..

ঘণ্টার টিং টিং আর পাথুরে পথের উপর চাকার ঘড় ঘড় দূরে মিলিয়ে যাবার বহুক্ষণ পরেও বেচারি বৃদ্ধ নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

‘হ্যাঁ,’ অবশেষে তিনি বললেন। নৈরাশ্যের অশ্রু তাঁর চোখের পাতায় ঝিকমিক করা সত্ত্বেও এক বেপরোয়া ভাব দেখাবার চেষ্টা তিনি করলেন। ‘নিশ্চয়ই আমরা বন্ধু ছিলাম, কিন্তু আজকের দিনে বন্ধুত্বের মানে কী?.. ওর কাছে আমার দামই বা কতটুকু? আমি ধনীও নই, আমার খেতাবও নেই, আর তা ছাড়া, আমার অনেক বয়েসও হয়ে গেছে...। সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে গিয়ে কী ফোতো নবাবই না হয়েছে!.. গাড়িটা আর লটবহর আর দেমাকে চাকরটার কথা একবার ভাবুন না!..’ এই কথাগুলো তিনি বললেন শ্লেষাত্মক হাসি হেসে। ‘আমাকে বলুন ত,’ আমার দিকে ফিরে তিনি বলে চললেন, ‘আপনার কী মনে হয়?.. কোন্ দানব ওকে এখন পারস্যে ঠেলে নিয়ে চলেছে?.. অদ্ভুত, নয় কি?.. আমি অবশ্য চিরকালই জানতাম ও এক

খামখেয়ালী মানুষ, ওর ওপর নির্ভর করা যায় না...। তবুও ও অপঘাতে মরলে দুঃখের ব্যাপার হবে... কিন্তু আপনি ত দেখলেন, কিছুই করার নেই। সর্বদাই আমি বলি যে যারা পুরনো বন্ধুদের ভুলে যায় তাদের ভালো কখনও হয় না!..' এই কথাগুলোর পর বিচলিত ভাব লুকোবার জন্য তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর তাঁর গাড়ির পাশে পায়চারি করতে লাগলেন, এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন চাকাগুলো পরীক্ষা করছেন, এদিকে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠছে।

'মাক্সিম মাক্সিমীচ,' তাঁর কাছে গিয়ে আমি বললাম, 'পেচোরিন কী সব কাগজপত্র আপনার কাছে রেখে গেছে?'

'ভগবান জানেন! কয়েকটা নোটবই না কী যেন...'

'ওগুলো নিয়ে কী করতে চান?'

'ওগুলো নিয়ে? ওগুলো দিয়ে বন্দুকের টোটা বানাতে আদেশ দেব।'

'আমাকে বরং ওগুলো দিয়ে দিন।'

বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তিনি তাকালেন, নিশ্বাস চেপে বিড়বিড় করে কী খানিক বকলেন, তারপর তাঁর সুটকেসটা হাতড়াতে লাগলেন। একটা নোটবই বার করে ঘৃণার সঙ্গে মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। দ্বিতীয়, তৃতীয় আর দশমটারও প্রথমটার অদৃষ্টে যা ঘটেছিল তাই ঘটল। বৃদ্ধের রাগের মধ্যে এক ছেলেমানুষী ভাব ছিল। তাঁর জন্য দুঃখিত হয়েছিলাম বলে হাসি চাপলাম...

তিনি বললেন, 'এই-ই সব। আপনার আবিষ্কারের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি...'

'এগুলো নিয়ে আমার যা খুশি করতে পারি?..'

'ইচ্ছে হলে খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেবেন, আমার কী আসে যায়?.. বাস্তবিকই ত, আমি তার বন্ধু আত্মীয়?.. সত্যি বটে অনেক দিন তার সঙ্গে একই বাড়িতে ছিলাম...। কিন্তু আমি ত কত ধরনের লোকের সঙ্গেই থেকেছি...'

ক্যাপ্টেন তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারেন এই ভয়ে তাঁর কাগজগুলো আমি সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে গেলাম। খানিক পরেই আমাদের জানানো হল যে এক ঘণ্টার মধ্যেই ওকাজিয়া রওনা হবে। আমার ঘোড়াগুলো জোতবার আদেশ আমি দিলাম। আমি যখন টুপি পরছি ক্যাপ্টেন তখন আমার ঘরে

এলেন। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবার কোনও লক্ষণই তিনি দেখালেন না। তাঁর মধ্যে এক অস্বাভাবিক উদাসীন ভাব রয়েছে।

'আপনি যাবেন না, মাক্সিম মাক্সিমীচ?'

'না।'

'কেন?'

'কম্যাণ্ডাণ্টের সঙ্গে দেখা হয় নি। তাঁকে কিছু সরকারী জিনিসপত্র দিতে হবে...'

'কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান নি কি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' তিনি আমতা-আমতা করতে লাগলেন, 'কিন্তু তিনি বাড়ি ছিলেন না... আর আমিও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করি নি।'

তিনি কী বলতে চান আমি বুঝলাম। সম্ভবত, জীবনে প্রথম, সরকারী ভাষায় বলতে গেলে নিজের সুবিধার জন্য বেচারি বৃদ্ধ তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেছিলেন — আর এই হল তার পুরস্কার!

'মাক্সিম মাক্সিমীচ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' আমি বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে বলে। বাস্তবিক আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'আপনাদের মতো তরুণদের সঙ্গে আমাদের মতো অশিক্ষিত সেকেলে বুড়োরা কী করে পাল্লা দিতে পারে!.. আপনারা অহঙ্কারী, অভিজাত সমাজের তরুণরা: চারদিকে এখানে চেরকেসীয় গুলি ছুটছে বলে কোনো মতে আপনারা আমাদের বরদাস্ত করেন... কিন্তু ভবিষ্যতে হঠাৎ যদি আমাদের দেখা হয় তা হলে আমাদের মতো লোকের করমর্দন করতে আপনাদের লজ্জা হবে।'

'মাক্সিম মাক্সিমীচ, এ-ধরনের বকুনি খাবার মতো কোনো কিছু আমি করি নি।'

'জানেন ত, আমি সাধারণভাবে বলছি। যাই হোক, আপনার মঙ্গল হোক, আপনার যাত্রা যেন আনন্দের হয়।'

আড়ষ্টভাবে আমরা বিদায় নিলাম। সহৃদয় মাক্সিম মাক্সিমীচ এখন এক একগুঁয়ে বদমেজাজী ক্যাপ্টেন। কিন্তু কেন? কারণ অন্যমনস্কতা বা অন্য কোনো কারণে পেচোরিন তাঁর দিকে শুধু হাত প্রসারিত করেছিল, যখন তিনি তাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন। কোনো যুবকের সুন্দরতম আশা ও স্বপ্নকে ধূলিসাৎ হতে দেখলে কষ্ট হয়, যে গোলাপী মায়া দিয়ে মানুষের

কর্ম ও আবেগ সে দেখেছিল কষ্ট হয় তাকে হারাতে দেখলে — যদিও তখনও আশা থাকে যে পুরনো ভ্রান্তির বিনিময়ে সে হয়ত নতুন ভ্রান্তি খুঁজে পাবে — সেটাও সমানই ক্ষণস্থায়ী তবু সমানই মধুর...। কিন্তু মাক্সিম মাক্সিমীচের বয়সে সেগুলির বিনিময়ে পাবার কী আছে? ইচ্ছে না করলেও হৃদয় কঠিনতর হয় আর আত্মা শুকিয়ে আসে...

আমি একা যাত্রা করলাম।

পেচোরিনের ডায়েরি

মুখবন্ধ

হালে আমি জানতে পেরেছি পারস্য দেশ থেকে ফেরার সময় পেচোরিনের মৃত্যু হয়েছে। এ-খবরে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম, কারণ এ-ঘটনা তার রচনাকে ছাপবার অধিকার আমাকে দিয়েছে। অন্য লোকের রচনায় নিজের নাম স্বাক্ষর করার সুযোগ আমি গ্রহণ করলাম। ঈশ্বর করুন, এই নির্দোষ ছলনার জন্য পাঠকরা যেন আমাকে দণ্ড না দেন।

এখন আমি অল্প কথায় বুঝিয়ে বলব কেন, যে-লোককে কখনও জানি নি, তার গোপনতম কথা জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। তার বন্ধু হলে কথাটা না হয় বোঝা যেত; কারণ আসল বন্ধুর কুটিল অশোভন আচরণ প্রত্যেকের কাছেই বোধগম্য। আমি কিন্তু তাকে মাত্র একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখেছিলাম, অতএব তাকে সেই দুর্বোধ্য ঘৃণার সঙ্গে দেখা সম্ভব নয় যেটা বন্ধুত্বের আড়ালে থেকে কেবল অপেক্ষা করে থাকে স্নেহের পাত্রের মৃত্যু অথবা দুঃসময়ের জন্য যাতে তাকে নিয়ে তার মাথার উপর নিন্দা, উপদেশ, ঠাট্টা এবং অনুকম্পার শিলাবৃষ্টি করা চলে।

এই লেখাগুলো আবার পড়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে মানুষটা আন্তরিকতার সঙ্গে নির্দয়ভাবে তার নিজের দুর্বলতা ও পাপের কথা প্রকাশ করেছে। কোনো মানুষের আত্মার কাহিনী, সে আত্মা যত নীচই হোক না কেন, যে-কোনো জাতির কাহিনীর চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ নয়, বিশেষ করে সেটা যদি পরিণত মনের আত্ম-পর্যবেক্ষণের ফল হয়, আর লেখা হয়ে থাকে দয়া কিংবা বিস্ময় উদ্রেক করার দাম্ভিক ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে। রুসোর স্বীকারোক্তির*) নানা দোষের মধ্যে একটি হল এই যে সেটি তিনি তাঁর বন্ধুদের পড়ে শুনিয়েছিলেন।

অতএব কিছু ভালো কাজ করার ইচ্ছেতেই যে-ডায়েরি হঠাৎ পেয়েছিলাম তার কতক-কতক অংশ প্রকাশ করতে আমি উৎসাহিত হয়েছি। যদিও সব চরিত্রের নাম আমি বদলে দিয়েছি, তবুও এতে যাঁদের উল্লেখ আছে বোধ হয় তাঁরা নিজেদের চিনতে পারবেন আর হয়ত, যে-লোক এখন আর ইহজগতে নেই, তার যে-সব কর্মের জন্য তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন সে-সবের প্রকৃত কারণ জানতে পারবেন। কারণ, যা বুঝতে পারি তা প্রায়ই আমরা ক্ষমা করে থাকি।

এই বইতে আমি শুধু সেই সব অংশই উদ্ধৃত করেছি যার সঙ্গে পেচোরিনের ককেশাসে থাকার সম্বন্ধ আছে। এ-ছাড়াও আমার কাছে মোটা একটা খাতা আছে যাতে সে নিজের পুরো জীবনের কথা লিখেছে। কোনোদিন জনসাধারণের বিচারের জন্য সেটিকেও পেশ করা হবে; এখন কিন্তু নানা গুরুত্বপূর্ণ কারণের জন্যে নিজে আমি দায়িত্ব নিতে ভরসা করছি না।

কয়েকজন পাঠক হয়ত জানতে চাইবেন পেচোরিনের চরিত্র সম্বন্ধে আমার নিজের মতামত কী। আমার উত্তর বইটির নাম থেকেই জানা যাবে। তাঁরা বলবেন, 'এ ত তিক্ত শ্লেষ।' — আমি জানি না।

১

তামান*)

রাশিয়ার সমস্ত সমুদ্র-তীরের শহরের মধ্যে তামান সবচেয়ে জঘন্য। সেখানে প্রায় আমি অনাহারে মরতে বসেছিলাম, অধিকন্তু আমাকে ডুবিয়ে মারার চেষ্টাও হয়েছিল। অনেক রাত্রে ঘোড়ায়-টানা ডাক-গাড়িতে সেখানে আমি পেঁছিলাম। একমাত্র পাকা বাড়ির ফটকের সামনে গাড়োয়ান ত্রয়কার* ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে থামাল। শহরের প্রবেশ-পথের সামনেই ছিল বাড়িটা। গাড়ির টিং টিং শব্দে জেগে উঠে পাহারার কাজে নিযুক্ত কৃষ্ণ সাগরের কসাক বিকট চেঁচিয়ে উঠল, 'কে যায়?' বাড়ি থেকে এক কসাক সার্জেণ্ট আর স্থানীয় পুলিশ বেরিয়ে এলো। আমি বললাম যে আমি একজন অফিসার, সরকারী কাজে এক সেনাবাহিনীতে চলেছি। দাবি জানালাম রাত্রিবাসের। পুলিশের লোকটি আমাদের শহরে নিয়ে গেল। যে বাড়িতেই থামি সেটাই ভর্তি। খুব ঠাণ্ডা, আর পর-পর তিন রাত না-ঘুমনোয় আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই মেজাজ গরম হয়ে উঠতে লাগল। 'হতভাগা, যেখানে খুশি নিয়ে চল! ইচ্ছে হলে জাহান্নামেও — থাকবার জায়গা পেলেই হল!' চিৎকার করে আমি বললাম। মাথার পিছনটা চুলকে পুলিশের লোকটি বলল, 'এখনও একটা জায়গা খোঁজা বাকি আছে। আপনার কিন্তু মশাই, জায়গাটা পছন্দ হবে না, জায়গাটা গণ্ডগোলে!' তার শেষ উক্তির আসল মানে ধরতে না পেরে আমি তাকে বললাম নিয়ে যেতে। অনেকক্ষণ ধরে কাদা-ভরা নানা গলির ভিতর দিয়ে ঘুরলাম, দু'পাশে তার জীর্ণ বেড়া। তারপর সমুদ্র-তীরের উপরকার ছোটো একটি কুটিরে আমরা পেঁছিলাম।

আমার ভাবী বাসস্থানের নল-খাগড়ার ছাত আর সাদা দেয়ালের উপর

---

* রুশ দেশে তিন ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। — সম্পাঃ

পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্না পড়েছে। উঠোনটা এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেয়ালে ঘেরা। সেখানে আরও একটি ভাঙাচোরা কুটির, প্রথমটির চেয়ে ছোটো আর প্রাচীন। কুটিরের দেয়ালের একেবারে গা ঘেঁষে খাড়া পাহাড় আচমকা সমুদ্র পর্যন্ত নেমে গেছে। নীচে ঘন নীল ঢেউ বেলাভূমির উপর ক্রমাগত গর্জন করে ভেঙে পড়ছে। প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাঁদ তাকিয়ে রয়েছে বিক্ষুব্ধ অথচ আজ্ঞাবহ সমুদ্রের দিকে। তার আলোয় দেখতে পেলাম তীর থেকে দূরে দুটি জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে, ফিকে দিগন্তের পটভূমিতে তাদের কালো মাস্তুল ও দড়াদড়ি যেন নিশ্চল এক মাকড়সার জাল। ভাবলাম, 'জাহাজ ওখানে নোঙর ফেলে রয়েছে। কাল আমি গেলেন্‌জিকে যাত্রা করব।'*)

সীমানা-বাহিনীর এক কসাক আমার ভৃত্যের কাজ করে। আমার সুটকেসটা নামাতে আর গাড়োয়ানকে বিদায় করতে তাকে বলে আমি বাড়ির মালিকের জন্য হাঁক দিলাম। কোনো উত্তর নেই। দরজায় ধাক্কা দিলাম, তবু কোনো সাড়া নেই...। এর মানে কী? অবশেষে অলিন্দে বছর চোদ্দ বয়সের একটি ছেলেকে দেখা গেল।

'বাড়ির কর্তা কোথায়?' 'কর্তা নেই।' 'কী? বলতে চাস যে এ-বাড়ির কোনো কর্তাই নেই?' 'একজনও নেই।' 'আর কর্ত্রী?' 'শহরে গেছে।' 'আমার জন্যে দরজা কে খুলবে?' দরজায় পদাঘাত করে আমি বললাম। আপনা থেকেই দরজাটা খুলে গেল, আর কুটিরের ভেতর থেকে এক ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে এলো। গন্ধকের এক দেশলাই জ্বালিয়ে ছেলেটার নাকের কাছে নিয়ে এলাম, সেই আলোয় দেখলাম দুটি সাদা চোখ। সে অন্ধ, জন্ম থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ। আমার সামনে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আমি তার মুখটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম।

আমি স্বীকার করছি যে অন্ধ, টেরা, কালা, বোবা, পা-কাটা, নুলো, কুঁজো, ইত্যাদি সবাইকার সম্পর্কেই আমার ঘোরতর কুসংস্কার আছে। আমি লক্ষ্য করেছি যে সর্বদাই মানুষের বাইরের চেহারার সঙ্গে তার অন্তরের এক আশ্চর্য সম্পর্ক আছে — মনে হয় যেন কোনো অঙ্গ হারালে তার আত্মাও যেন অনুভব করার শক্তি খানিকটা হারায়।

তাই আমি অন্ধ ছেলেটার মুখ পরীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু যে-মুখে চোখ নেই সেখান থেকে কী-ই বা বোঝা যেতে পারে?.. অনিচ্ছা সত্ত্বেও করুণার সঙ্গে অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলাম। তার পাতলা ঠোঁটের উপর অস্পষ্ট হাসি খেলে গেল। কেন জানি না সেটা আমার অত্যন্ত

অপ্রীতিকর ঠেকল। আমার মনে চকিত এক সন্দেহ ঝলসে উঠল যে তাকে যতটা দেখাচ্ছে হয়ত আসলে সে ততটা অন্ধ নয়। বৃথাই আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে চোখের ছানির ভান করা অসম্ভব। আর কেনই বা লোকে সে-রকম করবে? কিন্তু সন্দেহ না করে পারলাম না, কারণ প্রায়ই আমি আগে থেকে ধারণা করে নিতে অভ্যস্ত...

'তুমিই কি কর্তার ছেলে?' অবশেষে তাকে আমি প্রশ্ন করলাম। 'না।' 'তা হলে তুমি কে?' 'অনাথ, গরীব এক অনাথ।' 'কর্ত্রীর কি কোনো ছেলেমেয়ে আছে?' 'না। তার এক মেয়ে ছিল, কিন্তু সে এক তাতারের সঙ্গে সমুদ্রের ওপারে পালিয়েছে।' 'কী ধরনের তাতার?' 'শয়তানই জানে। ক্রিমিয়ার তাতার, কের্চের এক মাঝি।'*)

কুটিরে আমি প্রবেশ করলাম। বাড়ির আসবাব-পত্রের মধ্যে শুধু দুটো বেঞ্চি, একটা টেবিল আর উনুনের পাশে বিরাট একটা সিন্দুক। দেয়ালের উপর একটিও বিগ্রহ নেই — দুর্লক্ষণ। একটা ভাঙা জানালার ভেতর দিয়ে সমুদ্রের বাতাস ঘরে আসছে। আমার সুটকেস থেকে এক টুকরো মোমবাতি বার করে, জ্বালিয়ে আমি আমার জিনিসপত্রগুলো ঠিকঠাক করতে লাগলাম। আমার তরোয়াল আর বন্দুকটা ঘরের এক কোণে রাখলাম, টেবিলের ওপর রাখলাম পিস্তলটা, আর আমার ক্লোকটা বিছিয়ে দিলাম এক বেঞ্চির উপর, অন্য বেঞ্চিটায় কসাক তার ক্লোকটা বিছাল। দশ মিনিটের মধ্যে তার নাক ডাকতে লাগল, আমি কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না, অন্ধকারের মধ্যে সাদা-চোখওলা ছেলেটা আমার সামনে যেন ভেসে বেড়াতে লাগল।

এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কাটল। জানালার উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে আর একটি রশ্মি লুটিয়ে পড়েছে কুটিরের মাটির মেঝের উপর। অকস্মাৎ মেঝের আলোকিত অংশের উপর দিয়ে একটা ছায়া ছুটে গেল। খানিক উঠে পড়ে আমি জানালার বাইরে তাকালাম। আবার কে যেন সামনে দিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, ঈশ্বর জানেন কোথায়। পাহাড় বেয়ে সমুদ্র-তীরে নেমে যাওয়া জীবটার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হল না, কিন্তু অন্য কোথাও তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। আমি উঠে পড়লাম, পরলাম আমার বেশ্‌মেৎ, কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে নিলাম একটা ছোরা, তারপর পা টিপে-টিপে কুটির থেকে বেরুলাম। অন্ধ ছেলেটা আমার দিকে আসছিল। বেড়াটার পাশে আমি সরে দাঁড়ালাম। সে দ্বিধাহীন অথচ সাবধানী পায়ে চলে গেল আমার সামনে দিয়ে। বগলে তার একটা বাণ্ডিল। নৌকো যেখানে থামে সেদিকে সে এক

খাড়া সরু পথ ধরে নামতে লাগল। আমি ভাবলাম, 'সেই দিন অন্ধরা পারবে দেখতে, বোবারা পারবে চিৎকার করতে'।*) তার ওপর ভালো করে নজর রাখলাম, যাতে না সে চোখের আড়ালে চলে যায়।

ইতিমধ্যে মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়তে লাগল, আর সমুদ্র থেকে উঠল কুয়াশা। তার ভেতর দিয়ে তীরের সবচেয়ে কাছের জাহাজের পেছনের আলো প্রায় দেখাই যায় না। তীরের উপর গণ্ডশিলার গায়ে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের ফেনাগুলো জ্বলছে। যে-কোনো মুহূর্তেই জাহাজের ডুবে যাবার ভয়। বহু কষ্টে খাড়া পথ চিনে নামতে-নামতে দেখলাম: অন্ধ ছেলেটাকে থামতে, তারপর ডান দিকে ফিরে জলের এত কাছ দিয়ে সে চলতে শুরু করল যে মনে হল নিশ্চয়ই ঢেউগুলো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রের মধ্যে। যে রকম নিশ্চিন্তভাবে গর্ত এড়িয়ে পাথর থেকে পাথরের উপর পা ফেলে-ফেলে সে চলেছে তা দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল যে এই ভাবে এই প্রথম সে যাচ্ছে না। অবশেষে সে থামল, যেন কিছু শুনতে চায়, তারপর বাণ্ডিলটা পাশে রেখে সে মাটির উপর বসে পড়ল। খাড়া তীরসংলগ্ন উদ্গত এক পাথরের পিছনে লুকিয়ে তার উপর আমি নজর রেখে চললাম। কয়েক মিনিট পরে অন্য দিক থেকে এক সাদা কাপড়-ঢাকা মূর্তির আবির্ভাব হল। অন্ধ ছেলেটার কাছে এসে তার পাশে সে বসে পড়ল। বাতাসে-ভেসে-আসা তাদের কাটা-কাটা কথা শুনতে পেলাম।

'কানা, কী বলিস?' এক নারীকণ্ঠ বলল। 'ভারি ঝড়, ইয়াঙ্কো আসবে না।'

'ইয়াঙ্কো ঝড়কে ভয় পায় না,' অন্যজন উত্তর দিল।

'কুয়াশা ঘন হয়ে উঠছে,' নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল, তাতে বিষণ্ণ সুর।

'পাহারাদার জাহাজগুলোর চোখে ধুলো দেয়া তাতে সহজ হবে,' উত্তর শোনা গেল।

'সে যদি ডুবে যায় তা হলে?'

'গেলেই বা, তাতে কী? রবিবারে নতুন ফিতে না বেঁধে তুমি গির্জেয় যাবে।'

খানিক চুপচাপ। একটা ব্যাপারে আমি কিন্তু অবাক হলাম: অন্ধ ছেলেটা ইউক্রেনীয় উপভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলেছিল, এখন সে শুদ্ধ রুশ বলছে।

'দেখলে ত, আমার কথাই ঠিক,' হাততালি দিয়ে অন্ধ ছেলেটা আবার

বলে উঠল। 'ইয়াঙ্কো সমুদ্র, কিংবা কুয়াশা, কিংবা তীরের পাহারাদারদের ভয় করে না। শোনো, ওগুলো ঢেউয়ের ঝপঝপ নয়, আমাকে বোকা বানাতে পারবে না: ওগুলো তার লম্বা-লম্বা দাঁড়ের শব্দ।'

মেয়েটি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে দূরের দিকে তাকাতে লাগল।

'যত সব প্রলাপ বকছিস, কানা,' সে বলল। 'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

আমাকেও স্বীকার করতে হবে আমার সব চেষ্টা সত্ত্বেও দূরে আমিও কোনো নৌকো দেখতে পেলাম না। এ-ভাবে মিনিট দশেক কাটবার পর পাহাড়ের মতো বড়-বড় ঢেউগুলোর মধ্যে একটা কালো ছোট্ট বিন্দু দেখা গেল — কখনও বড় কখনও ছোটো হয়ে যাচ্ছে সেটা। ধীরে-ধীরে ঢেউয়ের চুড়োয় উঠে ঝপ করে পড়ছে আবার খোঁদলে — এই ভাবে নৌকোটা তীরের দিকে এগুচ্ছে। যে-মাঝি এ-রকম রাত্রে প্রণালীর কুড়ি ভার্স্ট অতিক্রম করার ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে পারে বাস্তবিকই সে বেপরোয়া, আর যে-কারণে এ-কাজ সে করেছে নিশ্চয়ই সেটা অতিশয় জরুরি। এ-কথা ভাবতে-ভাবতে আপনা থেকেই আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল! ঠুন্‌কো নৌকোটাকে আমি দেখতে লাগলাম, হাঁসের মতো নিপুণভাবে ডুব দিতে, তারপর জলের গহ্বর থেকে ছিটিয়ে-পড়া ফেনার মধ্যে দিয়ে দাঁড়ের দ্রুত সঞ্চালনের সঙ্গে লাফিয়ে উঠতে — মনে হয় যেন ডানা নাড়ছে। আমি ভাবলাম তীরের উপর সবেগে আছড়ে পড়ে সেটা চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু নিখুঁতভাবে সেটা ঘুরে গিয়ে পাথরের আড়াল-করা ছোট্ট এক জায়গায় নিরাপদে প্রবেশ করল। নৌকো থেকে বেরিয়ে এলো মাঝারি গড়নের একটা লোক, মাথায় তার ভেড়ার চামড়ার তাতার টুপি। হাত দিয়ে সে ইঙ্গিত করল, আর তারা তিন জনে নৌকো থেকে কী যেন টেনে বার করতে শুরু করল; এত বেশী জিনিস ছিল যে আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি না, নৌকোটা কেন ডুবে যায় নি। প্রত্যেকে একটা করে বাণ্ডিল কাঁধে নিয়ে তীর ধরে চলল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। বাসস্থানে ফিরতে হল আমাকে। আমাকে স্বীকার করতে হবে এই সব অদ্ভুত ঘটনা আমাকে ভয় পাইয়েছিল। সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল।

জেগে উঠে আমাকে সম্পূর্ণ সজ্জিত দেখে আমার কসাক ভৃত্য অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। তাকে কিন্তু আমি কোনো কৈফিয়ৎ দিলাম না। ছোটো-

ছোটো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে ঢাকা নীল আকাশ আর ক্রিমিয়ার গাঢ় বেগনী রঙের বেলাভূমিকে — সোজা যেটি ফিতের মতো চলে গিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত আর শেষ হয়েছে সাদা আলোকস্তম্ভ-বসানো উঁচু এক পাহাড়ে — খানিক তারিফ করে ফানাগোরিয়া দুর্গের*) কম্যান্ডান্টকে জিগ্‌গেস করতে গেলাম কখন আমি গেলেন্‌জিকে যাত্রা করতে পারি।

কিন্তু হায়! সঠিকভাবে কম্যান্ডান্ট আমাকে কিছু বলতে পারলেন না। বন্দরের জাহাজগুলো হয় তীর পাহারা দেবার, কিংবা বাণিজ্যপোত। শেষোক্তগুলিতে তখন মাল-ভরা পর্যন্ত শুরু হয় নি। 'হয়ত তিন-চার দিনের মধ্যে এক ডাকের জাহাজ এসে পেঁছবে,' কম্যান্ডান্ট বললেন, 'তখন দেখা যাবে।' বিষণ্ণ ও ক্রুদ্ধ হয়ে আমার বাসস্থানে ফিরলাম। আমার কসাক ভৃত্য দরজা খুলে দিল, মুখে তার আতঙ্কের ছায়া।

'প্রভু, খারাপ খবর!' সে বলল।

'হ্যাঁ, বন্ধু! ভগবানই জানেন, কবে আমরা যেতে পারব!' এবারে তাকে আরও বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাল। আমার দিকে নীচু হয়ে সে ফিসফিস করে বলল:

'এ জায়গাটা কেমন যেন গণ্ডগোলে! কৃষ্ণ সাগর সেনাদলের সার্জেণ্টের সঙ্গে আজ আমার দেখা হয়েছিল। তাঁকে আমি চিনতাম, গত বছর একই সেনাদলে আমরা ছিলাম। আমরা কোথায় উঠেছি বলায় তিনি বললেন, 'বন্ধু, জায়গাটা গণ্ডগোলে, লোকগুলো সুবিধের নয়!..' আর, ভালো কথা, এই কানাটা কী ধরনের ছোকরা! সর্বত্রই একলা যায় — রুটির জন্যে যায়, বাজারে যায়, জল আনতেও... আপনি বুঝতে পারবেন এখানে এ-সব ব্যাপারে তারা অভ্যস্ত।'

'তাতে কী হয়েছে? বাড়ির কর্ত্রী শেষ পর্যন্ত এসেছেন কী?'

'আপনি যখন বাইরে ছিলেন এক বুড়ি তার মেয়েকে নিয়ে এসেছিল।'

'কোন্ মেয়ে? তার কোনো মেয়ে নেই।'

'ভগবান জানেন, মেয়েটা তা হলে কে। বুড়ি এখন তার কুটিরেই আছে।'

কুটিরের মধ্যে আমি গেলাম। উনুনে ভালো করে আঁচ দেওয়া হয়েছে আর দরিদ্র লোকেদের তুলনায় মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য বেশ ভালো খাবারই রান্না হচ্ছে। আমার সব কথার জবাবে বুড়ি জানাল যে সে কালা, আমার কথা সে শুনতে পাচ্ছে না। কী আর করি? উনুনের সামনে বসে অন্ধ ছেলেটা আগুনে কাঠকুটো দিচ্ছিল। আমি তার কান ধরে বললাম, 'ওরে

কানা শয়তান, এখন বল কাল রাতে বাণ্ডিলটা নিয়ে কোথায় গিয়েছিলি?' সে কেঁদে উঠে হাউমাউ করতে লাগল, 'কোথায় গিয়েছিলাম?.. কোথাও নয়... কোনো বাণ্ডিলের খবর আমি জানি না।' কী ঘটছে এবার শুনতে পেয়ে বুড়ি অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, 'কী সব সন্দেহ, আর তাই কিনা এই বেচারাকে নিয়ে! ওকে নিজের মনে থাকতে দেন না কেন? ও আপনার কী করেছে?' এতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে এলাম আর রহস্যভেদ করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হলাম।

আমার ক্লোকটা জড়িয়ে দূরের দিকে চেয়ে দেয়ালের পাশের এক পাথরের উপর আমি বসে রইলাম। গত রাত্রির ঝড়ে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র আমার সামনে প্রসারিত। ঘুমিয়ে-পড়া শহরের মর্মর ধ্বনির মতো তার একঘেয়ে গর্জন অতীত দিনের কথা মনে পড়িয়ে দিল। আমার ভাবনা ভেসে চলল উত্তরে, আমাদের শীতল রাজধানীতে। তন্ময় হয়ে ভাবতে-ভাবতে সবকিছু ভুলে গেলাম...। এইভাবে এক ঘণ্টা কিংবা আরও বেশী সময় কাটল। অকস্মাৎ গানের মতো কিছু একটা শুনতে পেলাম। সেটা গানই বটে, গলাটি মিষ্টি, মেয়েলি, কিন্তু কোথা থেকে আসছে?.. আমি সেটা শুনতে লাগলাম; অদ্ভুত সুর, কখনও মৃদু ও বিলাপকারী, কখনও দ্রুত আর প্রাণরসে ভরপুর। চারদিকে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না; আবার শুনলাম, মনে হল শব্দটা যেন আকাশ থেকে আসছে। ওপরে চেয়ে আমি দেখলাম: আমার কুটিরের ছাদের উপর ডোরা-কাটা পোশাক-পরা একটি মেয়েকে: চুল এলো করা, বাস্তবিক যেন এক জল-কুমারী। হাত দিয়ে সূর্যকে আড়াল করে দিগন্তের দিকে সে তাকিয়ে আছে, কখনও হাসছে আর নিজের মনেই কথা বলছে, কখনও আবার গানটা ধরছে।

গানটার প্রতিটি কথা আমি মুখস্থ করে নিলাম:

অসীম সবুজ সমুদ্রের বুকে
অবাধ তরঙ্গমালার উপর দিয়ে
চলেছে জাহাজেরা,
সাদা পাল উড়িয়ে।
সেই সব জাহাজের মধ্যে
চলেছে
আমার মাস্তুলহীন
দু-দাঁড়ের নৌকো।
ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করল,

দুলছে বড়-বড় জাহাজ,
তাদের ডানা বিছিয়ে দিয়ে
ঝাপটাচ্ছে সমুদ্রের বুকে।
তখন আমি ক্রুদ্ধ সমুদ্রের কাছে
নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি:
'হে মহা ভয়ংকর, আমার ছোট্ট নৌকোটাকে ছেড়ে দাও!'
তাকে আমি করি অনুনয়।
'নৌকোয় রয়েছে
দামী-দামী জিনিস!
অন্ধকার রাত্রে এই নৌকো চালাচ্ছে
এক সাহসী লোক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনে পড়ল একই স্বর গতকাল রাত্রে শুনেছিলাম। মুহূর্তের জন্য আমি চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। আবার যখন ছাদের ওপর তাকালাম, দেখলাম মেয়েটি আর সেখানে নেই। অকস্মাৎ আমার সামনে দিয়ে সে চলে গেল, এখন সে ধরেছে ভিন্ন গান। আঙুল মটকাতে-মটকাতে বুড়ির কাছে গেল সে দৌড়ে। শুনতে পেলাম তর্ক-বিতর্কে তাদের গলা চড়ছে। বুড়ি খুব চটে উঠল, কিন্তু মেয়েটি কেবল উচ্চস্বরে লাগল হাসতে। একটু পরে আমার উণ্ডিনা*) আবার নাচতে-নাচতে এলো। আমার দিকে এগিয়ে আসার সময় খানিক থেমে সোজা সে আমার চোখের দিকে তাকাল; আমাকে সেখানে দেখে সে যেন অবাক হয় গেছে। তারপর তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে ঘুরে ধীরে-ধীরে সে নৌকো-থামার জায়গাটার দিকে নেমে গেল। এখানেই অবশ্য ব্যাপারটা শেষ হল না: সমস্ত দিন ধরে আমার ঘরের চারদিকে সে ঘুরঘুর করতে লাগল, কখনও গান গায়, কখনও লাফায় — এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই। বাস্তবিক সে অদ্ভুত জীব! তার মুখে এতটুকু উন্মত্ততার চিহ্ন নেই; বরঞ্চ তার চোখদুটো অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। সেই চাউনির মধ্যে রয়েছে এক আকর্ষণী শক্তি। প্রতিটি চাউনিই যেন বলছে তাকে প্রশ্ন করতে। কিন্তু যেই আমি কথা বলতে গিয়েছি, সে দৌড়ে পালিয়েছে, ধূর্ত হাসি হাসতে-হাসতে।

তার মতো কোনো মেয়ে কখনো আমি দেখি নি। একেবারেই তাকে সুন্দর দেখতে নয়, যদিও সৌন্দর্য সম্বন্ধে এক ধারণা আগে থেকেই আমার মনে আছে। তার মধ্যে উৎকৃষ্ট বংশের পরিচয় যথেষ্ট... আর ঘোড়াদের বেলায় যেমন, মেয়েদের বেলাতেও তেমনি সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই

আবিষ্কার তরুণ ফ্রান্সের।*) এটা অর্থাৎ তরুণ ফ্রান্স নয়, বংশপরিচয় প্রধানত বোঝা যায় চলন আর হাত-পা দেখে — বিশেষ করে তার লক্ষণ ধরা পড়ে নাকে। রাশিয়ায় নিখুঁত নাক ছোটো পায়ের চেয়ে অনেক কম। আমার গায়িকাকে দেখে মনে হল না আঠারো বছরের চেয়ে বড়। তার অসাধারণ লালিত্যময় শরীর, মাথা হেলাবার বিশিষ্ট ভঙ্গী, তার দীর্ঘ পিঙ্গল বর্ণের চুল, তার সামান্য রোদে-পোড়া গলা ও কাঁধের সোনালী ধরনের আভা আর বিশেষ করে তার নিখুঁত নাক আমাকে মুগ্ধ করল। যদিও তার আড়চোখে-চাওয়া দৃষ্টিকে আমার খানিক বন্য ও সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল এবং যদিও তার হাসির মধ্যে এমন কিছু ছিল ভাষায় যা প্রকাশ করা যায় না, তবু পূর্বজাত ধারণাগুলোরই জয় হল। নিখুঁত নাকের গড়ন আমার মাথা ঘুরিয়ে দিল; আমার মনে হল আমি বুঝি খুঁজে পেয়েছি গ্যেটের মিননকে,*) তাঁর জার্মান কল্পনার অপরূপ উদ্ভাবনকে। আর বাস্তবিক তাদের দু'জনের মধ্যে অনেক মিল আছে — সেই চরম আকুলতা থেকে নিমেষে পাথর হয়ে যাওয়া, সেই হেঁয়ালি-ভরা কথোপকথন, সেই লম্ফন এবং সেই বিচিত্র সঙ্গীত...

সন্ধের দিকে তাকে আমি দরজার কাছে থামিয়ে নিম্নলিখিত কথোপকথনে ব্যাপৃত করলাম:

'বলো সুন্দরী,' আমি প্রশ্ন করলাম, 'আজ ছাতের ওপর কী করছিলে?' 'দেখছিলাম বাতাস বয় কোথা থেকে।' 'কেন?' 'বাতাস যেখান থেকে বয়, আনন্দও আসে সেখান থেকে।' 'তাই নাকি, আনন্দকে আমন্ত্রণ করছিলে গান গেয়ে?' 'যেখানে গান সেখানেই সৌভাগ্য।' 'ধর, গান গেয়ে যদি তুমি দুঃখ পাও?' 'তাতে কি? সময় ভালো না হলে খারাপ হবে, আর তা ছাড়া ভালো থেকে মন্দ খুব দূর নয়।' 'ও-গানটা কে তোমাকে শিখিয়েছে?' 'কেউ শেখায় নি। মনে যা আসে তা-ই গাই; যার জন্যে গাই সে শুনতে পাবে, আর যার এই গান শুনতে পাওয়া দরকার নেই সে বুঝবে না।' 'নাম কী তোমার, কোকিল-কণ্ঠী?' 'যে আমার নাম দিয়েছে সে-ই জানে।' 'কে তোমার নাম দিয়েছে?' 'আমি কী করে জানব?' 'তুমি ভারি চাপা! কিন্তু তোমার কিছু-কিছু খবর আমি পেয়েছি' (তার মুখের ভাব বদলাল না, এমন কি কাঁপল না তার ঠোঁট, যেন তাতে তার কিছু যায়-আসে না)। 'আমি জানি, গতকাল রাতে সমুদ্র-তীরে তুমি নেমেছিলে।' ভারিক্কি চাল দেখিয়ে যা দেখেছি সবকিছু আমি বললাম, ভেবেছিলাম ঘাবড়ে যাবে; কিন্তু

বৃথাই! সে শুধু হাসিতে ফেটে পড়ল। 'অনেক কিছু দেখেছ তুমি, কিন্তু জান সামান্যই; আর যেটুকু জান কুলুপ এঁটে বন্ধ করে রাখাই ভালো।' 'ধর, কম্যান্ডাণ্টকে সে-কথা যদি আমি জানাই?' আমি অত্যন্ত গম্ভীর, এমন কি কঠোর মুখের ভাব করলাম। অকস্মাৎ সে লাফ দিয়ে দৌড়ে চলে গিয়ে গান ধরল, পালাল ঝোপ থেকে ভয়-পাওয়া পাখি যেমন উড়ে অদৃশ্য হয়। আমার শেষোক্ত কথা একেবারেই ছিল অবান্তর, যদিও তখন তার সম্পূর্ণ মর্ম আমি অনুমানও করতে পারি নি — সে-কথা বলেছিলাম বলে পরে আমায় আক্ষেপ করতে হয়েছিল।

অন্ধকার হতে শুরু করেছে। আমার কসাক-ভৃত্যকে বললাম কেটলিটা চাপাতে, জ্বালালাম একটা মোমবাতি, আর টেবিলটার পাশে বসে ভ্রমণের সঙ্গী পাইপটা টানতে লাগলাম। ইতিমধ্যেই যখন দ্বিতীয় গেলাস চা শেষ করতে চলেছি এমন সময় দরজাটা হঠাৎ শব্দ করে উঠল, আর আমার পেছনে শুনতে পেলাম পোশাকের মৃদু খস-খস আর হালকা পায়ের শব্দ। চমকে আমি ঘুরে তাকালাম: সেই মেয়েটি, আমার উণ্ডিনা! একটি কথাও না বলে আমার মুখোমুখি সে বসল, আর কী এক অজ্ঞাত কারণে জানি না। মনে হল মিষ্টি কোমল চোখে চাইল সে আমার দিকে। অনেক বছর আগে যে চোখ আমার জীবনকে অমন যথেচ্ছাচারীভাবে শাসন করেছিল এই চোখ তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। মনে হল মেয়েটি রয়েছে আমার কথা বলার অপেক্ষায়; কিন্তু সবকিছু এমন গুলিয়ে গিয়েছিল যে একটি কথাও আমি বলতে পারলাম না। মড়ার মতো ফ্যাকাশে মুখ থেকে তার মানসিক আলোড়নের কথা জানা যায়। উদ্দেশ্যহীনভাবে তার হাত টেবিলের উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। লক্ষ্য করলাম সেটা একটু কাঁপছে। তার বক্ষদেশ ফুলে উঠেছে, কখনও মনে হল নিশ্বাস রুদ্ধ করে রয়েছে সে। কৌতুক-নাট্যটি বিস্বাদ হয়ে আসায় অত্যন্ত গদ্যময়ভাবে আমি তার উপসংহার টানতে উদ্যত হলাম, অর্থাৎ তাকে এক গেলাস চা-পানের প্রস্তাব করে। ঠিক তখনি সে লাফিয়ে উঠে, তার হাত দিয়ে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে আমার ঠোঁটের উপর ভিজে আর জ্বলন্ত চুম্বন এঁকে দিল। আমার চোখে সবকিছু অন্ধকার হয়ে এলো, ঘুরতে লাগল মাথাটা, আর আমার যৌবনের সমস্ত কামনা দিয়ে তাকে আমি করলাম আলিঙ্গন। কিন্তু আমার আলিঙ্গন থেকে সে সাপের মতো পিছলে গেল। কানের কাছে সে ফিসফিস করে উঠল, 'সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর সমুদ্রের ধারে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

তারপর তীরবেগে ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। যাবার পথে চায়ের কেটলি আর মেঝের উপর দাঁড়-করানো মোমবাতিটাকে দিল সে উল্টে। 'শয়তানী!' বলে আমার কসাক-ভৃত্য চেঁচিয়ে উঠল। এক খড়ের গাদায় আরাম করে সে শুয়েছিল, আর যে-চা আমি পান করি নি তাই দিয়ে নিজেকে সে গরম করে নেবে বলে মনস্থ করেছিল। চমকে আমি সংবিৎ ফিরে পেলাম।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে, নৌকো-থামার জায়গাটা যখন নিস্তব্ধ, আমার কসাক-ভৃত্যকে তখন জাগালাম। তাকে বললাম, 'যদি পিস্তলের শব্দ শোন তা হলে দৌড়ে নেমে এসো সমুদ্র-তীরে।' সে চোখ বড়-বড় করে তাকাল এবং যন্ত্রচালিতের মতো বলল, 'তাই হবে, কর্তা।' আমার কোমরবন্ধে একটা পিস্তল গুঁজে বেরিয়ে পড়লাম। ঢালু জায়গাটার মাথায় মেয়েটি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আবরণ তার খুব পাতলা, তার ছিপছিপে দেহের উপর ছোট্ট একটি শাল জড়ানো।

'আসুন আমার পেছন-পেছন,' বলে আমার হাত সে ধরল আর আমরা বাঁধের নীচে নামতে শুরু করলাম। জানি না আমার মাথাটা ভাঙে নি কেন। নীচে নেমে আমরা ডানদিকে ঘুরলাম আর গতকাল রাত্রে অন্ধ ছেলেটাকে অনুসরণ করার জন্য যে-পথে গিয়েছিলাম সেই পথে চললাম। তখনও চাঁদ ওঠে নি, কেবলমাত্র প্রাণরক্ষাকারী আলোকস্তম্ভের মতো দুটি তারা গাঢ় নীল আকাশের গায়ে জ্বলছে। নিয়মিত সময় ছাড়া-ছাড়া ভারি ঢেউগুলো একের পর এক আসছে, তীরের কাছে নোঙর-ফেলা একটিমাত্র যে-নৌকোটি রয়েছে তাকে প্রায় দোলাচ্ছেই না। আমার সঙ্গিনী বলল, 'চল, নৌকোটায় ওঠা যাক।' আমি দ্বিধা করলাম, কারণ ভাবপ্রবণ সমুদ্র-ভ্রমণে যাবার কোন রকম অভিরুচি আমার নেই। কিন্তু তখন আর পিছ-পা হবার সময় নয়। মেয়েটি লাফিয়ে নৌকোয় উঠল, আমিও অনুসরণ করলাম, আর আমি কিছু বোঝবার আগেই আমাদের যাত্রা শুরু হল। এবার আমি রেগে প্রশ্ন করলাম, 'এটার মানে কী?' আমাকে ঠেলে একটা আসনে বসিয়ে আর তার বাহু দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল, 'এর মানে হল তোমায় আমি ভালোবাসি...।' তার গাল আমার গালের উপর সে চেপে ধরল, আর তার তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখের উপর অনুভব করতে লাগলাম। অকস্মাৎ জলে যেন কী একটা জিনিস ঝপাং করে পড়ল। কোমরবন্ধে হাত দিতে গেলাম, কিন্তু আমার পিস্তলটা উধাও হয়েছে। এখন আমার মনে

এক সাঙ্ঘাতিক সন্দেহ হতে লাগল, রক্ত ছুটতে লাগল মাথায়। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম যে তীর থেকে আমরা ইতিমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ সাজেন সরে এসেছি। এদিকে আমি সাঁতার কাটতেও জানি না! তাকে আমি ঠেলে সরিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু বেড়ালের মতো আমার জামা-কাপড় সে আঁকড়ে রইল। হঠাৎ এমন জোরে এক ঠেলা দিল যাতে আর একটু হলেই নৌকো থেকে আমি পড়ে যেতাম। দুলতে লাগল নৌকোটা; কিন্তু ভারসাম্য আমি ফিরে পেলাম। তারপর আমাদের মধ্যে এক মরিয়ার মতো ধস্তাধস্তি শুরু হল। রাগে আমার জোর বেড়ে উঠল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমার চেয়ে বেশী চটপটে...। তার ছোট্ট হাতদুটো শক্ত করে ধরে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'কী চাও তুমি?' শুনতে পেলাম তার আঙুলগুলো মড়মড় করে উঠছে, কিন্তু সে আর্তনাদ করে উঠল না: সাপের মতো তার প্রকৃতি এই যন্ত্রণা সহ্য করল।

উত্তরে সে বলল, 'কী ঘটেছে তা ত দেখেছ। তুমি ত আমাদের নামে লাগাবে।' অমানুষিক শক্তিতে আমাকে সে নৌকোর পাটাতনের উপর ফেলে চেপে ধরল যতক্ষণ না আমরা দু'জনেই কোমর পর্যন্ত জলের উপর ঝুলে রইলাম — তার চুলগুলো ডুবল জলের মধ্যে। তখন চরম মুহূর্ত উপস্থিত। নৌকোর তলাটা হাঁটু দিয়ে শক্ত করে ধরে এক হাতে তার বিনুনি অন্য হাতে তার গলাটা চেপে ধরলাম। আমার জামা-কাপড়ের উপর তার মুঠি আলগা হয়ে গেল আর চক্ষের নিমেষে তাকে আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম।

ইতিমধ্যেই তখন যথেষ্ট অন্ধকার হয়ে গেছে। বার দুই তার মাথাটা ফেনার উপর ভেসে উঠতে দেখার পর সে সম্পূর্ণভাবে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল...

নৌকোর তলায় আমি একটা পুরনো দাঁড়ের টুকরো খুঁজে পেলাম এবং অতি কষ্টে কোন রকমে তীরে পৌঁছলাম। তীর ধরে কুটিরে ফেরার পথে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি পড়ল, যেখানে গতকাল রাত্রে অন্ধ ছেলেটা সেই নৈশ নাবিকের জন্য অপেক্ষা করেছিল। চাঁদ উঠে আসছিল আর তার আলোয় আমার মনে হল দেখতে পেলাম সাদা পোশাক-পরা একটি মূর্তিকে উপকূলে বসে থাকতে। কৌতূহলী হয়ে গুড়ি মেরে তার দিকে এগুলাম এবং উপকূল-থেকে-ওঠা উঁচু একটা জায়গায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম। নীচে যা-কিছু ঘটছে মাথাটা সামান্য তুলে সবকিছু আমি দেখতে পেলাম। আমার সেই জল-কুমারীকে সেখানে দেখে আমি খুব বিস্মিত হলাম না,

প্রায় খুশিই হলাম। তার দীর্ঘ চুল নিংড়ে সে সমুদ্রের জল বার করছিল। ভিজে জামা-কাপড়ের ভিতর থেকে তার সুঠাম গড়ন এবং সুউচ্চ বক্ষদেশের রেখা আমি দেখতে পেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই দূরে একটি নৌকো দেখা গেল, দ্রুত সেটা তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। গত রাত্রের মতো সেই নৌকো থেকে তাতার টুপি-পরা একটি লোক বেরিয়ে এলো, যদিও তার মাথাটা কসাকদের কায়দায় ছাঁটা। বড় একটা ছোরা তার কোমরবন্ধে গোঁজা। মেয়েটি বলল, 'ইয়াঙ্কো, সর্বনাশ হয়েছে!' তারা কথা বলতে লাগল, কিন্তু এত নীচু গলায় যে আমি শুনতে পেলাম না। অবশেষে জোর গলায় ইয়াঙ্কো প্রশ্ন করল, 'আর কানাটা কোথায়?' উত্তর এলো, 'তাকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।' কয়েক মিনিট পরে পিঠে একটা ঝোলা নিয়ে অন্ধ ছেলেটা হাজির হল। ঝোলাটা রাখা হল নৌকোয়।

ইয়াঙ্কো বলল, 'এই কানা ছোঁড়া, শোন্। জায়গাটার ওপর নজর রাখিস... বুঝলি কী বললাম? সেখানে অনেক দামী-দামী জিনিস আছে... আর... বলিস (নামটা আমি শুনতে পেলাম না) যে আমি আর তার চাকর নই। নানা গণ্ডগোল হয়ে গেছে, তাই সে আর আমার দেখা পাবে না। এ-ভাবে চলা বিপজ্জনক। অন্য জায়গায় কাজ খুঁজতে যাচ্ছি আমি। আমার মতো বেপরোয়া লোক সে আর খুঁজে পাবে না। আর তাকে বলিস আরও দরাজ হাতে টাকা দিলে ইয়াঙ্কোও তাকে ছেড়ে যেত না। যেখানেই বাতাস বয় আর সমুদ্র গর্জন করে সেখানেই আমি সব সময় কাজ খুঁজে পাব।' খানিক থেমে ইয়াঙ্কো আবার বলে চলল, 'মেয়েটিকে আমি নিয়ে চললাম, কারণ এখানে আর সে থাকতে পারবে না। আর বুড়িটাকে বলিস যে তার মরবার সময় হয়ে গেছে। বহুকাল সে বেঁচেছে। তার জানা উচিত কখন তার সময় পেরিয়ে গেছে। আমাদের দেখা আর সে কখনও পাবে না।'

'আমার কী হবে?' অন্ধ ছেলেটা করুণ কণ্ঠে বলে উঠল।

'তোকে নিয়ে আমি কী করব?' উত্তর এলো।

ইতিমধ্যেই আমার জল-কুমারী লাফিয়ে নৌকোয় উঠে হাতছানি দিল তার সঙ্গীকে। অন্ধ ছেলেটার হাতে কী একটা গুঁজে দিয়ে ইয়াঙ্কো বিড়বিড় করে বলল, 'এই নে, তোর জন্যে কিছু আদার কেক কিনিস।' 'ব্যস্, শুধু এই?' অন্ধ ছেলেটা প্রশ্ন করল। 'আচ্ছা, আচ্ছা, এটাও নে।' পাথরের উপর পড়ে মুদ্রাটা ঠং করে উঠল। অন্ধ ছেলেটা সেটা তুলল না। ইয়াঙ্কো নৌকোয় চড়ল। সমুদ্রের দিকে বাতাস বইছিল বলে তারা ছোট্ট একটা পাল

খাটিয়ে তাড়াতাড়ি দূরে চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে জ্যোৎস্নায় কালো ঢেউয়ের মধ্যে সাদা পালটা দেখা গেল। অন্ধ ছেলেটা বসে রইল উপকূলে; আমি একটা শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হল সেটা ফুঁপিয়ে কান্নার: অন্ধ ছেলেটা কাঁদছে, অনেক অনেকক্ষণ ধরে সে কেঁদে চলল...। আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। কেন ভাগ্য আমাকে এই সৎ চোরা-কারবারীদের শান্তিময় জীবনের মধ্যে এনে ফেলল? তাদের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়েছি আমি, শান্ত জলধারার ওপর যেন পাথর ছুঁড়েছি আর পাথরটার মতোই আর একটু হলে আমিও তলিয়ে যেতাম।

আমার ঘরে ফিরে এলাম। বারান্দায় কাঠের পাত্রের উপর মোমবাতিটা শেষবারের মতো দপদপ করছে আর এদিকে আমার কসাক-ভৃত্য আদেশ সত্ত্বেও দু'হাতে একটা বন্দুক চেপে ধরে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তাকে আমি বিরক্ত করলাম না। মোমবাতিটা তুলে নিয়ে ঘরে গেলাম। কিন্তু হায়, আমার বাক্স আর রুপোর কাজ-করা তরোয়াল, দাগেস্তানী ছোরা — যেটাকে এক বন্ধুর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলাম — সব অদৃশ্য হয়েছে। এখন বুঝতে পারলাম হতভাগা অন্ধ ছেলেটা কী জিনিস নিয়ে গিয়েছিল। কসাক-ভৃত্যকে বিনা আড়ম্বরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে গালাগালি করলাম, উঠলাম রেগে। কিন্তু এ-বিষয়ে তখন আর কিছুই করার ছিল না! আর আমার উপরিওলার কাছে এই বলে অভিযোগ করা কি হাস্যকর নয় যে এক অন্ধ ছেলে আমার জিনিসপত্র চুরি করেছে আর এক আঠারো বছরের মেয়ে আর একটু হলেই আমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পরের দিন সকালেই চলে যাবার সুযোগ মিলে গেল। আমি তামান ত্যাগ করলাম। পরে সেই বুড়ির আর বেচারা অন্ধ ছেলেটার কী হয়েছিল জানি না। আর তা ছাড়া, মানুষের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে আমার মতো এক ভ্রাম্যমাণ অফিসারের, অধিকন্তু যাকে সরকারী কাজে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, তার সম্পর্কটাই বা কী?..

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

পেচোরিনের ডায়েরির শেষাংশ

২

রাজকুমারী মেরি

১১ই মে

গতকাল পিয়াতিগোর্স্ক-এ পৌঁছেছি*) শহরতলিতে মাশুক-এর পাদদেশে*) আমি বাড়ি ভাড়া করেছি। শহরের মধ্যে এইটাই সবচেয়ে উঁচু জায়গা, এত উঁচু যে ঝড়বৃষ্টির সময় মেঘগুলো আমার ছাতে এসে নামবে। আজ সকাল পাঁচটায় যখন জানালা খুললাম আমার বাড়ির সামনেকার ছোটো বাগানের ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। চেরি গাছের ফুলে ভরা ডালগুলো আমার জানালায় উঁকি দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে বাতাস সাদা পাপ্‌ড়িগুলো আমার লেখার টেবিলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিন দিককার চমৎকার দৃশ্য আমি দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমে পাঁচ-চুড়ো নীল বেশ্‌তুকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে*) 'অন্তর্হিত ঝঞ্ঝার শেষ মেঘটির'*) মতো; উত্তরের দিগন্তকে ঢেকে মাশুক মাথা তুলেছে যেন পারস্যের লোমশ টুপি। পুব দিকের দৃশ্য আরও মনোরম: আমার সামনে পরিষ্কার নতুন শহরটি নানা বিচিত্র রঙে নীচে ছড়িয়ে রয়েছে, স্বাস্থ্যকর প্রস্রবণগুলো*) কলকল শব্দ করছে, আর সেই রকমই কলকল করছে নানা-ভাষী জনতা, আরও দূরে পাহাড়ের ক্রমশ উঁচু-হয়ে-যাওয়া সারি নীল থেকে আরও নীল এবং আবছা থেকে আরও আবছা হয়ে গেছে, এদিকে দিগন্তের কিনারে তুষারমণ্ডিত চুড়োগুলোর রুপোলী মালা ছড়িয়ে রয়েছে — কাজ্‌বেক দিয়ে হয়েছে শুরু আর দু'চুড়ো এল্‌ব্রুস দিয়ে হয়েছে শেষ...।*) এ-রকম দেশে বাস করা বাস্তবিক আনন্দের! এক আনন্দের অনুভূতি আমার শিরায় শিরায় হচ্ছে প্রবাহিত। শিশুর চুম্বনের মতো নির্মল আর তাজা বাতাস, সূর্য উজ্জ্বল, আকাশ নীল — এর চেয়ে আর বেশী কে চায়? আর কেন কামনা, বাসনা, মনস্তাপ?.. কিন্তু আর নয়। এলিজাবেথ প্রস্রবণে যাব, শুনেছি সকালে সেখানে খনিজ-জলপ্রেমী সমাজের সমাবেশ ঘটে।

. . . .

শহরের মধ্যে বুল্‌ভার ধরে হাঁটবার সময় দেখলাম কয়েকটি নিরানন্দ দল ধীরে-ধীরে পাহাড় বেয়ে উঠছে। তাদের অধিকাংশই যে সমতলভূমির জমিদারী পরিবারের, সে-কথা স্পষ্ট বোঝা যায় পুরুষদের সাবেক কালের জীর্ণ কোট আর তাদের স্ত্রী-কন্যাদের পরিপাটি বেশভূষা দেখে। স্পষ্টতই তারা খনিজ-জলের উৎসের সবক'টি বাঞ্ছনীয় যুবককে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে, কারণ আমাকে তারা সস্নেহ কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল। আমার কোটের পিটার্সবুর্গ-ছাঁট প্রথমে তাদের প্রতারণা করেছিল, কিন্তু আমার সামরিক চিহ্নগুলো দেখতে পেয়ে তারা সঙ্গে-সঙ্গে বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল।*)

স্থানীয় কর্মচারীদের স্ত্রীরা, বলতে গেলে যারা প্রস্রবণগুলোর মালিক, তারা বরং সদয় ব্যবহার করল। তারা লম্বা হাতলওলা চশমা নিয়ে ঘোরে এবং সামরিক পোশাকের ওপর কম মনোযোগ দেয়, কারণ ককেশাসে তারা আবিষ্কার করতে শিখেছে যে দস্তার বোতামের নীচে উত্তপ্ত হৃদয় আর শ্বেত অফিসারের টুপির নীচে শিক্ষিত মন থাকে।*) এই সব মহিলারা ভারি মোহিনী। আর অনেক দিন তারা মোহিনী থাকে! প্রতি বছরে তাদের স্তাবকের দল বদলায়, সেটাই হয়ত তাদের অক্লান্ত অমায়িকতার গুপ্ত তথ্য। এলিজাবেথ প্রস্রবণে যাবার সরু পথ ধরে ওঠবার সময় এক দল লোককে আমি অতিক্রম করে গেলাম। তাদের মধ্যে সামরিক এবং বেসামরিক উভয় জাতের লোকই আছে। পরে জেনেছিলাম যে তারা এক বিশেষ শ্রেণীর লোক; যারা এখানকার জলের ক্রিয়া নিজেদের উপর প্রয়োগ করতে চায়। তারা পান করে, কিন্তু জল নয়, অল্পই বাইরে আসে, এলোমেলোভাবে প্রেমাভিনয় করে; তারা জুয়া খেলে আর একঘেয়েমির জন্য করে অনুযোগ। তারা ফুলবাবু: বেতে-মোড়া কাঁচের পাত্রগুলো গন্ধক-জলে ডোবাবার সময় তাদের হাবভাব হয়ে ওঠে পণ্ডিতী ধরনের; বেসামরিক লোকেরা ফিকে-নীল টাই পরে, আর সামরিক দলের লোকেরা কলারের উপর বার করে রাখে গলবন্ধনীগুলো*)। মফঃস্বল সমাজের প্রতি তারা দারুণ অবজ্ঞার ভাব দেখায় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজধানীর সম্ভ্রান্ত পরিবারদের বৈঠকখানার কথা স্মরণ করে। সেখানে অবশ্য তাদের নিমন্ত্রণ কখনও হয় না।

অবশেষে কুয়োটার কাছে পেঁছিলাম...। কাছের একটা জায়গায় স্নানের ঘরের ওপরে লাল ছাতওলা একটি বাড়ি নির্মিত হয়েছে এবং কিছু দূরে ভ্রমণকারীদের বৃষ্টি থেকে আশ্রয় দেবার জন্য নির্মিত হয়েছে একটি

বারান্দামতো জায়গা। কয়েকজন আহত অফিসার — ফ্যাকাশে আর করুণ চেহারার লোক — তাদের ক্রাচ্‌গুলো সামনে ধরে একটি বেঞ্চিতে বসেছিল। কয়েকজন মহিলা দ্রুত পায়চারি করতে-করতে অপেক্ষা করছিলেন জলের ক্রিয়া যাতে শুরু হয়। তাদের মধ্যে ছিল দুটি কিংবা তিনটি সুন্দর মুখ। মাশুকের ঢালু অংশটাকে ঢাকা দ্রাক্ষা বীথিকার ভিতর দিয়ে মহিলাদের বিচিত্র টুপিগুলো মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। নিশ্চয়ই তাদের অধিকারিণীরা দুজনে-দুজনে মিলে নির্জনে থাকা পছন্দ করেন। কারণ ঐ ধরনের মহিলার টুপির সঙ্গে সর্বদাই দেখা যায় হয় কোনো সামরিক অফিসারের টুপি কিংবা কদাকার গোল টুপি। একটা খাড়া পাহাড়ের উপর থেকে, যেখানে এইওলিয়ান হার্প নামে*) এক তাঁবু রয়েছে, দর্শকরা এল্‌ব্রুসের উপর দূরবীক্ষণ তাক করছিল। তাদের মধ্যে ছিল দুটি ছেলে ও তাদের তত্ত্বাবধানকারী দুটি গৃহশিক্ষক। এখানে তারা এসেছে গণ্ডমালা রোগ সারাবার আশায়।

হাঁপাতে-হাঁপাতে আমি এক খাদের পাশে থেমে একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে ছবির মতো সুন্দর স্থানীয় দৃশ্য দেখছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ পিছনে শুনতে পেলাম এক পরিচিত কণ্ঠস্বর:

'পেচোরিন! অনেক দিন হল এসেছ?'

ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে। আমরা আলিঙ্গন করলাম। আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল এক সৈন্যদলে। তার পায়ে ছিল গুলির এক ক্ষত। আমার চেয়ে এক সপ্তাহ আগে সে এই খনিজ-জলের উৎসের জায়গায় এসেছিল।

গ্রুশ্‌নিৎস্কি য়ুঙ্কার।*) শুধু এক বছর সে সৈন্যদলে চাকরি করেছিল। সৈনিকদের পুরু গ্রেটকোট সে পরে। এটা হল তার বিশেষ ধরনের একটা বাবুগিরি। তার আছে সৈনিকের 'সেণ্ট জর্জ ক্রস'*)। সুন্দর তার শরীরের গড়ন, তার চেহারা রোদে-পোড়া আর চুলগুলো কালো। দেখলে পঁচিশ বলে মনে হবে, যদিও একুশ বছরও পূর্ণ হয় নি। কথা বলার সময় পিছন দিকে মাথাটা হেলাবার তার এক বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে। ক্রমাগতই বাঁ হাত দিয়ে তার গোঁফটা সে পাকায়, কারণ ডান হাতটাকে ক্রাচের উপর ভর দিয়ে থাকতে হয়। চপল ও সালঙ্কার তার বাচনভঙ্গী। সে সেই-দলের, যে-কোন অবস্থার উপযুক্ত গাল-ভরা কথা যাদের ঠোঁটের ডগায় লেগে থাকে, সাধারণ সৌন্দর্যে যারা থাকে অবিচলিত এবং যারা সাড়ম্বরে অসাধারণ ভাবাবেগ,

স্বগীয় প্রেম এবং তীব্র বেদনার মুখোস পরে। নিজেদের তারা জাহির করে আনন্দ পায়, আর ভাবালু মফঃস্বলের মহিলারা তাদের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বার্ধক্যে তারা হয় শান্তিপ্রিয় জমিদার বা মাতাল হয়ে বসে — সময় সময় দুই-ই। প্রায়ই তাদের মনে নানা সদ্‌গুণ থাকে, কিন্তু কাব্য কণামাত্র থাকে না। গ্রুশ্‌নিৎস্কি আবৃত্তি করতে ভালোবাসত; কথোপকথন প্রচলিত ধারণার সীমা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষিত হত তার কথার স্রোত। তার সঙ্গে কখনও আমি তর্ক করে পারি নি। কখনই সে প্রতিবাদীর প্রত্যুত্তরের উত্তর দিত না, বা তার কথা শুনত না। আপনার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে সে দীর্ঘ এক বক্তৃতা ফেঁদে বসে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আপনি যা বলেছেন তার সঙ্গে তার বক্তৃতার সম্বন্ধ আছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সেটা শুধু তার নিজস্ব ভাষণের ধারানুসরণ।

মোটামুটি সে রসিক এবং তার রসাল কথাগুলো প্রায়শই মজাদার, কিন্তু কখনই তাদের মধ্যে খোঁচা বা বিদ্বেষ থাকে না; এক কথায় কাউকেই সে নস্যাৎ করে দেয় না। মানুষকে সে চেনে না, তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিকেও না, কারণ সারা জীবন শুধু নিজেকে নিয়েই সে ব্যস্ত থেকেছে। তার জীবনের উদ্দেশ্য হল উপন্যাসের নায়ক হওয়া। এতবার অন্যদের সে বোঝাতে চেয়েছে যে সে ইহজগতের প্রাণী নয় এবং তার ফলে তাকে নানা ধরনের অজ্ঞাত দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে যে তার নিজেরই সে-বিষয়ে প্রায় সন্দেহ নেই। সে কারণেই সে তার সৈনিকদের পুরু গ্রেটকোটটা সগর্বে পরে। তাকে আমি বুঝতে পারি, আর সে কারণে সে আমাকে অপছন্দ করে, যদিও বাহ্যত আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ গাঢ় বন্ধুত্বের। গ্রুশ্‌নিৎস্কির অসাধারণ সাহসের জন্য সুনাম আছে; লড়াইতে তাকে আমি দেখেছি: তরোয়াল ঘুরিয়ে চিৎকার করতে-করতে ছোটে সে চোখ বুজে। এটা ঠিক রুশীসুলভ বীরত্ব নয়...

আমিও তাকে পছন্দ করি না এবং আমার ধারণা একদিন না একদিন আমাদের মধ্যে দারুণ বিবাদ হয়ে যাবে, যার ফলাফলটা আমাদের মধ্যে কোন একজনের পক্ষে হবে অনুশোচনার কারণ।

ককেশাসে তার আসবার কারণও হল ভাবালু উন্মত্ততা। আমি নিশ্চিত যে সে তার পিতৃপুরুষের গ্রাম ছাড়বার সময় কোন সুদর্শনা প্রতিবেশিনীর কাছে বিষাদময় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল যে সে চলে যাচ্ছে কেবলমাত্র



লেরমন্তভ — ৩-৪ বছর বয়সে। তৈলচিত্র। অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা। ১৮১৭-১৮১৮ সাল



কবির জননী মারিয়া মিখাইলভনা লেরমন্তভা। লেরমন্তভের ২ বছর ৬ মাস বয়সের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। তেলরঙে আঁকা প্রতিকৃতি। জনৈক ভূমিদাস-শিল্পীর রচনা



কবির পিতা ইউরি পেত্রোভিচ লেরমন্তভ। তেলরঙে আঁকা প্রতিকৃতি। জনৈক ভূমিদাস-শিল্পীর রচনা



লেরমন্তভের মাতামহী এলিজাভেতা আলেক্সেয়েভনা আর্সেনিয়েভা (বিবাহপূর্ব পদবী স্তোলিপিনা)। জননীর মৃত্যুর পর তিনিই লেরমন্তভকে মানুষ করেন। তৈলচিত্র। অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা



বালক লেরমন্তভ। অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি। তেলরঙ। ১৮২০-১৮২২ সাল



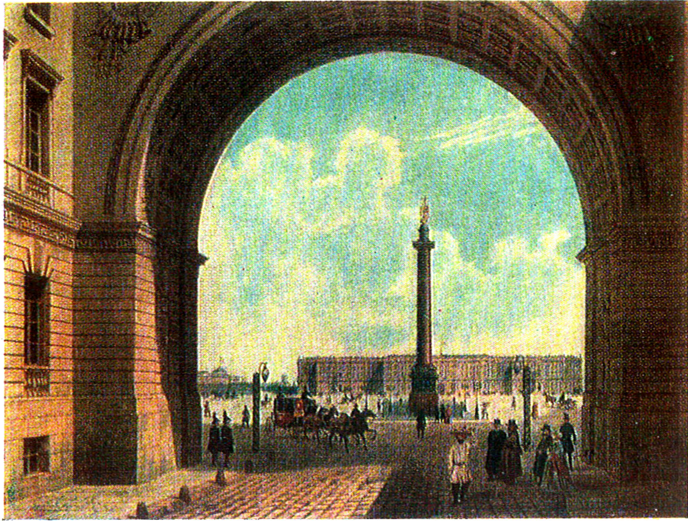
মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭৮৬-১৭৯৮ সালে নির্মাণ করেন রুশ স্থপতি কাজাকভ। ১৮১২ সালে মস্কোয় অগ্নিকাণ্ডের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন জিলিয়ার্দি। জলরঙ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা



আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন। শিল্পী ওরেস্ত্‌ কিপ্রেন্‌স্কির আঁকা ছবি, ১৮২৭ সাল। পিস্তলের গুলিতে পুশ্‌কিন নিহত হলে লেরমন্তভের চিত্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। ১৮৩৭ সালের ২৯ জানুয়ারী সন্ধ্যে তিনি লিখলেন 'কবির মৃত্যু' নামে একটি কবিতা। লেরমন্তভ মহান কবির উত্তরাধিকারী রূপে সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করলেন



লেরমন্তভ। ১৮৩৯। জলরঙা প্রতিকৃতিটির রচয়িতা লেরমন্তভের সতীর্থ-কর্মচারী ক্লুন্দের। সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ



সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ। সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের খিলান। পুশ্‌কিনের মৃত্যুর উপর কবিতা লেখার জন্য এই দালানে, ওপরের তলার একটি ঘরে কড়া নজরে অন্তরণ করে রাখা হয় লেরমন্তভকে। যে কাগজে মুড়ে কবির জন্য রুটি আনা হয় তারই উপর মদ, চুল্লির কালি আর দেশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে তিনি 'যখন উত্তাল হয় পীতবর্ণ শস্যের খেত', 'কয়েদী' ইত্যাদি কবিতা লেখেন। লিথোগ্রাফি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল



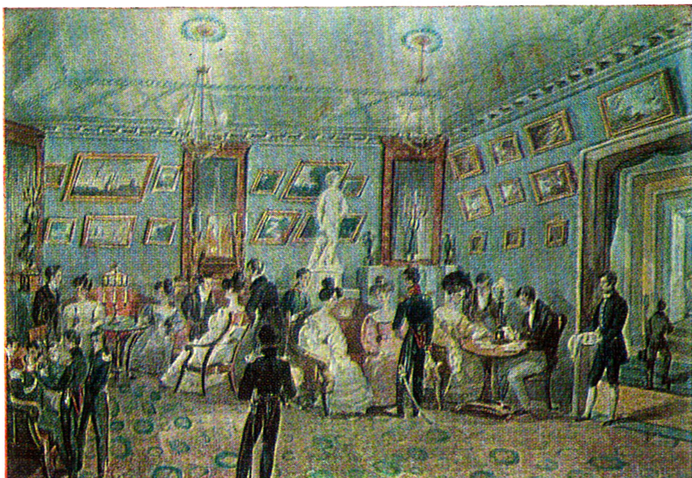
হুসার রেজিমেণ্টের রাজকীয় রক্ষীর পূর্ণ সামরিক সজ্জায় লেরমন্তভ। ১৮৩৭ সালে জারের আদেশে লেরমন্তভ ককেশাসে নির্বাসিত হওয়ার পর মাতামহীর ফরমাস অনুযায়ী প্রতিকৃতিটি অংকন করেন কবির অংকনবিদ্যার শিক্ষক জাবোলোৎস্কি। পিচবোর্ড। তৈলচিত্র



১৮২৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের সিনেট স্কোয়ারে অভ্যুত্থান জার প্রথম নিকোলাই কর্তৃক নৃশংসভাবে অবদমিত হয় — পাঁচজন ডিসেম্ব্রিস্ট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, ১২০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে সশ্রম কারাদণ্ড ও নির্বাসনদণ্ড ভোগের জন্য সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়। আলেক্সান্দর ওদোয়েভ্স্কি এবং অন্যান্য ডিসেম্ব্রিস্টদের সঙ্গে লেরমন্তভ পরবর্তীকালে পরিচিত হন, ককেশাসে তিনি তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। শিল্পী ক. কোল্মান। জলরঙ। ঊনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশক



হুসার রেজিমেন্টের রাজকীয় রক্ষিদলের পোশাকে লেরমন্তভ। প্রতিকৃতি আ. চেলিশেভ। ক্যানভাস। তেলরঙ



সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের একটি অভিজাতগৃহে উচ্চবর্গের সমাজের সন্ধ্যানুষ্ঠান।
অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা জলরঙা ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল



পিয়াতিগোর্স্কের বুলভার। 'আমাদের সময়কার নায়ক'-এ এর বর্ণনা আছে।
ইভানোভের আঁকা, জলরঙ। ১৮৩৯ সাল



লেরমন্তভ। ১৮৪০ সালের জুলাই। প্রকৃতি থেকে আঁকা। শিল্পী দ. পালেন



দারিয়াল গিরিসংকট। তামারাদুর্গ। লেরমন্তভ ছবিটি অংকন করেন প্রকৃতি থেকে। ১৮৩৭ সাল



ককেশাসের প্রাকৃতিক দৃশ্য (ঘাট)। লেরমন্তভের আঁকা। ক্যানভাস। তেলরঙ। ১৮৩৭ সাল



দাগেস্তানের পাহাড়ে গুলিবিনিময়। দ্বিতীয়বার ককেশাসে নির্বাসিত হওয়ার সময় লেরমন্তভ এই ছবিটি অংকন করেন। সেখানে একাধিকবার পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘর্ষে তাঁকেও যোগ দিতে হয়। ক্যানভাস। তেলরঙ



তেন্‌গিন রেজিমেণ্টের ফৌজী ফ্রক-কোটে লের্মন্তভ। ১৮৪১ সাল। কবির জীবদ্দশায় আঁকা তাঁর শেষ প্রতিকৃতি। শিল্পী ক. গর্বুনভ। জলরঙ

সামরিক বিভাগে চাকরি করার জন্য নয়, সে যাচ্ছে মৃত্যুকে বরণ করতে, কারণ... এইখানটায় সম্ভবত হাত দিয়ে তার চোখদুটো ঢেকে এই ভাবে সে বলেছিল, 'না, কারণটা আপনাকে (বা তোমাকে) কখনও জানাব না। আপনার নির্মল হৃদয় তা হলে সে-কথায় শিউরে উঠবে! আর জানতে আপনাকে হবেই বা কেন? আপনার কাছে আমি কে? আমাকে কি আপনি বুঝতে পারেন?..' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সে নিজেই আমাকে বলেছিল যে তার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার কারণ তার এবং তার বিধাতার কাছে চিরকাল গুপ্তই থাকবে।

আর তবুও, গ্রুশ্‌নিৎস্কি যখন এই বিষাদময় খোলস ত্যাগ করে, তখন সে বাস্তবিকই হতে পারে মনোহর ও মজাদার। তাকে আমি মহিলাদের সান্নিধ্যে দেখতে ভালোবাসি, কারণ তখনই, আমার মনে হয়, সে দেখাতে চেষ্টা করে যে সে কতটা ভালো!

পুরনো বন্ধুর মতো আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করলাম। তাকে আমি ক্রমাগত প্রশ্ন করে চললাম খনিজ-প্রস্রবণের জীবন-ধারা এবং সেখানে কোন সব চিত্তাকর্ষক লোকদের সঙ্গে আলাপ করা যায় — সে সম্বন্ধে।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এখানকার জীবন গদ্যময়। সকালে যারা জল পান করে সব রোগীদের মতোই তারাও নিস্তেজ, আর সন্ধেয় যারা মদ্যপান করে সব সুস্থ লোকদের মতো তাদের সঙ্গও অসহ্য। মহিলাদের সাহচর্যও আছে, কিন্তু তা থেকে সামান্যই সান্ত্বনা মেলে; তারা হুইস্ট খেলে, সাজগোজ করে বাজে, আর জঘন্য ফরাসী বলে। এ-বছর মস্কো থেকে কেবল এসেছেন রানী লিগোভ্‌স্কায়া আর তাঁর মেয়ে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। আমার ফৌজী গ্রেটকোটটা যেন নির্বাসনের নিশান। সেটা দেখে লোকের মনে যে-সমবেদনা জাগে দয়া-দাক্ষিণ্যের মতোই তা অসহ্য।'

ঠিক তখনি দুটি মহিলা আমাদের পাশ দিয়ে কুয়োর দিকে চলে গেলেন, একজন বয়স্কা, অন্য জন তরুণী। ছিপছিপে তার গড়ন। বনেট-এর দরুন তাঁদের মুখ আমি দেখতে পেলাম না, কিন্তু তাঁদের সাজসজ্জা নিখুঁত ও সুরুচির পরিচায়ক: সবকিছুই ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমন। তরুণীটি পরেছে মুক্তা-ধূসর-রঙের উঁচু-গলাওলা জামা; তার নমনীয় গলা ঘিরে রয়েছে সিল্কের পাতলা এক রুমাল। গাঢ় তামাটে

রঙের এক জোড়া জুতো এমন সুন্দরভাবে তার গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে রয়েছে যে, যে-লোকের কোনো রকম সৌন্দর্যবোধ নেই তারও বিস্ময়ে শ্বাসরোধ হয়ে আসবে। তার লঘু অথচ মর্যাদাব্যঞ্জক হাঁটার ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে এমন এক কুমারীসুলভ ভাব যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অথচ চোখে স্পষ্ট। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার কাছ থেকে এমন এক মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল যা মাঝে মাঝে আমাদের প্রেমিকাদের চিঠি থেকে নিঃসৃত হয়।

'ও-ই রানী লিগোভ্স্কায়া আর তাঁর মেয়ে,' বলল গ্রুশ্নিৎস্কি। 'মেয়েকে ইংরেজদের মতো তিনি ডাকেন মেরি বলে। মাত্র তিন দিন হল ওঁরা এখানে এসেছেন।'

'ইতিমধ্যেই মেয়েটির নাম পর্যন্ত জেনে ফেলেছ দেখছি।'

'দৈবক্রমে শুনেছি,' আরক্ত হয়ে সে বলল। 'ওদের সঙ্গে আলাপ করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। এই ধরনের উদ্ধত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের মতো সামরিক লোকদের বর্বর বলে মনে করে। নম্বর-দেওয়া টুপির নীচে যদি মেধা আর পুরু গ্রেটকোটের নীচে যদি হৃদয় বলে কোনো বস্তু থাকে তাতে তাদের কী আসে যায়?'

হেসে বললাম, 'বেচারা গ্রেটকোট! আর ওই ভদ্রলোকটি কে যিনি ও-রকম বিনীতভাবে ওঁদের গেলাস এগিয়ে দিচ্ছেন?'

'ও হল মস্কোর ফুলবাবু রায়েভিচ! ও যে জুয়াড়ী সে-কথা ওর নীল ওয়েস্ট-কোটের ওপরকার সোনার ভারি চেনটা দেখলেই বুঝতে পারবে। আর ওর মোটা বেতটা দেখ — ঠিক যেন রবিনসন ক্রুসোর*) কিম্বা দেখ ওর দাড়ির বাহার আর চুলের à la moujik* ছাঁট।'

'মনে হচ্ছে মানুষ জাতটার ওপরেই তোমার রাগ।'

'রাগ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে...'

'সত্যি?'

ইতিমধ্যে মহিলারা কুয়োর পাড় ছেড়ে আবার আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। তাড়াতাড়ি গ্রুশ্নিৎস্কি তার ক্রাচ্ নিয়ে এক নাটকীয় ঢং-এ দাঁড়াল এবং গলা চড়িয়ে ফরাসীতে বলল:

---

* চাষাড়ে (ফরাসী ভাষায়)।

'Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoutante.'*

সুন্দরী রাজকুমারী ঘুরে বক্তার দিকে অনেকক্ষণ কৌতূহলী চোখে তাকালেন, দুর্বোধ্য সেই দৃষ্টি, কিন্তু তার মধ্যে বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নেই। তাই দেখে মনে-মনে আন্তরিকভাবে আমার বন্ধুকে তারিফ করলাম।

আমি তাকে বললাম, 'রাজকুমারী মেরি বাস্তবিক সুন্দরী। তার চোখগুলো মখমলের মতো, হ্যাঁ, মখমলেরই মতো। ওর চোখের বিষয়ে কথা বলার সময় এই কথাটা ব্যবহার করতে তোমায় পরামর্শ দেব। ওর চোখের পাতাগুলো, ওপর নীচ দু-ই, এত দীর্ঘ যে সূর্যের রশ্মি চোখের তারায় মুকুরিত হয় না। ও-ধরনের চোখ আমি পছন্দ করি — একটুও জ্বলজ্বলে নয়, আর এত কোমল যে মনে হয় যেন আদর করছে...। ভালো কথা, আমার মনে হয় ওর মুখের মধ্যে কেবল চোখ দুটিই ভালো...। ওর দাঁতগুলো কি সাদা? এটা জানা ভারি দরকার! তোমার বাগাড়ম্বরে ওর না-হাসাটা দুঃখের কথা।'

বিরক্ত হয়ে গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলল, 'এক সুন্দরী মহিলা সম্বন্ধে এমন ভাবে তুমি কথা বলছ যেন সে উঁচু জাতের বিলাতি ঘোড়া।'

'Mon cher,' তার ধাঁচে বলতে চেষ্টা করে আমি উত্তর দিলাম, **'je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie** serait un mélodrame trop ridicule.'**

আমি ঘুরে চলে গেলাম। আধ-ঘণ্টা ধরে আঙুর-লতা-ঢাকা পথে-পথে, চুনাপাথরের পাহাড়ে-পাহাড়ে আর তাদের মধ্যেকার ছোট-ছোট ঝোপঝাড়ে আমি ঘুরে বেড়ালাম। গরম হয়ে আসছিল। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে পা চালালাম। গন্ধক-প্রস্রবণের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঢাকা জায়গাটায় বিশ্রামের জন্য বসলাম, আর তার ফলে দেখতে পেলাম এক দারুণ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। চরিত্রগুলির অবস্থান ছিল এই রকম: একটি বেঞ্চির উপর মস্কোর ফুলবাবুটি, আর তার পাশে বসে বয়স্কা রানী। মনে হল তিনি গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। তরুণী রাজকুমারী সম্ভবত তার শেষ গেলাস জল পান

---

* ওহে, বন্ধু, আমি লোকদের ঘৃণা করি, পাছে তাদের অবজ্ঞা করতে হয়, কারণ তা না হলে আমার জীবনটা জঘন্য প্রহসন হয়ে উঠত (ফরাসী ভাষায়)।

** ওহে, বন্ধু, আমি মেয়েদের উপেক্ষা করি, পাছে তাদের ভালোবাসতে হয় কারণ তা না হলে আমার জীবনটা নেহাৎই হাস্যকর মেলোড্রামা হয়ে উঠত (ফরাসী ভাষায়)।

করে কুয়োর পাশে চিন্তিতভাবে পায়চারি করছে। গ্রুশ্‌নিৎস্কি কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি আর কেউ নেই।

আরও কাছে এগিয়ে ঢাকা জায়গাটার এক কোণে আমি লুকিয়ে পড়লাম। ঠিক তখনি গ্রুশ্‌নিৎস্কির হাত থেকে বালির উপর গেলাসটা পড়ে গেল, আর সেটাকে তোলবার জন্য সে নীচু হতে চেষ্টা করল। কিন্তু আহত পায়ের জন্যে কাজটা করা তার পক্ষে হয়ে উঠল কষ্টসাধ্য। বেচারা! কী চেষ্টাই না সে করল ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে, কিন্তু কিছুতেই পারল না। তার মুখের ভাবে বাস্তবিক ফুটে উঠল যন্ত্রণার ছায়া।

আমার চেয়ে রাজকুমারী মেরি ব্যাপারটা ভালো করে দেখতে পেল।

পাখীর চেয়েও দ্রুত গতিতে তার পাশে ছুটে এসে নীচু হয়ে গেলাসটা কুড়িয়ে অবর্ণনীয় অপরূপ ভঙ্গীতে তাকে দিল। তারপর অতিরিক্ত আরক্ত হয়ে ঢাকা জায়গাটার দিকে তাকাল। কিন্তু তার মা এ-সব লক্ষ্য করেন নি দেখে আবার সঙ্গে-সঙ্গে সে আত্মস্থ হয়ে উঠল। গ্রুশ্‌নিৎস্কি যখন ধন্যবাদ দিতে গেল ততক্ষণে সে অনেক দূরে সরে গেছে। এক মিনিট পর তার মা'র আর ফুলবাবুটির সঙ্গে সে ঢাকা জায়গাটা থেকে চলে গেল। কিন্তু গ্রুশ্‌নিৎস্কির পাশ দিয়ে যাবার সময় তার হাবভাব হয়ে উঠল নিখুঁত আর গর্বিত। এমন কি তার দিকে মুখ পর্যন্ত ফেরাল না সে কিংবা লক্ষ্য করল না, পাহাড়ের পাদদেশে বুল্‌ভারের লাইম গাছের পিছনে যতক্ষণ না সে অদৃশ্য হয় ততক্ষণ গ্রুশ্‌নিৎস্কির ব্যগ্র দৃষ্টি তাকে কী ভাবে অনুসরণ করছিল...। মেয়েটি যখন রাস্তার ওপাশে পিয়াতিগোর্স্কের উৎকৃষ্টতম বাড়িগুলির অন্যতম এক বাড়ির ফটকে প্রবেশ করল, গ্রুশ্‌নিৎস্কি শেষবারের মতো মুহূর্তের জন্য দেখতে পেল তার বনেট। তার পিছন-পিছন যাচ্ছিলেন বয়স্কা রানী। ফটকের কাছে রায়েভিচের কাছ থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

বেচারা অভিভূত যুঙ্কারটি মাত্র তখনই আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হল।

'তুমি দেখলে?' দৃঢ় মুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরে সে প্রশ্ন করল। 'বাস্তবিক, মেয়েটি যেন অপ্সরী!'

'কেন?' একেবারে অজ্ঞ লোকের মতো ভাব করে বললাম।

'তুমি দেখ নি?'

'দেখেছি বৈকি, কী ভাবে সে তোমার গেলাসটা তুলে দিল। কাছেপিঠে কোনো মালি থাকলে সে-ও ও-কাজ করত — বকশিশ পাবার লোভে হয়ত আরও তাড়াতাড়ি করত। তোমার ওপর ওর যে মায়া হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তোমার খোঁড়া পায়ে ভর দেবার সময় মুখটা তুমি এমন বিকৃত করেছিলে...'

'আর যখন তার চোখেমুখে ঝলক দিয়ে উঠল অন্তরাত্মা, সেই মুহূর্তে তোমার মনে কি একটু দোলা লাগে নি?'

'না।'

আমি তাকে উত্তেজিত করার জন্য মিথ্যা কথা বলছিলাম। আমার জন্মগত অভ্যেস প্রতিবাদ করা; আমার সমস্ত জীবন হল হৃদয় কিংবা বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষণ্নভাবে অনর্থক বিরোধিতা করে যাওয়া। উৎসাহী কারুর সামনে আমি শীতকালের সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিনের মতোই ঠাণ্ডা, আর আমার মনে হয় যে কোনো অলস ঢিলেঢালা লোকের সঙ্গে ক্রমাগত মেলামেশার ফলে দারুণ কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠব। আমাকে এ-কথাও স্বীকার করতেই হবে যে, মুহূর্তের জন্য আমার অন্তরে অপ্রীতিকর অথচ পরিচিত এক অনুভূতি দ্রুত উঠে এসেছিল; সে-অনুভূতিটা হল বিদ্বেষ। স্পষ্টই বলছি 'বিদ্বেষ' কারণ নিজের কাছে অকপট হতে আমি অভ্যস্ত। আর যে সুন্দরী নারীকে দেখার পর কোন যুবকের অলস কৌতূহল আকৃষ্ট হয়েছে তাকে নিজেরই মতো অপরিচিত অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করতে দেখলে যে-কোনো যুবকের মনের উপরেই এক অপ্রীতিকর প্রভাব বিস্তারিত না-হওয়া অসম্ভব (অবশ্যই সে-যুবক যদি অভিজাত সমাজের হয় এবং নিজের অহঙ্কারকে চরিতার্থ করতে অভ্যস্ত থাকে)।

গ্রুশ্‌নিৎস্কি আর আমি চুপচাপ পাহাড় থেকে নেমে বুল্‌ভার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে অতিক্রম করলাম সেই বাড়ির জানালা, যার মধ্যে সুন্দরী তরুণীটি প্রবেশ করেছিল। সে বসেছিল জানালার পাশে। আমার আস্তিনে টান দিয়ে গ্রুশ্‌নিৎস্কি তার দিকে এমন অস্পষ্ট আবেগভরে তাকাল যা দেখে মেয়েদের মনে কোনো রকম সাড়াই জাগে না। আমার হাত-চশমাটা তার দিকে তুলে দেখলাম যে গ্রুশ্‌নিৎস্কির চাউনিতে তার মুখে হাসি ফুটেছে, কিন্তু আমার অভদ্র হাত-চশমাটা তাকে দারুণ রাগিয়ে দিয়েছে।

বাস্তবিকই, মস্কো থেকে আগত কোনো রাজকুমারীর দিকে ককেশাসের সৈনিক অফিসার কোন্ সাহসে তার হাত-চশমাটা ওঠাতে পারে?..

১৩ই মে

আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ডাক্তার আজ সকালে এসেছিলেন। তাঁর নাম ভের্নের, কিন্তু তিনি রুশী। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এক ইভানোভকে আমি জানতাম যে ছিল জার্মান।

নানা দিক দিয়েই ভের্নের আশ্চর্য মানুষ। অধিকাংশ ডাক্তারদের মতোই তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত ও জড়বাদী। কিন্তু তিনি আবার কবিও, এবং বাস্তবিকই আন্তরিকভাবে কবি — তাঁর সব কাজেই কাব্যিক স্পর্শ এবং প্রায়ই কথাবার্তাতেও তার প্রমাণ পাওয়া যেত — যদিও জীবনে দু'ছত্র কবিতাও তিনি রচনা করেন নি। মানুষের হৃদয়ের প্রাণধারক তন্ত্রী সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেছিলেন, লোকেরা যে-ভাবে মৃতদেহের পেশীতন্তু নিয়ে অধ্যয়ন করে। কিন্তু তাঁর জ্ঞানকে তিনি কাজে লাগাতে পারেন নি, যেমন অনেক সময় নিপুণ শবব্যবচ্ছেদবিদ জ্বর নিরাময় করতে পারেন না! ভের্নের সর্বদাই তাঁর রোগীদের নিয়ে নেপথ্যে উপহাস করতেন, যদিও একদা তাঁকে মুমূর্ষু এক সৈনিকের জন্য কাঁদতে দেখেছিলাম...। তিনি দরিদ্র, এবং লক্ষপতি হবার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু টাকার জন্য তিনি নিজের পথ ছেড়ে কখনও এক পা-ও যান নি। একদা আমাকে তিনি বলেছিলেন যে বন্ধুর চেয়ে বরং তিনি নিজের শত্রুর উপকার করবেন, কারণ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে দাক্ষিণ্য দেখানোর ফলে নিজের লাভবান হবার সম্ভাবনা থাকে, অন্য ক্ষেত্রে দাক্ষিণ্য দেখানোর ফলে শত্রুর মনে ঘৃণা বেড়ে ওঠে সম পরিমাণে। তাঁর ভাষা ছিল বিদ্বেষযুক্ত, এবং সেই সঙ্গে তাঁর রসাল কথাগুলো যুক্ত হওয়ায় অনেক ভালোমানুষকেই মনে হত ইতর ও বোকা। তাঁর সম্পর্কে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা, খনিজ-জলের উৎস-স্থানের বিদ্বেষপরায়ণ ডাক্তাররা গুজব রটিয়েছিল যে তিনি তাঁর রোগীদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। রোগীরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, ফলে তাঁর পসার প্রায় একেবারে পড়ে যায়। তাঁর বন্ধুরা, অর্থাৎ ককেশাসে কর্মরত সমস্ত ভদ্রলোকরা, বৃথাই তাঁর হৃত প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

তাঁর চেহারাটা এ-রকম যে প্রথম দর্শনে অপ্রীতিকর বলে মনে হয়,

কিন্তু পরে তাঁর বিষম অবয়বের পিছনে চোখ যখন মহৎ ও অভিজ্ঞ মনের ছাপ দেখতে পায় তখন তাঁর চেহারাটা প্রীতিকর লাগে। এ-রকম মানুষের সঙ্গে মেয়েরা পাগলের মতো প্রেমে পড়েছে বলে অনেক ঘটনা জানা গেছে, তাদের কুশ্রীতার বিনিময়ে সবচেয়ে তরুণ এবং সবচেয়ে গোলাপী রঙের কোনো এণ্ডাইমিয়নের সৌন্দর্যও*) গ্রহণ করতে তারা নারাজ। আত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করার অন্তর্দৃষ্টি আছে বলে মেয়েদের শ্রদ্ধা করতেই হয়; হয়ত এ-কারণেই ভের্নেরের মতো লোকেরা অত গভীরভাবে মেয়েদের ভালোবাসে।

ভের্নের ছোট্টখাট্ট মানুষ, শিশুর মতোই শীর্ণ ও দুর্বল। বাইরনের মতোই*) তাঁর একটি পা অন্যটির চেয়ে ছোট্ট। তাঁর দেহের তুলনায় মাথাটা মনে হয় খুব বড়। চুল ছাঁটেন তিনি খুব ছোট্ট করে। এ-ভাবে চুল ছাঁটার ফলে তাঁর এবড়ো-খেবড়ো খুলিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটার অদ্ভুত জাতের পরস্পরবিরোধী উঁচু-নীচু ভাব মস্তিষ্কবিদ্যা-বিশরদকে স্তম্ভিত করে দেবে। তাঁর ছোট-ছোট, কালো, সদা-চঞ্চল চোখগুলো অন্যের চিন্তাধারাকে তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করে। বেশভূষা তাঁর নিখুঁত ও সুরুচির পরিচায়ক। তাঁর শীর্ণ, ছোটো, শুকনো হাতগুলো ফিকে হলদে দস্তানা দিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে ঢাকা। তাঁর কোট, টাই এবং ওয়েস্টকোট সর্বদাই কালো রঙের। তরুণের দল তাঁকে বলত মেফিস্টোফেলিস*)। এই আখ্যার দরুন যদিও তিনি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করতেন, আসলে কিন্তু তাঁর অহঙ্কার এতে চরিতার্থ হত। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা পরস্পরকে বুঝে ফেললাম এবং সঙ্গী হয়ে উঠলাম — কারণ বন্ধুত্ব আমার ধাতে পোষায় না। দুই বন্ধুর মধ্যে সর্বদাই একজন অন্যের ক্রীতদাস — যদিও প্রায় কখনই সে কথা কেউ স্বীকার করবে না। আমি ক্রীতদাস হতে পারি না, আর অন্যের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করা কষ্টসাধ্য কাজ, কারণ তার জন্য ছলনারও প্রয়োজন। তা ছাড়া, আমার অর্থ এবং ভৃত্য দুই-ই আছে! আমাদের পরিচয় ঘটেছিল এই ভাবে: স... শহরে তরুণদের এক বিরাট হুল্লোড়ে জটলায় ভের্নেরের সঙ্গে আমার দেখা। সন্ধের শেষ দিকে আলোচনা মোড় নিল দার্শনিক ও অধিবিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর দিকে। আমরা বিশ্বাসের কথা আলোচনা করতে লাগলাম, আমাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ ধরনের বিশ্বাস আছে।

'আমার কথা যদি বলেন তা হলে বলব কেবল একটি বিষয়ে আমি নিশ্চিত...' ডাক্তার বললেন।

'সেটা কী?' আমি প্রশ্ন করলাম। এ-পর্যন্ত যে-ব্যক্তি চুপ করে বসেছিলেন তাঁর মতামত শুনতে আমার ইচ্ছে হল।

'সেটা হল এই — কম বেশী কিছুদিনের মধ্যে, সুন্দর এক সকালে আমার মৃত্যু হবে,' তিনি উত্তর দিলেন।

আমি বললাম, 'আপনার চেয়ে আমার অবস্থা ভালো, কারণ ওটা ছাড়া আর একটি বিষয়েও আমি নিশ্চিত। এক অতি বিশ্রী রাতে আমার জন্মাবার দুর্ভাগ্য হয়েছিল।'

আর সবাই ভাবছিল আমরা বাজে বকছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমানের মতো কথা বলার কারুরই কিছু ছিল না। সেই মুহূর্তে ভিড় থেকে আমরা দু'জন দু'জনকে বেছে নিলাম। প্রায়ই আমাদের সাক্ষাৎ হতে লাগল। আমরা গম্ভীরভাবে বস্তুনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম, যতক্ষণ না লক্ষ্য করতাম যে আমরা পরস্পরকে বিদ্রূপ করছি। তারপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে — সিসেরোর উক্তিমতো, প্রাচীন রোমের গণকরা যে-ভাবে তাকাত*) — আমরা হো হো করে হেসে উঠতাম এবং অনেকক্ষণ হাসাহাসির পর বিদায় নিতাম, আর এ-কথা ভেবে তৃপ্তি হত যে একটা সন্ধে ভালোই কাটল।

ভের্নের যখন ঘরে এলেন আমি তখন মাথার পিছনে হাত রেখে ছাতের দিকে তাকিয়ে একটা সোফায় শুয়েছিলাম। তিনি কোণে ছড়িটা দাঁড় করিয়ে, চেয়ারে বসে, হাই তুলে মন্তব্য করলেন যে বাইরেটা গরম হয়ে উঠছে। উত্তরে আমি বললাম যে মাছিগুলো ভারি বিরক্ত করছে। তারপর দু'জনেই চুপচাপ হয়ে গেলাম।

আমি বললাম, 'প্রিয় ডাক্তার, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে নির্বোধ লোকরা না থাকলে পৃথিবীটা ভারি একঘেয়ে হয়ে উঠত...। আমরা দুই বুদ্ধিমান লোক এখন এখানে রয়েছি; আগে থেকেই আমরা জানি যে যে-কোনো বিষয় নিয়েই সীমাহীন তর্ক চালানো যায়। তাই আমরা তর্ক করছি না। আমরা পরস্পরের প্রায় সমস্ত গভীরতম চিন্তার কথা জানি। একটি মাত্র কথাতেই সমস্ত বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি। তিন পর্দা খোসার ভেতর থেকে আমরা আমাদের মতামতের মর্মস্থলকে দেখতে পাই। দুঃখের ব্যাপারগুলো আমাদের কাছে মজাদার লাগে, মজাদার ব্যাপারগুলো দুঃখের বলে মনে হয়। আর আপনি যদি জানতে চান তা হলে বলি, সাধারণভাবে আমরা নিজেদের ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়েই উদাসীন। তাই আমাদের মধ্যে

ভাবাবেগ কিংবা চিন্তাধারার বিনিময় হতে পারে না। পরস্পরের সম্বন্ধে যা-কিছু জানবার তার সবটাই আমরা জানি, আর তার চেয়ে বেশী কিছু জানতে আমাদের প্রবৃত্তি নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে কথা বলার মতো মাত্র একটি বিষয় পড়ে আছে: সবশেষ খবর। বলার মতো কোনো খবরই কি আপনি জানেন না?'

দীর্ঘ বক্তৃতায় ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে আমি হাই তুললাম...

এক মুহূর্ত চিন্তা করে তিনি বললেন, 'আপনার বাজে কথার পেছনে একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে।'

'দুটি!' আমি উত্তর দিলাম।

'আমাকে একটির কথা বলুন, তা হলে অন্যটি কী আমি বলব।'

'ভালো কথা। আপনি শুরু করুন,' ছাতের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে-মনে হাসতে হাসতে আমি উত্তর দিলাম।

'এই খনিজ-জলের উৎসে সবে এসেছেন এমন একজনের কথা আপনি জানতে চান। কার কথা আপনার মনে হচ্ছে সেটাও আমি অনুমান করতে পারি। কারণ সেই একজন ইতিমধ্যেই আপনার কথা জিগ্‌গেস করছিলেন।'

'ডাক্তার! বাস্তবিক আমাদের কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই; পরস্পরের মনের কথা আমরা পড়তে পারি।'

'এবার অন্যটি হল...'

'দ্বিতীয়টি হল এই: কয়েকটা কথা আপনাকে দিয়ে বলাতে আমার ইচ্ছে ছিল; প্রথমত, কথা বলার চেয়ে শোনা অনেক কম পরিশ্রমের; দ্বিতীয়ত, শোনার সময় নিজের মনের কথা অন্যকে জানাতে হয় না; তৃতীয়ত, আপনি হয়ত অন্য লোকের গোপনীয় কথা জানতে পারবেন; এবং চতুর্থত, আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক কথা-বলিয়ে'র চেয়ে শ্রোতাকে বেশী পছন্দ করেন। অতএব এখন কাজের কথায় আসা যাক: রানী লিগোভ্‌স্কায়া আমার সম্বন্ধে কী বলছিলেন?'

'আপনি কি নিঃসন্দেহ যে রানী লিগোভ্‌স্কায়াই আপনার কথা বলছিলেন রাজকুমারী নন?..'

'একেবারে নিঃসন্দেহ।'

'কেন?'

'কারণ, রাজকুমারী গ্রুশ্‌নিৎস্কির কথা জিগ্‌গেস করেছিলেন।'

'আপনার বিজ্ঞতা অসাধারণ। রাজকুমারী বলছিলেন যে সাধারণ ফৌজী

গ্রেটকোট-পরা যুবকটিকে ডুয়েলের দরুন পদচ্যুত করা হয়েছে বলে তিনি নিঃসন্দেহ...'

'আশা করি তাঁর মনের এই প্রীতিকর বিভ্রম দূর করার চেষ্টা আপনি করেন নি...'

'নিশ্চয়ই না।'

উৎফুল্ল হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'অভিনয় শুরু হয়ে গেছে! এই মিলনান্তক নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয় করতে সাহায্য করব। দেখা যাচ্ছে আমার ভাগ্য আমাকে একঘেয়েমির মধ্যে রাখতে চায় না।'

ডাক্তার বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে যে বেচারা গ্রুশ্‌নিৎস্কি আপনার বলি হয়ে দাঁড়াবে...'

'আর তারপর কী হল, ডাক্তার?..'

'রানী লিগোভ্‌স্কায়া বললেন যে আপনার মুখ তাঁর পরিচিত। আমি বললাম হয়ত তিনি সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের অভিজাত সমাজে আপনাকে দেখে থাকবেন... তারপর আপনার নাম বললাম...। আপনার কথা তিনি জানেন। মনে হল আপনার কথা সেখানে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল...। তারপর রানী আপনার দুঃসাহসিকতার গল্প বলতে লাগলেন; সম্ভবত চালু গাল-গল্পের উপর তিনি রঙ চড়াচ্ছিলেন...। কৌতূহলী হয়ে তাঁর কন্যা শুনছিলেন, আধুনিক উপন্যাসের নায়ক হিসেবে আপনাকে তিনি কল্পনা করছিলেন...। রানীকে আমি বাধা দিই নি, যদিও জানতাম তিনি আজেবাজে বকছেন।'

'বন্ধুর মতো বন্ধু!' বলে তাঁর দিকে হাত প্রসারিত করলাম।

আন্তরিকতার সঙ্গে ডাক্তার সেটা চেপে ধরে বলে চললেন:

'আপনি যদি চান তা হলে আমি আলাপ করিয়ে দেব...'

হাত নেড়ে আমি বললাম, 'শুনুন বন্ধু! কখনও কি শুনেছেন যে নায়কদের বিধিমতো পরিচয় করিয়ে দিতে হয়েছে? তাদের প্রিয়জনদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেই তারা পরিচিত হয়...'

'আপনি কি সত্যি সত্যিই রাজকুমারীর পিছু পিছু ঘুরতে চান নাকি?..'

'একেবারেই না, বরঞ্চ উল্টো!.. ডাক্তার, শেষটায় আমারই জিৎ হল, কারণ আমাকে আপনি বুঝতে পারেন নি!.. তা হলেও কিন্তু ব্যাপারটা বিরক্তিকর,' এক মুহূর্ত থেমে আমি বলে চললাম। 'আমার নিজের কথা

কাউকে আমি বলি না। অন্যরা নিজে থেকে যখন আমার রহস্য অনুমান করতে পারে তখন আমি খুশি হয়ে উঠি। কারণ, প্রয়োজনমতো সেগুলোকে অস্বীকার করার ফাঁক আমার কাছে থেকে যায়। আপনাকে কিন্তু মা আর মেয়ের কথা বলতে হবে। কী ধরনের লোক তাঁরা?'

ভের্নের উত্তর দিলেন, 'প্রথমত রানীর বয়স হল পয়ঁতাল্লিশ। তাঁর হজম-ক্ষমতা চমৎকার, কিন্তু রক্ত-দোষ আছে। সে কথা তাঁর গালের লাল-লাল ছোপ থেকে জানা যায়। তাঁর জীবনের শেষের দিক তিনি মস্কোতে কাটিয়েছেন।*) সেখানকার অলস জীবনের জন্যে তিনি মোটা হয়ে পড়েছেন। হালকা খোশ গল্পে তাঁর অনুরাগ, আর মেয়ে ঘরে না থাকলে অশ্লীল কথাও তিনি বলে থাকেন। আমাকে তিনি বলেছেন যে পায়রার মতোই নিষ্পাপ তাঁর কন্যা। এটা অবশ্য আমাকে বলার কী কারণ জানি না...। আমি তাঁকে বলতে চেয়েছিলাম যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন কথাটা কাউকেই আমি বলব না! বাতের চিকিৎসা করাচ্ছেন রানী, মেয়ে যে কিসের চিকিৎসা করাচ্ছেন ভগবানই জানেন। আমি তাঁদের বলেছি দৈনিক দু'গেলাস করে গন্ধক-জল পান করতে এবং সপ্তাহে দু'বার সেই জলে স্নান করতে। মনে হয় রানী লোকজনকে আদেশ করতে অনভ্যস্ত। তার মেয়ের জ্ঞান-বুদ্ধিকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। মেয়েটি ইংরেজিতে বাইরন পড়েছেন*) এবং বীজগণিত জানেন, মনে হয় মস্কোর তরুণীদের লেখাপড়া শেখার দিকে ঝোঁক এসেছে। বাস্তবিকই তাদের পক্ষে এটা ভালো! সাধারণত আমাদের দেশের পুরুষদের ভব্যতার এত অভাব যে বুদ্ধিমতী মেয়েদের সম্ভবত তাদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করতে অসহ্য লাগে। বয়স্কা রানী যুবকদের খুব পছন্দ করেন, কিন্তু রাজকুমারী তাদের যেন দেখেন খানিকটা ঘৃণার চোখে — এটা মস্কোবাসীর এক পুরনো অভ্যেস! মস্কোতে তারা চল্লিশ বছরের রসিকদেরই শুধু পছন্দ করে।'

'ডাক্তার, আপনি কখনও মস্কোতে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ছিলাম। কিছু পসার সেখানে ছিল।'

'দয়া করে, বলে চলুন।'

'মনে হচ্ছে যা কিছু বলার সবই বলেছি...। হ্যাঁ, ভালো কথা, আরও একটা ব্যাপার: মনে হয় রাজকুমারী ভাবাবেগ, সুগভীর অনুভূতি, ইত্যাদি জাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে একটা শীত তিনি কাটিয়েছিলেন, কিন্তু সেই শহর, বিশেষ করে সেখানকার

সমাজ, তাঁকে খুশি করে নি। স্পষ্টই মনে হয় সেখানে তাঁকে তেমন অভ্যর্থনা জানানো হয় নি।'

'তাঁদের বাড়িতে আজ আপনার সঙ্গে আর কারুরই দেখা হয় নি?'

'হ্যাঁ, দেখা হয়েছিল। সেখানে ছিলেন এক এ্যাডজুটাণ্ট, আচারনিষ্ঠ রক্ষীবাহিনীর একজন। আর ছিলেন এক মহিলা, সবে এসেছেন, রানীর স্বামীর কী রকম যেন আত্মীয়া, ভারি সুন্দরী, কিন্তু মনে হয় খুব অসুস্থ...। কুয়োটার কাছে তাঁকে আপনি দেখেন নি? মাঝামাঝি লম্বা, সোনালী চুল, নিখুঁত চেহারা, যক্ষ্মারোগীর মতো মুখের রঙ, আর ডান গালের ওপর ছোট্ট কালো একটা জড়ুল। তাঁর জীবন্ত উজ্জ্বল মুখ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।'

বিড়বিড় করে আমি বললাম, 'একটা জড়ুল? তা-ও কি সম্ভব?'

আমার দিকে চেয়ে, আমার বুকের ওপর হাত রেখে ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, 'আপনি তাঁকে চেনেন...।'

বাস্তবিক আমার বুকের স্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুততর হচ্ছিল।

'এবার আপনার পালা উল্লসিত হবার,' আমি বললাম। 'আমি শুধু আশা করি আমাকে আপনি ধরিয়ে দেবেন না। এখনও তাকে আমি দেখি নি, কিন্তু আপনার বর্ণনা থেকে মনে হচ্ছে এই মেয়েটিকে আমি চিনি— অনেক দিন আগে তাকে আমি ভালোবাসতাম...। আমার সম্বন্ধে একটি কথাও তাকে বলবেন না, আর সে যদি আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আমার নিন্দে করবেন তার কাছে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে ভের্নের বললেন, 'আপনার যা অভিরুচি।'

তিনি চলে যাবার পর দারুণ এক বিষণ্ণতায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ভাগ্যই কি আমাদের দু'জনকে ককেশাসে নিয়ে এসেছে, নাকি এখানে আমার দেখা পাবে জেনেই সে এসেছে?.. আমাদের সাক্ষাৎ কেমন হবে?.. তা ছাড়া, সে-ই ত?.. আমার পূর্ববোধ কখনও ভুল হয় নি। পৃথিবীতে আমার মতো এমন আর একজনও নেই যার ওপর অতীত এত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। অতীতের প্রতিটি আনন্দ-বেদনার স্মৃতি আমাকে যন্ত্রণা দেয় এবং একই ভাবে একই তন্ত্রীতে আঘাত করে...। বোকার মতো আমার ধাত, কারণ আমি কিছুই ভুলি না — কিচ্ছু না!

সান্ধ্য আহার শেষ হবার পর প্রায় ছ'টার সময় আমি বুল্‌ভারে গিয়ে দেখলাম সেখানে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। রানী এবং তাঁর কন্যা বসে রয়েছেন একটি বেঞ্চিতে। তাঁদের ঘিরে রয়েছে এক দল যুবক, যারা ক্রমাগত তাঁদের মনোরঞ্জন করতে উদ্‌গ্রীব। কিছু দূরে আর একটি বেঞ্চি বেছে নিয়ে আমি বসলাম এবং আমার পরিচিত দু'জন অফিসারকে ডেকে এক গল্প শুরু করলাম। মনে হল গল্পটা মজাদার, কারণ পাগলের মতো তারা হাসতে শুরু করল। রাজকুমারীকে ঘিরে যে-সব যুবকরা ছিল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তাদের মধ্যে কয়েক জন আমার বেঞ্চির কাছে এলো। তারপর ধীরে-ধীরে অন্য সবাইও রাজকুমারীর কাছ ছেড়ে আমার দলে যোগ দিল। ক্রমাগত আমি বকে চললাম, এমন সব চুটকি বলতে লাগলাম যেগুলো এত সরস যে প্রায় বোকার মতোই শোনায় এবং যে-সব বিচিত্র লোকরা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তাদের নিয়ে এমন তীক্ষ্ন ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করলাম যে সেগুলো প্রায় পাগলামির সমান...। এ-ভাবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে চললাম। রাজকুমারী তার মায়ের হাতের মধ্যে হাত দিয়ে বার কয়েক আমার পাশ দিয়ে পায়চারি করে গেল। তাদের সঙ্গে ছিল এক খোঁড়া বৃদ্ধ। বার কয়েক রাজকুমারীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ল; সে-দৃষ্টিতে ছিল বিরক্তির আভাস, যদিও সে উদাস ভাব দেখাতেই চাইছিল...

'আপনাদের উনি কী বলছিলেন?' নিছক ভদ্রতার খাতিরে রাজকুমারীর কাছে ফিরে-আসা এক যুবককে সে প্রশ্ন করল। 'গল্পটা নিশ্চয়ই লোমহর্ষক — নিশ্চয়ই লড়াইয়ে তাঁর নিজের বীরত্বের কথা।' বেশ জোরেই কথাগুলো সে বলল, যাতে আমাকে সে যে খোঁচা দিচ্ছে তা বোঝা যায়। আমি ভাবলাম, 'বটে! আমার ওপর দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠেছে দেখছি রাজকুমারী! অপেক্ষা করুন, আরও অনেক কিছু ঘটবে!'

বন্য পশুর মতো গ্রুশ্‌নিৎস্কি তাকে নিঃশব্দে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছিল। চোখের আড়াল তাকে হতে দিচ্ছিল না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি কালকেই কাউকে সে অনুরোধ করবে তার সঙ্গে রানী লিগোভ্‌স্কায়ার পরিচয় করিয়ে দিতে। রানী নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হবেন, কারণ তাঁর একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছে।

গত দু'দিন ধরে আমার অনুকূলে নানা ঘটনা দ্রুত বেগে ঘটে চলেছে। রাজকুমারী নিঃসন্দেহে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। আমার সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দু'তিনটি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক ছড়া আমি শুনেছি। বিদ্রূপাত্মক হলেও সেগুলি কিন্তু প্রশংসাব্যাঞ্জক। তার অত্যন্ত অদ্ভুত লাগছে এই ভেবে যে আমার মতো লোক, যে সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশতে এত অভ্যস্ত আর যার সঙ্গে তার সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের মাসি-খুড়ি আর মাসতুত-খুড়তুত বোনদের এত সৌহার্দ্য ছিল — সে কিনা তার সঙ্গে আলাপ করার কোন রকম চেষ্টাই করছে না। কুয়োটার কাছে আর বুল্‌ভারে প্রত্যহই আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি তার অনুরক্তদের ভাঙিয়ে আনতে— ঝকঝকে এ্যাডজুটাণ্ট, ফ্যাকাশে মস্কোবাসী ইত্যাদিদের। আর প্রায় সর্বদাই কৃতকার্যও হই। অতিথিদের মনস্তুষ্টি করায় চিরকালই আমার বিতৃষ্ণা। এখন কিন্তু সর্বদাই আমার বাড়ি ভরা থাকে অতিথিতে — সান্ধ্য ভোজ, নৈশ ভোজ আর তাস খেলার জন্য, এবং হায়, আমার শ্যাম্পেন কিনা তার মোহিনী নয়নকে পরাজিত করে!

গতকাল চেলাখোভ-এর দোকানে তার সঙ্গে আমার দেখা। চমৎকার এক পারস্য দেশীয় গালিচার দরদস্তুর সে করছিল। রাজকুমারী তার মা'কে বলছিল টাকাটা দিতে তিনি যেন দোনোমোনো না করেন, কারণ গালিচাটা তার ঘরে ভারি সুন্দর মানাবে...। আমি চল্লিশ রুব্‌ল বেশী দর হেঁকে সেটা কিনে নিলাম। তার ফলে লাভ হল অতিশয় চমৎকার এক চাউনি, যার ভিতর প্রচণ্ড আক্রোশ জ্বলজ্বল করছে। নৈশভোজের সময় ইচ্ছে করেই আমার চের্‌কেসীয় ঘোড়াটাকে তার জানালার পাশ দিয়ে হাঁটাতে আদেশ দিলাম। ঘোড়ার পিঠে ছিল সেই গালিচাটা। ভের্‌নের তখন তাঁদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন যে উক্ত দৃশ্যের এক দারুণ নাটকীয় ফল ফলেছিল। আমার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য রাজকুমারী সৈন্য সংগ্রহ করতে চায়। ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি সে যখন উপস্থিত থাকে দু'জন এ্যাডজুটাণ্ট আমাকে তখন নিরস সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানায়, যদিও আমার সঙ্গে প্রত্যহ আহার করার কামাই তাদের নেই।

গ্রুশ্‌নিৎস্কির হাবভাবও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। পিছনে হাত রেখে অন্যদের উপস্থিতি ভুলে সে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ তার পা সেরে গেছে, তাই

আজকাল সে খুঁড়িয়ে প্রায় হাঁটেই না। এক ছুতোয় বয়স্কা রানীর সঙ্গে সে আলাপ করেছিল এবং রাজকুমারীকে তোষামোদ করেছিল। মনে হচ্ছে রাজকুমারীর পছন্দের বিশেষ বালাই নেই, কারণ উক্ত ঘটনার পর থেকেই তার অভিবাদনের উত্তরে সে মধুর হেসে প্রত্যুত্তর দিয়ে আসছে।

গতকাল আমাকে সে প্রশ্ন করেছিল, 'ঠিক বলছ যে লিগোভ্স্কিদের সঙ্গে আলাপ করার তোমার ইচ্ছে নেই?'

'একেবারে ঠিক।'

'সত্যি! এখানকার মধ্যে তাঁদের বাড়িটাই সবচেয়ে ভালো। স্থানীয় সমাজের সব ভালো-ভালো লোকজনরা...'

'শোনো বন্ধু, সব রকম সমাজেই আমার অরুচি, স্থানীয় সমাজের কথা ত বাদই দাও। ওদের বাড়িতে তুমি গিয়েছিলে?'

'এখনও যাই নি। রাজকুমারীর সঙ্গে দুয়েকবারের বেশী আমার আলাপ হয় নি। তুমি ত জান গায়ে পড়ে নিমন্ত্রিত হতে কী রকম খারাপ লাগে, যদিও এখানে এ-ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে...। আমার কাঁধের ওপর যদি অফিসারের চিহ্ন থাকত তা হলে অবশ্য অন্য ব্যাপার হত...'

'শোনো বন্ধু! তুমি যেমনটি আছ তাইতেই অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক। তুমি শুধু জান না তোমার অনুকূল অবস্থার সুযোগ নিতে...। তুমি কি জান না যে ভাবালু তরুণীর চোখে তোমার সৈনিকদের গ্রেটকোটটা তোমাকে এক বীর আর শহীদ হিসেবে তুলে ধরে?'

গ্রুশ্নিৎস্কি আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল।

'কী সব বাজে বকছ!' সে বলল।

'আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে রাজকুমারী তোমার প্রেমে পড়েছে,' আমি বলে চললাম।

তার কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল, সে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠল।

হায় অহঙ্কার! তুমিই হচ্ছ সেই দণ্ড যা দিয়ে আর্কিমিডিস পৃথিবীকে তুলতে উচ্ছে করেছিলেন...।*)

রাগতভাব দেখিয়ে সে বলল, 'সব সময়ই তুমি ঠাট্টা কর। প্রথমত আমাকে সে প্রায় চেনেই না...'

'মেয়েরা শুধু তাদেরই ভালোবাসে যাদের তারা জানে না।'

'তাকে পছন্দ করার আমার বিশেষ ইচ্ছে নেই। শুধু এক ভালো পরিবারের সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই, আর বাস্তবিক এ-রকম আশা

করা একেবারে হাস্যকর যে... কিন্তু তোমার মতো সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের নারী-চিত্ত-জয়ীদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র! তুমি একবার দৃষ্টি হানলেই মেয়েরা গলে যায়...। ভালো কথা, পেচোরিন, তুমি কি জান যে রাজকুমারী তোমার কথা বলছিল?..'

'সত্যি? ইতিমধ্যেই তোমার কাছে সে আমার কথা বলেছে?..'

'তাতে অবশ্য তোমার আনন্দিত হবার কারণ নেই। একদিন একেবারে হঠাৎ কুয়োটার কাছে তার সঙ্গে আমি আলাপ করছিলাম। তার তৃতীয় উক্তি হল, 'কে ঐ ভদ্রলোক যাঁর চোখের চাউনিটা অপ্রীতিকর রকম অন্তর্ভেদী? আপনার সঙ্গে তিনি ছিলেন, যখন...' আরক্ত হয়ে উঠে সে দিনটার কথা উল্লেখ করতে চাইল না। তার মনে পড়ে গেল সেদিনকার সেই তুচ্ছ অথচ মধুর ঘটনাটার কথা। উত্তরে আমি বললাম, 'দিনটার উল্লেখ করার দরকার নেই, কারণ চিরকাল তার কথা আমার মনে থাকবে...।' বন্ধু, পেচোরিন, তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারলাম না, কারণ তোমাকে সে খারাপ ভাবে...। বাস্তবিক দুঃখের কথা, কারণ মেরি ভারি সুশ্রী!..'

এটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে গ্রুশ্‌নিৎস্কি সেই জাতের লোক যারা যে-সব মেয়েদের প্রায় চেনেই না এবং যে-সব মেয়েদের সৌভাগ্য হয়েছে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার — তাদের সম্বন্ধে কথা বলবার সময় তারা বলে থাকে 'আমার মেরি' অথবা 'আমার সোফি'।

গম্ভীর ভাব দেখিয়ে আমি বললাম:

'ঠিক কথা, তাকে দেখতে মন্দ নয়...। শুধু সাবধান গ্রুশ্‌নিৎস্কি! অধিকাংশ রুশ তরুণীই নিষ্কাম প্রেমের পক্ষপাতী, বিয়ে করার দিকে তাদের ঝোঁক নেই, আর নিষ্কাম প্রেম ভারি বিরক্তিকর। আমার মনে হয় রাজকুমারী সেই জাতের মেয়ে যারা ফুর্তি পেতে চায়। দু'মিনিটের জন্যে যদি তোমার সঙ্গ একঘেয়ে লাগে তা হলে তোমার হয়ে গেল। তোমার নীরবতার প্রয়োজন তার কৌতূহল উদ্রেক করার জন্যে, তোমার কথাবার্তা তাকে কখনও যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তি না দেয়; সর্বদাই তাকে দ্বিধার মধ্যে রাখতে হবে। তোমার জন্যে দশ-দশ বার জনমতকে সে উপেক্ষা করবে, বলবে সেটা তার আত্মত্যাগের পরিচয়, আর তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে তোমাকে উৎপীড়ন করতে শুরু করবে এবং শেষকালে বলবে তোমাকে সে বরদাস্ত করতে পারছে না। যদি তার ওপর তোমার প্রভুত্ব বিস্তার করতে না পার তা হলে এমন কি তার প্রথম চুম্বনের পর দ্বিতীয় চুম্বন পাবার অধিকার

তোমার থাকবে না। প্রাণভরে তোমার সঙ্গে সে প্রেমের অভিনয় করবে এবং এক কিংবা দু'বছর পরে তার মায়ের আদেশে বিয়ে করবে এক কদাকার জানোয়ারকে; তারপর সে নিজেকে বোঝাতে চাইবে যে সে অসুখী, সে ভালোবেসেছিল কেবল একজনকেই — অর্থাৎ তোমাকে — কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে নয় যে তোমার সঙ্গে তার মিলন হোক, কারণ তোমার গায়ে সৈনিকদের গ্রেটকোট, যদিও সেই পুরু ধূসর গ্রেটকোটের নীচে স্পন্দিত হচ্ছে এক একাগ্র আর মহৎ হৃদয়...'

টেবিলের উপর জোরে ঘুষি মেরে গ্রুশ্‌নিৎস্কি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

মনে-মনে আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম, এমন কি বার দুই মৃদু হাসলামও, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে লক্ষ্য করল না। স্পষ্টই সে প্রেমে পড়েছে, কারণ আগের চেয়ে বেশী বিশ্বাসপ্রবণ সে হয়ে উঠেছে; এমন কি স্থানীয় কারুকার্য খচিত রুপোর একটা আংটিও সে পরেছে, যেটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হল...। ভালো করে পরীক্ষা করার পর কী দেখতে পেলাম বলে আপনারা মনে করেন?.. ভেতরের দিকে ছোটো-ছোটো অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে 'মেরি' আর তার পাশেই রয়েছে তারিখ, যে-দিন সে সেই বিখ্যাত গেলাসটা তুলে দিয়েছিল। আমার আবিষ্কারের কথা কিছুই বললাম না। তার কাছ থেকে কোনো স্বীকারোক্তি বার করতে আমি চাই না; আমি চাই স্বেচ্ছায় আমাকে সে তার গুপ্ত কথা বলুক — তখন থেকেই আমি মজা পেতে শুরু করব...

. . . .

আজ ঘুম ভাঙতে আমার দেরি হয়ে গিয়েছিল। যখন কুয়োটার কাছে পৌঁছলাম কেউ তখন নেই। দিনটা তেতে উঠছে। তুষারমণ্ডিত পাহাড় থেকে সাদা-সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ছুটে চলেছে আকাশ দিয়ে। এ-থেকে বোঝা যায় ঝড়বৃষ্টি হবে। নিভে-যাওয়া মশালের মতো মাশুকের চুড়ো দিয়ে*) ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তার চারিপাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া ধূসর মেঘ উড়তে গিয়ে বাধা পেয়ে মনে হয় যেন পাহাড়ের কাঁটা গাছের ঝোপে আটকে গেছে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে বুকে হেঁটে চলেছে সেগুলো। আবহাওয়ায় তড়িৎশক্তি ভরা। আমি আঙুরলতা ঢাকা পথ দিয়ে গুহার দিকে চললাম। বিষণ্ণ বোধ করছিলাম। গালের ওপর জড়ুলওলা যে-তরুণী মেয়েটির কথা

ডাক্তার বলেছিলেন তার কথা ভাবছিলাম...। এখানে সে কী করছে? আর সে-ই ত? কেন মনে হল এ সে-ই? কেনই বা এ-বিষয়ে আমি এত নিঃসন্দেহ? পৃথিবীতে গালের ওপর জড়ুলওলা মেয়ের সংখ্যা কি এতই কম? এই সব ভাবতে-ভাবতে আমি গুহায় পেঁৗছলাম। তার ছাতের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে একটি মেয়ে পাথরের এক বেঞ্চিতে বসেছিল। মাথায় তার খড়ের টুপি, কাঁধের ওপর জড়ানো কালো একটা শাল। মাথা তার আনত, ফলে টুপিতে তার মুখটা ঢাকা পড়ে গেছে। আমি ফিরতে উদ্যত হলাম, যাতে তার চিন্তায় ব্যাঘাত না ঘটে, এমন সময় আমার দিকে সে তাকাল।

আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ভেরা!'

চমকে সে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'জানতাম এখানে আপনি আছেন,' সে বলল।

পাশে বসে তার হাতটা তুলে নিলাম। সেই মিষ্টি স্বর শোনার পর অনেক দিন আগেকার ভুলে-যাওয়া এক শিহরণ আমার শিরায়-শিরায় বয়ে গেল। তার গভীর, শান্ত চোখদুটি সোজা আমার দিকে চেয়ে রইল; তাদের মধ্যে দেখলাম অবিশ্বাস এবং ভর্ৎসনার মতো কিছু যেন রয়েছে।

'বহুদিন আমাদের দেখা হয় নি,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, আর দু'জনেই আমরা অনেক বদলে গেছি।'

'তুমি কি বলতে চাও আমাকে আর ভালোবাসো না!..'

'আমার বিয়ে হয়ে গেছে!..' সে বলল।

'আবার? কয়েক বছর আগে এই একই বাধা ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও...'

হাতটা সে সজোরে ছাড়িয়ে নিল, লাল হয়ে উঠল তার গালদুটো।

'হয়ত তোমার দ্বিতীয় স্বামীর প্রেমে তুমি পড়েছ?..'

কোনো উত্তর না দিয়ে সে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

'কিংবা হয়ত সে খুব সন্দিগ্ধ লোক?'

নিস্তব্ধতা।

'নিশ্চয়ই তাকে দেখতে খুব সুন্দর, মনে হয় সে খুব ধনী, আর তোমার ভয় হয় পাছে...' তার দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম: মুখের উপর তার ভীষণ কষ্টের চিহ্ন, জলে চোখদুটো চকচক করতে লাগল।

অবশেষে ফিসফিস করে সে বলল, 'বল ত আমাকে কষ্ট দিতে তোমার কেন এত ভালো লাগে?.. আমার উচিত তোমাকে ঘৃণা করা। যবে থেকে আমাদের পরিচয়, দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু আমাকে তুমি দাও নি...।' তার

গলা ধরে এলো, আর আমার বুকে মাথা রেখে সে এলিয়ে পড়ল।

আমি ভাবলাম, 'হয়ত সে-জন্যেই আমাকে তুমি ভালোবেসেছিলে, কারণ আনন্দের কথা লোকে ভুলে যায়, দুঃখের কথা কখনও ভোলে না...'

তাকে আমার বুকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ সে-ভাবে রইলাম। অবশেষে মিলিত হল আমাদের ওষ্ঠ এক জ্বলন্ত উল্লসিত চুম্বনে। হাতদুটো তার বরফের মতো ঠাণ্ডা, মাথাটা আগুনের মতো গরম। তারপর এমন কথাবার্তা শুরু হল কাগজে-কলমে যার কোনো মানে হয় না, যে-কথার পুনরুক্তি করা যায় না, এমন কি যা মনেও থাকে না, কারণ ধ্বনি কথার স্থান গ্রহণ করে তাকে আরও সুষমা-মণ্ডিত করে তোলে ইতালীয় গীতিনাট্যের মতো।

সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যাতে তার স্বামীর সঙ্গে আমার দেখা না হয়। বুল্‌ভারে অল্পক্ষণের জন্য যে খোঁড়া বৃদ্ধকে দেখেছিলাম সে-ই হল তার স্বামী। নিজের ছেলের জন্যই বৃদ্ধকে সে বিয়ে করেছিল। বৃদ্ধ ধনী, বাতে ভুগছে। তাকে নিয়ে আমি কোনো উপহাস করলাম না, কারণ পিতার মতো ভেরা তাকে শ্রদ্ধা করে এবং তাকে সে প্রতারণা করবে স্বামী হিসেবে...। মানুষের হৃদয় জিনিসটা অদ্ভুত, বিশেষ করে মেয়েদের!

রানী লিগোভ্‌স্কায়ার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হল ভেরার স্বামী, সেমিওন ভাসিলিয়েভিচ গ...ভ্‌। তারা নিকট প্রতিবেশী। ভেরা রানীর বাড়ি প্রায়ই যায়। তাকে কথা দিলাম যে আমি লিগোভ্‌স্কিদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ করব এবং যাতে তার ওপর কোনো সন্দেহ না পড়ে তার জন্য রাজকুমারী মেরির সঙ্গে লেগে থাকব। এতে আমার পরিকল্পনা ব্যাহত হবে না। ফুর্তিতে থাকব আমি...

ফুর্তিতে থাকা!.. হ্যাঁ, মানুষ একলা যখন আনন্দ খোঁজে এবং হৃদয় যখন কাউকে দারুণ ভালোবাসতে চায় — আমার জীবনের সেই আধ্যাত্মিক অধ্যায় ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে; এখন আমি কেবল চাই অন্যেরা আমাকে ভালোবাসুক, এবং তাদের সংখ্যা যেন বেশী না হয়। সত্যি বলতে কি একজন কারুর স্থায়ী প্রেমই আমার পক্ষে যথেষ্ট — এটা আমার হৃদয়ের একটা জঘন্য অভ্যেস!..

আমার নিজের কাছে সর্বদাই এটা অদ্ভুত মনে হয়েছে যে যে-মেয়েদের আমি ভালোবেসেছি কখনই তাদের গোলাম হয়ে যাই নি। বরঞ্চ উল্টো, নিজের দিক থেকে কোনো চেষ্টা না করেই তাদের মন ও হৃদয়ের উপর দুর্জয় আধিপত্য আমি বিস্তার করেছি। এটা কেন ঘটে? এটার কারণ কি

এই যে আমার কাছে কিছুরই দাম নেই, আর তারা প্রত্যেক মুহূর্তে ভয় পায় পাছে তাদের নাগালের বাইরে আমি চলে যাই? কিংবা সেটার কারণ আমার ভিতরকার আকর্ষণী শক্তি? কিংবা শুধু হয়ত এই যে এ-পর্যন্ত কোনো চরিত্রবলসম্পন্না মেয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি?

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে-মেয়েদের নিজস্ব মন বলে একটা জিনিস আছে তাদের আমি পছন্দ করি না — নিজেদের মন থাকা মেয়েদের মানায় না!..

অবশ্য এখন আমার মনে পড়ছে যে একবার, এবং মাত্র একবারই, এক দৃঢ়চেতা মেয়ের প্রেমে আমি পড়েছিলাম, তাকে আমি জয় করতে পারি নি...। আমাদের বিচ্ছেদ হবার পর আমরা পরস্পরের শত্রু হয়ে পড়ি। কিন্তু যদি তার সঙ্গে পাঁচ বছর পরে দেখা হত তা হলে বিচ্ছেদটা হয়ত হত একেবারে অন্য ভাবে...

এখন ভেরা অসুস্থ, অত্যন্তই অসুস্থ, যদিও সে-কথা সে স্বীকার করবে না; আমার ভয় হয় তাকে ক্ষয়রোগে ধরেছে কিংবা সেই অসুখ যাকে বলে fièvre lente* — একেবারেই রুশী অসুখ নয়, তাই আমাদের ভাষায় তার নাম নেই।

গুহাতে থাকতে-থাকতেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল। ফলে সেখানে আমাদের আরও আধ-ঘণ্টা হল থাকতে। আমাকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল না যে তার প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে হবে, এ-কথাও সে জানতে চাইল না যে আমাদের বিচ্ছেদের পর অন্য মেয়েদের আমি ভালোবেসেছি কিনা...। আগেকার মতোই আবার সে আমাকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বিশ্বাস করল — তাকে আমি প্রতারণা করব না। পৃথিবীতে সে-ই একমাত্র মেয়ে যাকে প্রতারণা করতে আমার বিবেকে বাধে। আমি জানি শীঘ্রই আবার আমাদের বিচ্ছেদ হবে, হয়ত চিরকালের জন্য। দু'জনেই আমরা বিভিন্ন পথে কবর পর্যন্ত পেঁছব, কিন্তু সর্বদাই তার কথা আমার মনে থাকবে। কথাটা তাকে বরাবর বলে এসেছি আর সেও বিশ্বাস করেছে, যদিও বিশ্বাস করে না বলে সে বলে।

অবশেষে আমরা বিদায় নিলাম। পাথর আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে যতক্ষণ না তার বনেটটা অদৃশ্য হল ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে আমি

---

* ক্লান্তিকর জ্বর (ফরাসী ভাষায়)।

দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলাম। বেদনায় আমার হৃদয় মুচড়ে উঠল, ঠিক প্রথম বার আমাদের বিচ্ছেদের সময়ের মতো। আঃ, এই অনুভূতিতে আমার কী আনন্দই না হল! যৌবন আবার কি আনন্দের বান ডাকিয়ে দেখা দিল, নাকি এটা তার বিদায়ের চাউনি, বিচ্ছেদের উপহার — এক স্মৃতিচিহ্ন?.. আর ভাবলে অবাক লাগে এখনও আমাকে দেখতে ছেলেমানুষের মতো; যদিও মুখ আমার ফ্যাকাশে, তবুও এখনও তাতে ক্লান্তির ছাপ নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আমার নমনীয় ও সাবলীল, চুলগুলো ঘন আর কোঁকড়া, উজ্জ্বল চোখ, আর শিরায়-শিরায় দ্রুত ছন্দে রক্ত চলেছে ছুটে...

বাড়ি ফিরে আমার ঘোড়ায় চেপে তাকে ছোটালাম স্তেপে; দীর্ঘ ঘাসের ভিতর দিয়ে তেজী ঘোড়ায় ছুটতে আমার ভালো লাগে। মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরুভূমির বাতাস, সুগন্ধী বাতাস সাগ্রহে পান করি, নীলাভ দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকি আর নানা জিনিসের আবছা পরিলেখ লক্ষ্য করি — প্রতি মুহূর্তে সেগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। যা-কিছু দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত অথবা দুশ্চিন্তায় মন পীড়িত থাকুক না কেন মুহূর্তের মধ্যে তা অদৃশ্য হয় এবং শারীরিক ক্লান্তি মানসিক অশান্তির ওপর অধিকার বিস্তার করার সঙ্গে-সঙ্গে শান্তি নেমে আসে অন্তরাত্মার ওপর। দক্ষিণাঞ্চলের রৌদ্রস্নাত অরণ্যময় পর্বত এবং নীল আকাশকে দেখার সময় অথবা পাথর থেকে পাথরে ঝাঁপিয়ে-পড়া ঝর্ণার গর্জন শোনার সময় যে-কোনো নারীরই চোখের কথা আমি ভুলতে পারি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাহারা দেবার উঁচু বুরুজগুলোর ভেতর থেকে দাঁড়িয়ে-থাকা ঝিমন্ত কসাক প্রহরীরা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোড়ার পিঠে আমাকে ছুটতে দেখে নিশ্চয়ই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমার বেশভূষার জন্য নিশ্চয়ই তারা আমাকে চের্কেসীয় বলে ভুল করেছিল। আর বাস্তবিকই আমি শুনেছিলাম যে চের্কেসীয়দের পোশাক পরে ঘোড়ার পিঠে বসলে আমাকে অনেক বেশী কাবর্দীয় বলে মনে হয়। সত্যিই এই চমৎকার সামরিক বেশভূষার কথা ধরলে আমাকে অত্যন্ত বাবুই বলা যায়: একটিও বাড়তি ফিতে নেই, অতি সাধারণ হাতল ও খাপে দামী-দামী অস্ত্রশস্ত্র, আমার টুপির লোম খুব বড় কিংবা ছোট নয়, লেগিং আর নরম চামড়ার বুটজোড়া নিখুঁতভাবে বসেছে, বেশ্মেৎটা সাদা আর চের্কেসীয় কোটটা গাঢ় খয়েরী রঙের, পাহাড়ীরা যে-ভাবে ঘোড়ায় চাপে বহুদিন ধরে সে-রকম করে বসতে অভ্যেস করেছি। ককেশীয়রা যে-ভাবে ঘোড়ায় চড়ে সে-ভাবে আমি

ঘোড়ায় চড়তে পারি বলে প্রশংসা করলেই আমার সবচেয়ে বেশী অহঙ্কার হয়। আমার চারটে ঘোড়া — একটা নিজের অন্য তিনটে বন্ধুদের জন্য — যাতে মাঠের ভেতর একা-একা ঘোড়ার পিঠে একঘেয়েমির হাত থেকে আমি রেহাই পাই। কিন্তু আমার ঘোড়ায় চড়তে ভালোবাসলেও আমার সঙ্গে কখনও তারা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায় না। ইতিমধ্যেই সন্ধে ছ'টা হয়ে গেছে। মনে পড়ল এখন নৈশভোজের সময়; তা ছাড়া, আমার ঘোড়াটাও হয়ে পড়েছে ক্লান্ত। পিয়াতিগোর্স্ক থেকে জার্মান উপনিবেশ*) পর্যন্ত যে-পথ গিয়েছে সেই পথ ধরে আমি চললাম। খনিজ-জলের উৎসের সমাজের লোকজন প্রায়ই সেখানে যায় en piquenique*। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে গেছে পথটা, অগভীর খাদগুলোতে ডুব দিয়ে। উঁচু-উঁচু ঘাসের ছায়ায় সেখানে সশব্দে বয়ে চলেছে ছোটো-ছোটো জলস্রোত। চারিদিকেই বেশ্‌তু, জ্‌মেইনায়া, জেলেজ্‌নায়া আর লীসায়া'র*) সুদীর্ঘ নীল উন্মুক্ত রঙ্গভূমি। এ-ধরনের এক খাদে নেমে ঘোড়াটাকে জল খাওয়াবার জন্য যখন দাঁড়িয়েছি তখন দেখলাম পথ দিয়ে হৈচৈ করে নেমে আসছে ঝকঝকে জামা-কাপড় পরা এক দল অশ্বারোহী। কালো আর আকাশ রঙের পোশাকপরা মেয়েরাও রয়েছে সেই দলে, পুরুষদের পোশাক হল চের্‌কেসীয় আর নিঝনি-নোভ্‌গরদবাসীদের বেশভূষার মিশ্রণ।*) সামনে ঘোড়ার পিঠে রয়েছে গ্রুশ্‌নিৎস্কি আর রাজকুমারী মেরি।

যে-সব মহিলা এখানে জল পান করতে আসেন এখনও তাঁরা বিশ্বাস করেন প্রকাশ্য দিবালোকে চের্‌কেসীয়দের হানা দেবার কথা; সে-কারণেই হয়ত গ্রুশ্‌নিৎস্কি তার সৈনিকদের গ্রেটকোটটার উপর কোমরবন্ধের সঙ্গে দুটো পিস্তল আর তরোয়াল ঝুলিয়েছে। এই ধরনের বীরের পোশাকে তাকে হাস্যকরই দেখাচ্ছিল। উঁচু একটা ঝোপ তাদের কাছ থেকে আমাকে আড়াল করে রেখেছিল, কিন্তু পাতার ভিতর দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। তাদের মুখের ওপরকার অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারলাম কথাবার্তার ঢঙ ভাবালু। অবশেষে পথ যেখানে নেমেছে তার কাছে তারা পৌঁছল। রাজকুমারীর ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরল গ্রুশ্‌নিৎস্কি। এখন তাদের কথাবার্তার শেষের অংশ শুনতে পেলাম:

রাজকুমারী বলল, 'আর আপনি আজীবন ককেশাসে থাকতে চান?'

---

* বনভোজনে (ফরাসী ভাষায়)।

তার সহচর উত্তর দিল, 'রাশিয়ায় আর আমার টান কিসের? সেটা এমন দেশ যে আমার চেয়ে বড়লোক বলে হাজার-হাজার লোক আমাকে ঘৃণা করবে। কিন্তু এখানে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এই পুরু গ্রেটকোটটা বাধার সৃষ্টি করে নি...'

আরক্ত হয়ে রাজকুমারী বলল, 'বরং তার উল্টোটাই...'

গ্রুশ্‌নিৎস্কির মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। সে বলে চলল:

'বর্বরদের গুলির নীচে এখানে আমার দিন অলক্ষিতভাবে দ্রুত ছন্দে বয়ে যাবে, আর ঈশ্বর প্রতি বছর যদি একটি করে নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টি পাঠান, যে-দৃষ্টি...'

ততক্ষণে আমার কাছে তারা পেঁছেছে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়ে ঝোপের পিছন থেকে আমি বেরিয়ে এলাম...।

ভীত কণ্ঠে রাজকুমারী চেঁচিয়ে উঠল, 'Mon dieu, un Circassien!..'*

তাকে অভয় দেবার জন্য সামান্য নত হয়ে ফরাসীতে আমি উত্তর দিলাম:

'Ne craignez rien, madame,— je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier.'**

সে কী রকম যেন হকচকিয়ে গেল — কেন জানি না। তার ভুলের জন্য, নাকি আমার উত্তরটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলে তার মনে হল? কামনা করি যেন শেষোক্ত কারণটাই হয়। অসন্তুষ্ট হয়ে গ্রুশ্‌নিৎস্কি আমার দিকে তাকাল।

সেদিন অনেক রাত্রে, অর্থাৎ প্রায় এগারোটার সময়, লাইম বুল্‌ভারে আমি বেড়াতে গেলাম। শহর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে কোনো-কোনো জানালায় বাতি জ্বলছে। তিন দিকে মাশুক পাহাড় থেকে উদ্‌গত কালো চুড়ো দেখা যাচ্ছে। মাশুকের চুড়োয় এক ভয়াবহ মেঘ থমকে রয়েছে। পুব দিকে চাঁদ উঠে আসছে। দূরে তুষারমণ্ডিত চুড়োগুলো রুপোর ঝালরের মতো চকচক করছে। সমস্ত রাতের জন্য এখন ছেড়ে-দেওয়া গরম জলের ঝর্ণার শব্দের সঙ্গে প্রহরীদের চিৎকার মিশেছে। মাঝে মাঝে পথে খুরের শব্দ হচ্ছে প্রতিধ্বনিত, তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে ষাঁড়ে-টানা ঢাকা গাড়িগুলোর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ আর করুণ তাতার সঙ্গীতের একটি

---

* ঈশ্বর! এ চের্‌কেসীয়! (ফরাসী ভাষায়)

** ভয় পাবেন না, দেবী — আপনার অনুগামী ব্যক্তিটির চেয়ে আমি বেশী বিপজ্জনক নই (ফরাসী ভাষায়)।

কলি। একটি বেঞ্চিতে বসে নিজের চিন্তায় আমি ডুবে গেলাম...। বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আমার চিন্তার বোঝা নামাবার প্রয়োজন আমি বোধ করলাম... কিন্তু কার সঙ্গে আলাপ করি?.. ভাবলাম, ভেরা এখন কী করছে? তার হাত তখন মুঠো করে ধরার জন্য বেশ চড়া দাম দিতেই আমি প্রস্তুত ছিলাম।

অকস্মাৎ আমি দ্রুত, অসমান পদধ্বনি শুনতে পেলাম...। হয়ত গ্রুশ্‌নিৎস্কি... হ্যাঁ, সে-ই!

'কোথায় গিয়েছিলে?'

গম্ভীর হয়ে সে উত্তর দিল, 'রানী লিগোভ্‌স্কায়ার বাড়ি। কী চমৎকারই না মেরি গান গায়!..'

আমি বললাম, 'তুমি জান বোধ হয়, বাজি ফেলে আমি বলতে পারি সে মনে করেছে তুমি এক পদচ্যুত অফিসার, সাধারণ সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্র নও...'

'হয়ত! কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে-যায় না!..' অন্যমনস্কভাবে সে উত্তর দিল।

'আমি শুধু কথাটার উল্লেখ করছিলাম...'

'তুমি জান তাকে তুমি দারুণ রাগিয়ে দিয়েছ? সে মনে করে ওটা তোমার নিছক ধৃষ্টতা। তাকে বোঝাতে আমায় দারুণ বেগ পেতে হয়েছে যে তোমার শিক্ষাদীক্ষা এত ভালো আর অভিজাত সমাজের চালচলন তুমি এমন ভালো জান যে তাকে অপমান করার তোমার কোনো ইচ্ছেই থাকতে পারে না। সে বলছিল তোমার চাউনিটা উদ্ধত ধরনের, আর নিশ্চয়ই তুমি খুব অহঙ্কারী।'

'সে ঠিকই বলেছে...। মনে হচ্ছে তুমি তার পক্ষ সমর্থন করছ, তাই না?'

'এখনও সে-রকম অধিকার আমার নেই বলে আমি দুঃখিত...'

আমি ভাবলাম, 'ওঃহো! স্পষ্টই মনে হচ্ছে ওর আশা আছে...'

গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলে চলল, 'এতে তোমার ক্ষতিই হবে। এরপর তাঁদের সঙ্গে আলাপ করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠবে — কী দুঃখের কথা! আমার জানাশুনো সবচেয়ে ভালো বাড়িগুলোর মধ্যে তাঁদেরটা একটা...'

মনে-মনে আমি হাসলাম।

'এখন সবচেয়ে ভালো বাড়ি হচ্ছে আমার নিজেরটা।' এই বলে হাই তুলতে-তুলতে চলে যাবার জন্য আমি উঠে পড়লাম।

'তবু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তুমি অনুশোচনা করছ?..'

'কী সব আজেবাজে কথা! ইচ্ছে করলে কাল রাতেই আমি রানীর বাড়ি যেতে পারি...'

'আচ্ছা, দেখা যাবে...'

'তোমাকে খুশি করার জন্যে রাজকুমারীর কাছে প্রেম-নিবেদনও করতে পারি...'

'অর্থাৎ সে যদি তোমার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হয়...'

'তোমার কথায় যতক্ষণ না তার একঘেয়ে লাগছে ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব...। আচ্ছা, চলি!..'

'আর আমি ঘুরে বেড়াব — কিছুতেই এখন ঘুমুতে পারব না...। শোন, বরং রেস্তোরাঁটায় যাওয়া যাক, ওখানে জুয়া খেলা যায়... আজ রাত্রে আমার তীব্র উত্তেজনার দরকার...।'

'আশা করি তুমি হারবে...'

আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

২১শে মে

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। এখনও লিগোভ্‌স্কিদের পরিবারের সঙ্গে আমি পরিচিত হই নি। সুযোগের অপেক্ষায় আছি। ছায়ার মতো রাজকুমারীর সঙ্গে গ্রুশ্‌নিৎস্কি লেগে আছে। তারা ক্রমাগতই কথা বলে চলে। কে জানে কখন তাকে মেরির একঘেয়ে লাগতে শুরু করবে?.. যা ঘটছে তাতে তার মা কোনো মনই দিচ্ছেন না, কারণ সে পাত্রই নয়। এই হচ্ছে মায়েদের যুক্তি! দু'তিনটি মধুর চাউনি আমি লক্ষ্য করেছি — ব্যাপারটা থামাতে হয়।

গতকাল কুয়োটার ধারে প্রথম এসেছিল ভেরা...। গুহার মধ্যে আমাদের সাক্ষাতের পর থেকে সে বাড়ি থেকে বেরোয় নি। একই সময়ে জলের মধ্যে আমরা গেলাস ডোবালাম আর নত হবার সময় সে ফিসফিস করে আমাকে বলল:

'লিগোভ্‌স্কিদের সঙ্গে তুমি আলাপ করতে চাও না!.. ওটাই হচ্ছে একমাত্র জায়গা যেখানে আমাদের দেখাশোনা হতে পারে...'

ভর্ৎসনা!.. কী একঘেয়ে! কিন্তু এটা আমার পাওনা ছিল...

ভালো কথা, রেস্তোরাঁর হল-ঘরে চাঁদা তুলে এক নাচের আসরের আয়োজন হয়েছে। রাজকুমারীর সঙ্গে আমি মাজুর্কা নাচতে চাই।

২২শে মে

নোব্‌ল্‌স্‌ ক্লাবের*) হল-ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে রেস্তোরাঁর হল-ঘরটা। ন'টার মধ্যে সবাই পৌঁছুল। যাঁরা সব শেষে পৌঁছুলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রানী লিগোভ্‌স্কায়া আর তাঁর কন্যা। অনেক মহিলা রাজকুমারী মেরির দিকে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ মেশানো দৃষ্টি হানতে লাগল, কারণ তার বেশভূষা অতিশয় সুরুচিপূর্ণ। নিজেদের যাঁরা স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের বলে মনে করেন তাঁরা ঈর্ষা গোপন করে তার সঙ্গে লেগে রইলেন। এ-ছাড়া আর কী আশা করা যেতে পারে? যেখানেই মেয়েদের জটলা সেখানেই সঙ্গে-সঙ্গে দুটি ভাগ হয়ে যায় — সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ। জানালার বাইরে অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রুশ্‌নিৎস্কি দাঁড়িয়ে ছিল। জানালার কাচে মুখটা চেপে ব্যগ্র দৃষ্টিতে সে চেয়েছিল তার আরাধ্য দেবীর দিকে; তার পাশ দিয়ে যাবার সময় রাজকুমারী এমন সামান্য মাথা নোয়াল যা প্রায় বোঝাই যায় না। সূর্যের মতো গ্রুশ্‌নিৎস্কি ঝলমল করে উঠল...। প্রথম নাচ হল পোলোনেজ; তারপর অর্কেস্ট্রা শুরু করল ওয়াল্‌স্‌। জুতোর কাঁটা ঝমঝমিয়ে উঠল, চক্রাকারে ঘুরতে লাগল লম্বা কোটের তলার দিক।

এক হৃষ্টপুষ্ট মহিলার পিছনে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। তাঁর একরাশ গোলাপী পালকের পোশাকে আমি আড়াল পড়ে গেছি। তাঁর চটকদার গাউন মনে পড়িয়ে দেয় অতীত যুগের কথা, যখন বন্ধনীযুক্ত সায়া পরার চলন ছিল, তাঁর খসখসে চামড়ার উপরকার ছোপ-ছোপ দাগগুলো কালো তাফ্‌তার সৌন্দর্য-তিলক পরবার আনন্দিত যুগের স্মৃতি মনে আনে।*) তাঁর গলার সবচেয়ে বড় আঁচিলটা একটা হার দিয়ে লুকানো। তাঁর সঙ্গী, অশ্বারোহী বাহিনীর এক ক্যাপ্টেনকে তিনি বলছিলেন:

'রাজকুমারী লিগোভ্‌স্কায়া উদ্ধত জাতের মেয়েমানুষ! ভাবুন একবার আমাকে ধাক্কা মারল কিন্তু ক্ষমা চাইবার কথাটা মনেই এলো না, তার ওপর কিনা ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত-চশমাটা দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল...। C'est

impayable!..* তার গর্ব করার আছেই বা কী? উচিত শিক্ষা পেলেই তবে সিধে হবে...’

বশংবদ ক্যাপ্টেনটি বলল, ‘আমার হাতে ছেড়ে দিন!’ তারপর সে অন্য ঘরে চলে গেল।

তৎক্ষণাৎ আমি রাজকুমারীর কাছে গিয়ে ওয়াল্‌স্‌ নাচবার জন্য অনুরোধ করলাম। স্থানীয় রীতি অনুসারে অপরিচিতার সঙ্গে আমি নাচতে পারি। আমি তার সুযোগ নিলাম।

সে মৃদু হেসে তার বিজয়ের আনন্দ চাপতে পারল না। কিন্তু চট করে সে সম্পূর্ণ উদাসীন, এমন কি কঠোর ভাব দেখাল। তাচ্ছিল্যভরে আমার ঘাড়ের ওপর সে হাত রাখল, মাথাটা একদিকে সামান্য করল কাত, আর নাচতে আমরা শুরু করে দিলাম। এমন কামোদ্রেককারী আর নমনীয় কটিদেশ আগে কখনও দেখি নি। তার সুগন্ধী নিশ্বাস আমার মুখে পড়তে লাগল; মাঝে মাঝে নাচের ঘূর্ণির জন্যে তার চুলের এক-একটি গুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার উত্তপ্ত গালের উপর পড়তে লাগল...। ঘরের চারিদিকে আমি তিনবার পাক খেয়ে এলাম। (ভারি চমৎকার সে ওয়াল্‌স্‌ নাচে।) সে হাঁপাতে লাগল, চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে এলো আর তার অর্ধ-স্ফুরিত অধর থেকে কোনো রকমে এই রীতিগত কথা বেরিয়ে এলো, ‘merci, monsieur.’**

কয়েক মিনিট পরে অতি বিনীত ভাব দেখিয়ে আমি বললাম:

‘রাজকুমারী, শুনেছি যে আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আপনার বিরক্তিভাজন হবার দুর্ভাগ্য আমার নাকি হয়েছে... শুনেছি, আমার মধ্যে ধৃষ্টতা আপনি নাকি লক্ষ্য করেছেন...। কথাটা কি সত্যি?’

‘আর সেই ধারণাটাকে আপনি কি এখন আরও দৃঢ় করতে চান?’ শ্লেষাত্মক মুখভঙ্গী করে হেসে সে উত্তর দিল। প্রসঙ্গত, তার দ্রুত পরিবর্তনশীল মুখাবয়বের সঙ্গে সেই মুখভঙ্গীটি সুন্দর মানাল।

‘কোনো ভাবে আপনার বিরাগভাজন হবার ধৃষ্টতা আমার যদি হয়ে থাকে, তা হলে আমার এই আরও বেশী ধৃষ্টতা আপনি কি ক্ষমা করবেন যদি আমাকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করি?.. বাস্তবিক আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমার সম্বন্ধে আপনি ভুল ধারণা করে রেখেছেন...’

---

* এটা অসহ্য! (ফরাসী ভাষায়)

** ধন্যবাদ, মহাশয় (ফরাসী ভাষায়)।

'সেটা করা হয়ত আপনার পক্ষে কঠিন হবে...'

'কেন ?..'

'কারণ আমাদের বাড়িতে আপনি আসেন না, আর সম্ভবত এ-ধরনের নাচের আসরের আয়োজন ঘন-ঘন হবে না।'

'অর্থাৎ,' আমি ভাবলাম, 'চিরদিনের জন্য তাঁদের বাড়ির দরজা আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে।'

খানিক বিরক্তি দেখিয়ে আমি বললাম, 'আপনি কি জানেন, রাজকুমারী যে, অনুতপ্ত অপরাধীকে ঘৃণা দেখিয়ে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়? কারণ তা হলে হয়ত নিছক নৈরাশ্যের দরুন সে দ্বিগুণ অপরাধ করতে পারে... আর তারপর...'

আমাদের চতুর্দিকে হাসি এবং ফিসফিসানি শুনে কথা শেষ না করে আমি ঘুরে তাকালাম। কয়েক পা দূরে এক দল লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল অশ্বারোহী-বাহিনীর সেই ক্যাপ্টেন, সুন্দরী রাজকুমারীর প্রতি যে তার বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিল। কী কারণে যেন মনে হল সে বেজায় খুশি হয়ে উঠে হাত কচলাচ্ছে, জোরে-জোরে হাসছে আর বন্ধুদের সঙ্গে চোখ টেপাটেপি করছে। অকস্মাৎ লম্বা কোটপরা দীর্ঘ গোঁফযুক্ত আরক্ত বদন এক ভদ্রলোক তাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে স্খলিতপদে রাজকুমারীর দিকে এগিয়ে গেল। স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে মাতাল হয়ে গেছে। বিমূঢ় রাজকুমারীর সামনে হাত পিছনে রেখে দাঁড়িয়ে তার ঝাপসা-ধূসর চোখ রাজকুমারীর উপর নিবদ্ধ করে ফ্যাঁসফেঁসে উচ্চকণ্ঠে সে বললো:

'Permettez...* আঃ, চুলোয় যাক... আপনাকে আমি মাজুর্কা নাচের জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি...'

'আপনি কী চান?' মিনতি ভরা চোখে চারিদিকে চেয়ে রাজকুমারী বলল কাঁপা গলায়। কিন্তু হায়, তার মা ছিলেন অনেকটা দূরে, তার পরিচিত যুবকরাও কেউ কাছাকাছি ছিল না, একজন এ্যাডজুটাণ্ট ছাড়া। আমার বিশ্বাস কী ঘটছে সে দেখেছিল, কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে না চেয়ে সে ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

'বেশ, বেশ,' মত্ত ভদ্রলোক অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেনের দিকে চোখ টিপে বলে চলল, আর সেই ক্যাপ্টেন ভাবভঙ্গীতে করতে লাগল তাকে

---

* অনুমতি দিন (ফরাসী ভাষায়)।

উৎসাহিত। ‘আপনার ইচ্ছে নেই, তাই না?.. আবার আপনাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি pour mazure...* হয়ত মনে করছেন আমার নেশা হয়ে গেছে? তাতে ক্ষতি নেই!.. আপনাকে কথা দিচ্ছি এতে আমি আরও ভালো নাচতে পারব...’

আমি দেখতে পেলাম আতঙ্কে ও অপমানে তার প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা।

নেশাগ্রস্ত লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে, শক্ত করে তার হাত ধরে, সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি তাকে চলে যেতে বললাম, কারণ, আমি জানালাম যে রাজকুমারী ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে মাজুর্‌কা নাচবে বলে কথা দিয়েছে।

‘ও, আচ্ছা!.. তা হলে অন্যবার, কেমন!’ হেসে উঠে সে বলল, তারপর তার লজ্জিত সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে ফিরে গেল। তারা তাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

উপহারস্বরূপ আমি পেলাম অর্থপূর্ণ, মধুর এক চাউনি।

তার মা’র কাছে গিয়ে রাজকুমারী জানাল কী ঘটেছে। ভিড়ের মধ্য থেকে আমাকে তার মা খুঁজে বার করলেন ধন্যবাদ জানাবার জন্য। তিনি বললেন যে আমার মাকে তিনি চিনতেন এবং আমার গুটি ছ’য়েক মাসি-পিসীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে।

তিনি বলে চললেন, ‘কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় হয় নি কেন। আপনাকে কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সেটা আপনারই দোষ। বাস্তবিক, আপনি ভারি এড়িয়ে চলেন। আশা করি আমার বৈঠকখানার আবহাওয়া আপনার মনমরা ভাব দূর করবে... তাই না?’

আমি সেই সব ভদ্রতার কথা বললাম এ-ধরনের অবস্থার জন্য প্রত্যেকের ভাঁড়ারেই যা তোলা থাকে।

অনেকক্ষণ ধরে কোয়াড্রিল নাচ চলল।

অবশেষে শুরু হল মাজুর্‌কা। রাজকুমারীর পাশে আমি বসলাম।

আমি একবারও মত্ত ভদ্রলোকের কথা, কিংবা আমার পূর্বতন আচরণ, বা গ্রুশ্‌নিৎস্কির উল্লেখ করলাম না। অপ্রীতিকর ঘটনাটা তার মনের ওপর

---

* মাজুর্‌কা নাচবার জন্যে (বিকৃত ফরাসী ভাষায়)।

যে-ছাপ ফেলেছিল ক্রমশ সেটা মিলিয়ে গেল, উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখচোখ, আর সে মধুরভাবে আলাপ করে চলল। তার কথাবার্তা সূক্ষ্ম, অথচ তার মধ্যে নিজের বুদ্ধি জাহির করার চেষ্টা নেই; আলাপ-আলোচনা অবাধ এবং প্রাণবন্তও, আর তার কয়েকটি মন্তব্য বাস্তবিকই বিজ্ঞোচিত...। নানা জটিলভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে অনেক দিন থেকেই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। মুখ নামিয়ে সে মৃদু আরক্ত হয়ে উঠল।

'আপনি অদ্ভুত মানুষ,' অবশেষে হাসতে বাধ্য হয়ে, তার মখমলের মতো চোখ আমার দিকে তুলে সে বলল।

আমি বলে চললাম, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে আমি চাই নি, কারণ বিরাট এক স্তাবক দল আপনাকে ঘিরে থাকে। ভয় হয়েছিল তারা হয়ত আমাকে আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রাখবে।'

'আপনার ভয় পাবার কারণ নেই। তারা সবাই ভারি একঘেয়ে...'

'তাদের সবাই? নিশ্চয়ই সবাই নয়?'

মনোযোগ দিয়ে আমার দিকে সে তাকাল, যেন কিছু মনে করতে চায়। তারপর আবার মৃদু আরক্ত হয়ে উঠল এবং শেষকালে দৃঢ়স্বরে বলল, 'তারা সবাই-ই!'

'এমন কি আমার বন্ধু গ্রুশ্নিৎস্কিও?'

'তিনি কি আপনার বন্ধু?' সন্দিগ্ধভাবে সে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'তাঁকে অবশ্য একঘেয়ে ধরনের লোক বলা যায় না...।'

'হয়ত তাকে বেচারা বলা যায়, তাই না?' হাসতে-হাসতে আমি বললাম।

'নিশ্চয়ই। আপনার হাসবার কারণ কী? তাঁর অবস্থায় আপনি পড়লে কী করতেন দেখতে ইচ্ছে করে...'

'কেন? আমি ত নিজেও এক সময় য়ুঙ্কার ছিলাম,*) আর বিশ্বাস করুন সেটাই আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়!..'

উনি য়ুঙ্কার নাকি?..' সঙ্গে-সঙ্গে সে প্রশ্ন করল, তারপর এক মুহূর্ত পরে বলল, 'আর আমি ভেবেছিলাম...'

'আপনি কী ভেবেছিলেন?..'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছুই না... ঐ মহিলাটি কে?'

অন্য খাতে কথাবার্তা হতে লাগল। এই প্রসঙ্গ আর উত্থাপিত হল না।

মাজুরকা শেষ হল। আমরা বিদায় নিলাম — আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত। মহিলারা বাড়ি ফিরে গেলেন...। রাত্রির শেষ আহারের জন্য যাবার সময় ভেরনেরের সঙ্গে আমার দেখা হল।

তিনি বললেন, 'আরে, এই তা হলে ঘটেছে! আপনি বলেছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার করে তবেই না আপনি তার সঙ্গে পরিচয় করবেন?'

উত্তরে আমি বললাম, 'তার চেয়ে ভালো কাজ করেছি। নাচের সময় মূর্ছার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছি!..'

'কী হয়েছিল? আমাকে বলুন!..'

'না, আপনাকে অনুমান করতে হবে। পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটছে সবই ত আপনি জানতে পারেন!'

২৩ শে মে

সন্ধে সাতটা নাগাদ বুল্‌ভারে আমি বেড়াচ্ছিলাম। দূর থেকে দেখে গ্রুশ্‌নিৎস্কি আমার কাছে এলো। তার চোখে হাস্যকর আনন্দের দ্যুতি। দৃঢ় মুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরে সে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল:

'পেচোরিন, তোমাকে ধন্যবাদ...। আমার কথাটা বুঝেছ ত?..'

'না, বুঝতে পারি নি। যাই হোক, আমাকে ধন্যবাদ জানাবার কারণ নেই,' উত্তরে আমি বললাম, কারণ বাস্তবিক আমি ভালো কাজ কখনও করি নি।

'কেন, কাল কী হয়েছিল তুমি ভুলে গেছ?.. মেরি আমাকে সব কথা বলেছে...'

'ইতিমধ্যেই পরস্পরকে তোমরা সব মনের কথা বলতে শুরু করেছ নাকি? এমন কি কৃতজ্ঞতার কথাটাও?..'

গম্ভীরভাবে গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলতে লাগল, 'শোনো। বন্ধু থাকতে চাইলে আমার প্রেম নিয়ে তামাসা কোরো না...। তুমি তো জান, তাকে আমি দারুণ ভালোবাসি... আর আমার বিশ্বাস, আমি আশা করি, যে সেও আমাকে ভালোবাসে...। তোমার কাছে একটা অনুরোধ আছে। আজ সন্ধেয় তাঁদের বাড়ি তুমি যাচ্ছ, আমাকে কথা দাও যে সবকিছু তুমি লক্ষ্য করবে। আমি

জানি এ-সব ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা আছে, আর মেয়েদের আমার চেয়ে তুমি ভালো জান...। হায় নারী, নারী! বাস্তবিক কে তাদের চিনতে পারে? হাসির সঙ্গে চাউনির মিল নেই, তাদের কথা আশাও দেয় আকর্ষণও করে, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর দেয় তাড়িয়ে...। মাঝে মাঝে তারা মুহূর্তের মধ্যে তোমার সবচেয়ে গোপনীয় কথা অনুমান করতে পারে, মাঝে মাঝে সবচেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিতটাও ধরতে পারে না...। রাজকুমারীর কথাটাই ধর না: গতকাল আমার দিকে যখন সে তাকাচ্ছিল প্রেমে জ্বলজ্বল করছিল তার চোখদুটো। কিন্তু এখন সে-দুটো জ্যোতিহীন, ঠাণ্ডা...'

উত্তরে বললাম, 'এটার কারণ হয়ত এখানকার জলের প্রতিক্রিয়া।'

'সব সময় তুমি উল্টোটা দেখ... তুমি বস্তুবাদী!' অবজ্ঞাসূচক সুরে সে বলল। 'কিন্তু অন্য বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাক।' এই সস্তা শ্লেষালঙ্কারে খুশি হওয়ায় তার উৎসাহ বেড়ে উঠল।

আটটার পরে একসঙ্গে আমরা রানীর বাড়ি গেলাম।

ভেরার জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখলাম জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতে। আমরা দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলাম। আমরা আসবার অল্পক্ষণ পরেই লিগোভ্স্কিদের বৈঠকখানায় সে এলো। রানী তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন আত্মীয়া বলে। চা এলো। অনেক অতিথি এসেছে। সকলেই এটা-ওটা বলে চলছে। রানীকে খুশি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, নানা হাসির গল্প বললাম এবং কয়েকবার তাঁকে প্রাণ খুলে হাসালাম; তাঁর কন্যাও একাধিকবার হাসতে গিয়েছিল, কিন্তু যে-ভূমিকা নিয়েছে সেটা পরিত্যাগ না করার জন্য সে উক্ত ইচ্ছে দমন করল। কারণ সে মনে করে ক্লান্তির ভাব তাকে ভালো মানায় — আর হয়ত সে ঠিকই ভেবেছে। মনে হয় আমার হাস্য-পরিহাস তাকে স্পর্শ করে নি দেখে গ্রুশ্নিৎস্কি খুব খুশি হয়েছিল।

চা পানের পর আমরা সবাই বসার ঘরে এলাম।

'আমার বাধ্যতায় খুশি হয়েছ, ত ভেরা?' তার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি প্রশ্ন করলাম।

আমার দিকে প্রেম ও কৃতজ্ঞতা ভরা দৃষ্টিতে সে তাকাল। এ-ধরনের দৃষ্টিতে আমি অভ্যস্ত। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন তাতে আমি আন্তরিক আনন্দিত হতাম। তার কন্যাকে রানী লিগোভ্স্কায়া পিয়ানোটার পাশে বসালেন আর প্রত্যেকে তাকে গান গাইতে অনুরোধ করতে লাগল।

আমি কিছুই বললাম না এবং হট্টগোলের সুযোগ নিয়ে ভেরার সঙ্গে আমি এক জানালার কাছে সরে গেলাম। সে জানাল আমাদের দু'জনের সম্পর্কেই দারুণ জরুরি বক্তব্য তার রয়েছে...। দেখা গেল কথাটা নেহাৎই বাজে...।

আমার উদাসীনতায় রাজকুমারী কিন্তু বিরক্ত হল। সে-কথাটা বুঝলাম যখন সে একবার ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার দিকে হানল...। এ ধরনের কথোপকথনের কায়দা আমার খুব ভালোই জানা আছে — মূক অথচ মুখর, ক্ষণস্থায়ী অথচ দারুণ শক্তিশালী!..

সে গান গাইতে লাগল। তার গলাটা ভালো, কিন্তু গাইবার ধরনটা খারাপ... সত্যি কথা বলতে কি আমি শুনি নি। কিন্তু গ্রুশ্‌নিৎস্কি রাজকুমারীর মুখোমুখি পিয়ানোর উপর কনুই রেখে চোখ দিয়ে যেন তাকে গিলতে-গিলতে বারবার বিড়বিড় করতে লাগল, 'Charmant! délicieux!*'

ভেরা বলল, 'শোনো, আমার স্বামীর সঙ্গে তুমি পরিচয় কর আমি চাই না, কিন্তু বয়স্কা রানীর সুনজরে তুমি পড় — এটা আমি চাই; সহজেই এটা তুমি পারবে, তোমার যা ইচ্ছে তা-ই তুমি করতে পার। এখানেই কেবল আমাদের দেখা হবে...'

'অন্য কোথাও নয়?..'

আরক্ত হয়ে সে বলে চলল:

'তুমি জান আমি তোমার ক্রীতদাসী, তোমার অবাধ্য কখনও আমি হতে পারি নি...। এর জন্যে আমি শাস্তিও পাব। কারণ তা হলে তুমি আর আমাকে ভালোবাসবে না! অন্তত আমার সুনাম বজায় রাখা দরকার আমার জন্যে নয়; সে-কথা ত তুমি ভালো করেই জান, কিন্তু অনুগ্রহ করে আগের মতো আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না মিথ্যে দ্বিধা আর উদাসীনতার অভিনয় করে; শীগ্‌গিরই আমি হয়ত মরে যাব, কারণ দিনের পর দিন আমি বুঝতে পারছি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি... কিন্তু তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে-কথা আমি ভাবতে পারি না, আমি ভাবি শুধু তোমারই কথা...। তোমরা, পুরুষরা, বুঝতে পার না একটি চাউনি কিংবা একবার হাত চেপে ধরার মধ্যে কী অসাধারণ আনন্দ পাওয়া যায়... তোমার কাছে শপথ করে বলছি তোমার গলার স্বর শুনলে এমন

---

* চমৎকার! খাসা! (ফরাসী ভাষায়)

গভীর ও আশ্চর্য আনন্দে আমি ভরে উঠি যা কোনো আবেগময় চুম্বন কখনও জাগাতে পারে না।'

ইতিমধ্যে রাজকুমারী মেরির গান শেষ হয়েছে। তার চারিধার থেকে সমবেতকণ্ঠে প্রশংসাধ্বনি ভেঙে পড়ল। সব শেষে তার কাছে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে অতি সাধারণ মন্তব্য করলাম।

ঠোঁট ফুলিয়ে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে সে অভিবাদন করল।

'এটা একেবারে খোশামোদের কথা,' সে বলল, 'কারণ আপনি একেবারেই শুনছিলেন না। হয়ত গান আপনার ভালো লাগে না?'

'ঠিক উল্টো... ভালো লাগে, বিশেষ করে নৈশভোজের পর।'

'গ্রুশ্‌নিৎস্কি যখন বলেন যে আপনার পছন্দ একেবারে গদ্যময়, তখন ঠিকই বলেন... এমন কি আমিও দেখছি ভোজনবিলাসীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই সঙ্গীত আপনার ভালো লাগে...'

'আবার ভুল করছেন। আমি ভোজনবিলাসী নই, আমার হজম-শক্তিও দুর্বল। তা সত্ত্বেও নৈশভোজের পর সঙ্গীত ঘুম পাড়িয়ে দেয় এবং নৈশভোজনের পর সামান্য ঘুম স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। অতএব ডাক্তারী মতে সঙ্গীত আমি ভালোবাসি। সন্ধের দিকে উল্টো প্রতিক্রিয়া হয় — সঙ্গীত আমার স্নায়ুমণ্ডলীকে অতিশয় উত্তেজিত করে, ফলে হয় অত্যন্ত বিষণ্ণ অথবা অত্যন্ত ফুর্তি বোধ করি। ও দুটো জিনিসই ক্লান্তিজনক, কারণ বিষণ্ণবোধ অথবা ফুর্তি করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তা ছাড়া সবাইকার মাঝখানে বিষণ্ণবোধ করা হাস্যকর এবং অত্যন্ত ফুর্তির ভাব দেখানো সুরুচির পরিচায়ক নয়...'

আমার কথা শেষ করার জন্য অপেক্ষা না করে সে উঠে গ্রুশ্‌নিৎস্কির পাশে গিয়ে বসল। ভাবালু ও আবেগময় কথাবার্তায় তারা প্রবৃত্ত হল। তার বিজ্ঞ কথাবার্তায় মনে হল রাজকুমারী সায় দিচ্ছে অনেকটা অন্যমনস্কভাবে এবং খানিক নিরর্থকভাবে, যদিও সে ভান করছিল মন দিয়ে শোনার। গ্রুশ্‌নিৎস্কি থেকে-থেকে তার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছিল। রাজকুমারীর বিচলিত চোখে অন্তর্দ্বন্দ্বের যে ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছিল তার কারণ আবিষ্কার করতে সে চাইছে...

কিন্তু মোহিনী রাজকুমারী, তোমার গোপন কথা আমি জেনে ফেলেছি, অতএব সাবধান! আমার অহঙ্কারে আঘাত করে একই মুদ্রায় আমায় তুমি

শোধ দিতে চাও — কিন্তু এতে তুমি সফল হবে না! আর আমার বিরুদ্ধে যদি তুমি যুদ্ধ ঘোষণা কর আমি কিন্তু তা হলে নির্মম হয়ে উঠব।

সেই সন্ধেয় কয়েকবার তাদের আলাপ-আলোচনায় যোগ দেবার চেষ্টা ইচ্ছে করেই আমি করলাম। কিন্তু সে নীরসভাবে আমার মন্তব্যগুলোর বিরোধিতা করে চলল। অবশেষে বিরক্তভাব দেখিয়ে আমি সরে গেলাম। রাজকুমারীর ভঙ্গী হয়ে উঠল বিজয়িনীর মতো, গ্রুশ্‌নিৎস্কির বিজয়ীর। বন্ধুরা, তোমরা বিজয়োল্লাস কর যতক্ষণ পার...। বেশী দিন তোমরা উল্লাস করতে পারবে না!.. কী ঘটবে? আমার মনে একটা ভাবী আভাস আসছে...। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হবার পর নির্ভুলভাবে আমি বলতে পারি তারা আমার প্রেমে পড়বে কি না...

বাকি সন্ধেটা আমি ভেরার সঙ্গে কাটালাম। অতীতের কথা আমরা প্রাণভরে বললাম...। বাস্তবিক আমি জানি না কেন আমাকে সে এত ভালোবাসে। বিশেষ করে সে-ই যখন একমাত্র মেয়ে যে আমার নিকৃষ্টতম দোষ আর মন্দ কামনার কথা অবহিত হয়ে আমাকে সম্পূর্ণ চিনেছে...। বাস্তবিক, মন্দের কি এমনই আকর্ষণী শক্তি?..

গ্রুশ্‌নিৎস্কির সঙ্গে সেখান থেকে বেরুলাম। বাইরে আমার হাতটা ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল:

'ভালো কথা, কী বুঝছ?'

বলতে চেয়েছিলাম, 'তুমি একটা গাধা,' কিন্তু আমি আত্মসংবরণ করে শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম।

২৯শে মে

এ-কটা দিন আমার নিজের পদ্ধতিভ্রষ্ট হই নি। আমার কথাবার্তায় রাজকুমারী আনন্দ পেতে শুরু করেছে। আমার জীবনের কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী তাকে বলেছি। আমাকে সে অসাধারণ লোক বলে মনে করতে শুরু করেছে। পৃথিবীর সব জিনিস নিয়েই আমি বিদ্রূপ করি, বিশেষত ভাবাবেগ নিয়ে। এতে সে ভয় পেতে শুরু করেছে। আমার সামনে গ্রুশ্‌নিৎস্কির সঙ্গে ভাবাবেগ নিয়ে আলোচনা করতে সে সাহস করে না। ইতিমধ্যেই কয়েকবার সে বিদ্রূপভরে হেসে গ্রুশ্‌নিৎস্কির কথার জবাব দিয়েছে। তা সত্ত্বেও যখনই গ্রুশ্‌নিৎস্কি তার কাছে এসেছে আমি বিনীত ভাব দেখিয়ে

তাদের দু'জনের কাছ থেকে সরে এসেছি। প্রথমবার যখন ও-রকম করেছিলাম রাজকুমারী খুশি হয়েছিল কিংবা প্রসন্ন হবার ভান করেছিল; দ্বিতীয়বার আমার ওপর উঠেছিল চটে, আর তৃতীয় বারের বার গ্রুশ্‌নিৎস্কির ওপর।

গতকাল আমাকে সে বলেছে, 'আত্মাভিমান জিনিসটা আপনার মধ্যে অত্যন্ত কম। কেন আপনি মনে করেন গ্রুশ্‌নিৎস্কির সঙ্গ আমার ভালো লাগে?'

আমি উত্তর দিয়েছিলাম যে বন্ধুর আনন্দের জন্য নিজের আনন্দকে আমি বলি দিচ্ছি...

'আর আমার আনন্দকেও,' সে যোগ করেছিল।

তার দিকে একাগ্র হয়ে চেয়ে আমি গম্ভীর ভাব দেখালাম। তারপর বাকি দিনটা তার সঙ্গে কথা বললাম না...। গত সন্ধেয় তাকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল, আর আজ সকালে কুয়োটার কাছে সে তাকাচ্ছিল আরও সতৃষ্ণ নয়নে। তার কাছে যখন এলাম অন্যমনস্ক হয়ে গ্রুশ্‌নিৎস্কির কথা সে শুনছিল। মনে হচ্ছিল গ্রুশ্‌নিৎস্কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বলছিল। কিন্তু আমাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে মন খুলে সে হাসতে লাগল (খানিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে), আর এমন ভাব দেখাল আমাকে যেন সে লক্ষ্য করে নি। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম; তার সঙ্গীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দু'বার সে হাই তুলল। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই: গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে নিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আরও দু'দিন তার সঙ্গে আমি কথা বলব না।

৩ রা জুন

প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করে থাকি তরুণী মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে আমি চাই না আর যাকে আমি কোন দিন বিয়ে করব না কেন ক্রমাগত তার হৃদয় জয় করার চেষ্টা করি? কেন এই মেয়েলি ছলাকলা? ভেরা আমাকে যে-রকম ভালোবাসে রাজকুমারী মেরি কোনো দিন আমাকে সে-রকম ভালোবাসবে না। সে যদি অজেয় সুন্দরী হত তা হলে হয়ত কাজটার দুরূহতা প্রলুব্ধ করতে পারত...

কিন্তু একেবারেই সে-রকম নয়! অতএব যে অশান্ত প্রেমের নেশা প্রথম যৌবনে আমাদের যন্ত্রণা দেয়, এক মেয়ের কাছ থেকে অন্য মেয়ের কাছে

নিয়ে যায়, যতক্ষণ না এমন একজনের দেখা পাই যে আমাদের বরদাস্ত করতে পারে না — এটা সে-রকম নয়। এই হল আমাদের একনিষ্ঠতার আরম্ভ — আসল অশেষ প্রেম, যাকে অংকশাস্ত্র মতে আঁকা যায় একটি বিন্দু থেকে মহাশূন্যের দিকে একটি সরল রেখা টেনে, এই অসীমতার গোপন তথ্য নিহিত আছে কেবল তার লক্ষ্যস্থলে পেঁছবার অসম্ভবতার মধ্যে, অর্থাৎ একেবারে সমাপ্তিতে।

কী আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে? গ্রুশ্‌নিৎস্কির ওপর ঈর্ষা? বেচারা! এটা তার প্রাপ্য নয়। কিংবা এটা কি সেই বিদ্বেষপরায়ণ অথচ অদম্য তাড়নার ফল যেটা চায় কোনো মানুষের আনন্দিত বিভ্রমকে নষ্ট করতে, কিংবা যখন সে মরিয়া হয়ে আমাদের প্রশ্ন করে কোন আদর্শে তার আস্থা রাখা দরকার তখন তাকে এই নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে তুচ্ছ তৃপ্তি পেতে:

'বন্ধু, আমার বেলাতেও ঠিক এ-রকমটিই ঘটেছিল। অথচ তুমি ত দেখতে পাচ্ছ আমার আহার-নিদ্রা ভালোই হচ্ছে, আর আমি আশা করি হৈচৈ এবং অশ্রু বিসর্জন না করে মরতেও পারব!'

কিন্তু তবুও যে তরুণ জীবন সবে মুকুলিত হতে শুরু করেছে তাকে উপভোগ করার আনন্দের সীমা নেই। এটা যেন সেই ফুলের মতো যার মধুরতম সৌরভ সূর্যের প্রথম রশ্মির দিকে উঠে যায়; প্রয়োজন ঠিক সেই মুহূর্তেই তাকে তুলে প্রাণভরে তার সৌরভ বুকে টেনে নেবার পর ফেলে দেওয়া এই ভরসায় যে অন্য কেউ হয়ত তাকে কুড়িয়ে নেবে। আমার মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি এই অতৃপ্ত লালসা, যে লালসা পথে যা-কিছু পড়ে সর্বকিছুই ব্যগ্রভাবে গিলে ফেলে। অন্যদের আনন্দ-বেদনাকে আমি শুধু দেখি আমার আধ্যাত্মিক শক্তির খাদ্য হিসেবে। ভাবাবেগে এখন আর আমি পাগলের মতো হই না, আমার সব উচ্চাশা ঘটনাচক্রে ধূলিসাৎ হয়েছে, অথচ প্রকটিত হয়ে উঠেছে অন্য রূপে। কারণ উচ্চাশা শক্তির লোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি সবচেয়ে আনন্দ পাই চারিপাশের সর্বকিছুকে আমার ইচ্ছার বশীভূত করতে পারলে। অন্যদের মনে প্রেম, ভক্তি এবং ভয়ের অনুভূতি জাগানোই কি একাধারে ক্ষমতার আর তার বিজয়ের চরম নিদর্শন নয়? কারুর মনে আনন্দ বা বেদনা জাগানো, যখন তা জাগাবার বিন্দুমাত্র অধিকার আমাদের নেই — আমাদের অহঙ্কারের এটাই কি মধুরতম মূল্য নয়? আর আনন্দই বা কী? অহঙ্কার পরিতৃপ্ত হওয়া। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে আমি বেশী ভালো আর শক্তিমান বলে মনে করতে পারলেই আমি

খুশি। প্রত্যেকেই আমাকে ভালোবাসলে নিজের মধ্যে ভালোবাসার অনন্ত উৎস আমি খুঁজে পাব। মন্দের জন্ম মন্দ থেকে; প্রথম বেদনার অনুভূতি থেকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়া কী আনন্দের। মন্দের পরিকল্পনা মানুষের মনে শিকড় বিস্তার করতে পারে না যদি না সেটাকে সে কাজে লাগাতে চায়। কে যেন বলেছিলেন যে ভাবনাগুলোর জৈব সত্তা আছে। তাদের জন্ম সেগুলোকে রূপায়িত করে, আর এই রূপ হল কাজ। যার মনে বেশী ভাবনার জন্ম অন্যদের চেয়ে সে বেশী প্রাণবন্ত, আর এ-কারণেই প্রতিভাবান পুরুষদের আপিসের চেয়ারে বন্দী করে রাখলে হয় তাদের মৃত্যু হবে নয়ত তারা হয়ে যাবে উন্মাদ -- যেমন শক্তিশালী লোকের মৃত্যু হয় সন্ন্যাস-রোগে, যদি সে অলস ও পবিত্র জীবন যাপন করে।

ভাবনার বিকাশের প্রথম স্তর ছাড়া আবেগগুলো বেশী কিছু নয়। তরুণ হৃদয়ে তাদের স্থান। যে লোক মনে করে যে আবেগগুলো আজীবন তাকে দোলা দেবে সে নির্বোধ। অনেক প্রশান্ত নদীর জন্ম বিক্ষুব্ধ ঝর্ণা থেকে, কিন্তু একটিও ফেনায়িত হয়ে লাফাতে-লাফাতে সমুদ্রে পেঁছয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রশান্তি হল ভয়ংকর অথচ সুপ্ত শক্তির লক্ষণ। চিন্তার এবং আবেগের পূর্ণতা ও গভীরতার মধ্যে প্রচণ্ড তাড়নার স্থান নেই, কারণ আনন্দ-বেদনার মধ্যে আত্মা কী ঘটছে সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন এবং জানে এ-রকমই নিশ্চয় ঘটবে বলে। সে জানে তুফান না থাকলে সূর্যের ক্রমাগত উত্তাপ তাকে শুকিয়ে দেবে। নিজের জীবন দ্বারাই সে অনুপ্রাণিত হয়, মা যেমন নিজের প্রিয় সন্তানকে মানুষ করে আর শাসন করে সেইভাবেই নিজেকে সে গড়ে তোলে। এই ধরনের চরম আত্ম-জ্ঞানের অবস্থাতেই কেবল ঐশ্বরিক বিচারের কথা মানুষ বুঝতে পারে।

এই পৃষ্ঠা আবার পড়ে দেখলাম আমার বিষয়-বস্তু থেকে অনেক দূর সরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছি...। কিন্তু তাতে কী আসে-যায়?.. কারণ এই দিনপঞ্জী লিখছি আমার জন্য, অতএব যা-কিছুই লিখি না কেন ভবিষ্যতে একদিন আমার কাছে সেগুলো মূল্যবান স্মৃতি হয়ে উঠবে।

. . . .

গ্রুশ্‌নিৎস্কি এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল — সে কমিশন পেয়েছে। আমরা কিছু শ্যাম্পেন পান করলাম। তার খানিক পরেই ডাঃ ভের্‌নের হাজির হলেন।

তিনি গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে বললেন, ‘আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি না।’

‘কেন?’

‘কারণ সৈনিকের গ্রেটকোটেই আপনাকে সুন্দর মানায়। আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে পদাতিক বাহিনীর অফিসারের পোশাকের স্থানীয় ছাঁটে আপনার চেহারাকে বেশী আকর্ষণী করে তুলবে না...। জানেন ত, এতদিন আপনার বৈশিষ্ট্য ছিল, এখন থেকে আপনি একেবারে সাধারণ হয়ে উঠবেন।’

‘আপনি যা-ই বলুন না কেন ডাক্তার, আমার ফুর্তিতে আপনি বাধা দিতে পারবেন না, উনি জানেন না,’ গ্রুশ্‌নিৎস্কি আমার কানে ফিসফিস করে বলে চলল, ‘এই সব অফিসারের চিহ্নগুলো আমার মধ্যে কী আশাই না জাগিয়েছে...। ওরে আমার চিহ্নগুলো! তোদের তারাগুলো পথ-দেখানো ছোটো-ছোটো তারা...। না, না! আমি এখন সম্পূর্ণ সুখী।’

‘পাহাড়ের গহ্বরের ভিতরকার হ্রদের কাছে রেড়াতে আমাদের সঙ্গে আসবে নাকি?’ আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

‘না, না! যতক্ষণ না আমার নতুন পোশাক তৈরি হয় ততক্ষণ কিছুতেই রাজকুমারীর সামনে বেরুব না।’

‘তোমার সৌভাগ্যের কথা তাকে কি বলব?..’

‘দয়া করে বোলো না...। তাকে আমি অবাক করে দিতে চাই...’

‘যাই হোক বল, তার সঙ্গে কী রকম এগুচ্ছ?’

অস্বস্তি পেয়ে সে খানিক ভাবল। ব্যাপারটা নিয়ে গর্ব করে মিথ্যে কথা বলতে সে চাইছিল। কিন্তু তার অন্তঃকরণ বাধা দিল। আবার সত্যি কথাটা স্বীকার করতেও তার লজ্জা হল।

‘তুমি কি মনে কর যে সে তোমার প্রেমে পড়েছে?..’

‘আমার প্রেমে পড়েছে? দোহাই পেচোরিন, তোমার মাথায় কী সব কথাই না ঘোরে!.. এত তাড়াতাড়ি কী করে তা আশা করা যায়?.. আর যদিই বা সে পড়ে থাকে, কোনো ভদ্রমহিলা সে-কথা বলবে না...’

‘ভালো, ভালো! হয়ত তুমি মনে কর যে ভদ্রলোকদেরও উচিত আবেগকে গোপন করা?..’

‘শোনো বন্ধু, সব কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে হয়। অনেক কথাই মুখে বলতে নেই, অনুমান করে নিতে হয়...’

'ঠিক কথা... শুধু চোখে যে-ভালোবাসার কথা জানতে পারা যায় তা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না, কিন্তু কথা...। সাবধান গ্রুশ্‌নিৎস্কি, সে তোমাকে ঠকাচ্ছে...'

'সে?..' আকাশের দিকে চোখ তুলে আত্মতুষ্টির হাসি হেসে সে বলল। 'তোমাকে দেখে মায়া হয়, পেচোরিন!..'

সে চলে গেল।

সন্ধেয় বেশ বড় গোছের এক দল হেঁটে চলল পাহাড়ের গহ্বরের ভেতরকার হ্রদের দিকে।

স্থানীয় পণ্ডিতদের মতে এই পাহাড়ের গহ্বরটা এক নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির মুখ ছাড়া অন্য কিছু নয়। শহর থেকে এক ভার্স্ট দূরে মাশুকের ঢালু দিকে সেটা রয়েছে। ঝোপঝাড় আর উঁচু পাথরের ভেতর দিয়ে এক সরু আঁকাবাঁকা পথ ধরে সেখানে পেঁছুতে হয়। পাহাড়ের ওপর উঠবার সময় রাজকুমারীর দিকে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম, আর সমস্ত পথ সে হাত ছাড়ল না।

পরচর্চা দিয়ে আমাদের আলাপ শুরু হল। উপস্থিত এবং অনুপস্থিত আমাদের পরিচিতদের নিয়ে আমি কথা শুরু করলাম, প্রথমে বললাম তাদের চরিত্রের হাস্যকর দিকের কথা, পরে তাদের খারাপ দিকের। আমার মধ্যে বিদ্বেষ চাগিয়ে উঠল। উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করে শেষ করলাম আসল বিদ্বেষের সঙ্গে। প্রথমে সে মজা পাচ্ছিল, শেষটায় ভয় পেয়ে গেল।

'আপনি সাঙ্ঘাতিক লোক,' সে বলল। 'আপনার বাক্যবাণের চেয়ে বনের মধ্যে আমি বরঞ্চ খুনীর ছুরিই বেশী পছন্দ করব...। আপনার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ — যদি কখনও আমার সম্বন্ধে আপনি খারাপ কিছু বলতে চান, তার বদলে বরং একটা ছুরি দিয়ে আমাকে মেরে ফেলবেন। আমার বিশ্বাস কাজটা করা আপনার পক্ষে খুব কষ্টকর হবে না।'

'আমাকে দেখে কি খুনী বলে মনে হয়?..'

'তার চেয়েও আপনি খারাপ...'

মুহূর্তের জন্য ভেবে গভীরভাবে আহত হবার ভাব দেখিয়ে আমি বলে চললাম:

'হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে আমার কপালে এইটাই জুটেছে। আমার চেহারার মধ্যে যে-মন্দ নেই সে-মন্দের লক্ষণগুলোই সবাই দেখেছে। কিন্তু যে-হেতু লোকে সেগুলোকে দেখতে আশা করেছিল, সেহেতু বাস্তবিকই তারা

আত্মপ্রকাশ করল। আমার প্রকৃতি বিনীত বলে লোকে বলত আমি ধূর্ত, ফলে আমি চাপা হয়ে গেলাম। ভালো এবং মন্দ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত সচেতন ছিলাম, কিন্তু আদরের বদলে আমাকে অপমান সইতে হল, তাই আমি হয়ে উঠলাম বিদ্বেষপরায়ণ। অন্য ছেলেরা যখন ফুর্তি আর গল্প করত তখন আমি মুখ ভার করে থাকতাম। মনে-মনে তাদের চেয়ে নিজেকে ভালো বলে জানতাম, কিন্তু সবাই ভাবত তাদের চেয়ে আমি খারাপ। ফলে আমি হিংসুটে হয়ে উঠলাম। পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসতে আমি প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু কেউই আমাকে বুঝল না। তাই আমি ঘৃণা করতে শিখলাম। আমার নিরানন্দ যৌবন নিজের এবং সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে কেটেছে। ঠাট্টা শোনার ভয়ে আমার ভালো গুণগুলোকে হৃদয়ের গভীরতম জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছিলাম, সেখানেই সেগুলোর মৃত্যু ঘটেছে। আমি সত্যি কথা বলতাম, কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করত না, তাই আমি কপটতার আশ্রয় নিলাম। সমাজ এবং তার কলকব্জাকে জানবার পর আমি শিখলাম কী করে বাঁচতে হয়, আর দেখলাম অন্যরা সে-রকম কোনো দক্ষতা ছাড়াই কী রকম সুখে আছে, যে-অনুগ্রহ পাবার জন্যে আমি অমন কষ্ট করেছিলাম বিনামূল্যে সেগুলোই তারা কেমন ভোগ করছে। তখনই আমার বুকে হতাশা দেখা দিল — সে-ধরনের হতাশা নয় যাকে পিস্তলের নল দিয়ে সারানো যায়; অমায়িক হাসি এবং শিষ্ট চেহারার নীচে এক ঠাণ্ডা আর দুর্বল নৈরাশ্য লুকিয়ে রইল। আমি নৈতিক পঙ্গু হয়ে উঠলাম। আমার আত্মার অর্ধেকটা আমি হারালাম, কারণ সেটা শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে গিয়েছিল আর সেটাকে কেটে আমি ফেলে দিয়েছিলাম। এদিকে অন্য অর্ধেকটা স্পন্দিত হয়ে উঠল, বেঁচে রইল, যে-কেউ আসে তাকেই সেবা করতে শিখল। কেউ এটা লক্ষ্য করল না, কারণ কেউই সন্দেহ করে নি মৃত অপরাধটা আছে বলে। আপনি কিন্তু সেটার স্মৃতি আমার মনে জাগিয়েছেন, আর এখন যে-কথাগুলো বললাম সেগুলো হল সেটার কবরের ওপরকার লেখাগুলো আপনাকে পড়ে শোনানো। অনেকেই মনে করেন কবরের ওপরকার লেখাগুলো হাস্যকর, কিন্তু আমি তা মনে করি না, বিশেষ করে যখন মনে হয় সেগুলোর নীচে কী রয়েছে। অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত হতে আপনাকে বলছি না। যে-কথাগুলো বললাম সেগুলো মজার বলে মনে হলে দয়া করে হাসুন। আপনাকে কিন্তু জানিয়ে রাখছি যে আমি তাতে বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হব না।'

সেই মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হল, আর আমি দেখলাম তার

চোখ জলে টলমল করছে। আমার হাতের মধ্যে তার হাতটা কেঁপে উঠল, গালদুটো তার টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। আমার জন্য তার দুঃখ হয়েছে! সমবেদনা — সেই আবেগ, যার কাছে সহজেই মেয়েরা অভিভূত হয়ে পড়ে, তার অনভিজ্ঞ হৃদয়ে নখরাঘাত করেছে। সমস্ত পথ সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল, কারও সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করল না — আর বাস্তবিক সেটা এক দারুণ শুভ লক্ষণ!

পাহাড়ের গহ্বরের ভিতরকার হ্রদের কাছটায় আমরা পেঁাছলাম। অন্যান্য মহিলারা তাঁদের সঙ্গীদের ছেড়ে দিয়েছেন, সে কিন্তু আমার হাত ছাড়ল না। স্থানীয় সৌখীন ছোকরাদের হাসি-তামাসায় সে ফুর্তি পেল না; যেখান থেকে গভীর খাদ শুরু হয়েছে তার একেবারে ধারে সে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তাতে সে ভয় পেল না, যদিও অন্যান্য মহিলারা আর্তনাদ করে চোখ বুজে ফেললেন।

ফেরার পথে আমাদের সেই বিষণ্ণ কথোপকথন আমি আর উত্থাপন করলাম না। আমার সাধারণ প্রশ্ন আর রসিকতার সংক্ষিপ্ত ও অন্যমনস্ক উত্তর সে দিতে লাগল।

অবশেষে তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, ‘আপনি কখনও প্রেমে পড়েছিলেন?’

এক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকাল, বাঁকাল তার মাথা, তারপর আবার গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল কিছু একটা সে বলতে চায়, কিন্তু জানে না কোনখান থেকে শুরু করতে হবে। তার বুক জোরে-জোরে ওঠা-নামা করতে লাগল...। আর বাস্তবিক মসলিনের আস্তিন সামান্যই প্রতিবন্ধক, আমার হাত থেকে তার হাতের মধ্যে এক বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলে গেল; অধিকাংশ ভাবাবেগের সূত্রপাত এইভাবেই হয়ে থাকে। প্রায়ই নিজেদের আমরা প্রতারণা করি, যখন ভাবি কোনো মেয়ে ভালোবাসছে আমাদের শারীরিক বা নৈতিক গুণের জন্য। সত্যি বটে যে তারা জমি তৈরি করে, প্রস্তুত করে তার হৃদয়কে পবিত্র অগ্নি গ্রহণ করার জন্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম স্পর্শই সমাধান করে সমস্ত প্রশ্নের!

‘আজ আমি খুব অমায়িক ব্যবহার করেছি, তাই না?’ বেরিয়ে ফেরার পর অস্বাভাবিক হাসি হেসে রাজকুমারী বলল।

আমরা বিদায় নিলাম।

নিজের ওপরে নিজেই সে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। নিজেকে সে দোষ দিচ্ছে ঔদাসীন্যের জন্য...। এই ত প্রথম এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয়

বিজয়চিহ্ন! কাল আমাকে সে পুরস্কার দিতে চাইবে। এ-সমস্তই আমার মুখস্থ — আর সে-কারণেই এত একঘেয়ে।

৪ঠা জুন

আজ ভেরার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ঈর্ষা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে আমাকে প্রায় সে মেরে ফেলেছে। মনে হয় রাজকুমারী তার মনের কথা ভেরাকে বলতে স্থির করেছিল। বাস্তবিক, ঠিক লোককেই বেছেছিল!

'এ সবের ফল কী হবে আমি জানি,' ভেরা আমাকে বলল। 'আমাকে যদি এখন পরিষ্কার করে বল যে তাকে ভালোবাস তা হলে ভালো হয়।'

'কিন্তু ধর, যদি তাকে ভালো না বাসি?'

'তা হলে তার পেছন-পেছন ঘুরছ কেন? কেন তার মনের শান্তি নষ্ট করছ, কেন তার কল্পনাকে উত্তেজিত করছ?.. তোমাকে আমি খুব ভালো করে চিনি! যদি চাও তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি তা হলে এখান থেকে এক সপ্তাহ পরে কিস্‌লভোদ্‌স্ক'এ*) যেও। পরশু সেখানে আমরা যাব। রানী লিগোভ্‌স্কায়া এখানে আরও কিছুদিন থাকছেন। সেখানে আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িটা ভাড়া কোরো। ফোয়ারার কাছের বড় বাড়িটার মেজানাইন* তলায় থাকব। নীচের তলায় রানী লিগোভ্‌স্কায়া থাকবেন। পাশেই একই মালিকের আর একটি বাড়ি আছে, এখনও সেটা ভাড়া হয় নি...। তুমি আসবে?..'

আমি কথা দিলাম, আর সেদিনই একজন লোক পাঠালাম আমার জন্য বাড়ি ভাড়া করতে।

সন্ধে ছ'টায় গ্রুশ্‌নিৎস্কি এলো। সে জানাল তার পোশাক পরের দিন তৈরি হয়ে যাবে — নাচের আসরের ঠিক আগেই।

'অবশেষে তার সঙ্গে সমস্ত সন্ধেটা আমি নাচতে পারব...। আর প্রাণভরে গল্প করব,' সে বলল।

'কবে নাচের আসর হবে?'

'কাল। তুমি জানতে না? খুব জাঁকালো ব্যাপার। স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা এটার আয়োজন করছেন...'

---

* বাড়ির ওপরকার আধা-তলা। — সম্পাঃ

‘চল, বুলভারে যাওয়া যাক...’

‘না, না, এই কদাকার গ্রেটকোটটা পরে নয়...’

‘কী বললে? তুমি কি এটাকে আর পছন্দ কর না?..’

একাই বেরুলাম। রাজকুমারী মেরির সঙ্গে দেখা হবার পর আমার সঙ্গে মাজুর্কা নাচবার অনুরোধ জানালাম। সে বিস্মিত ও খুশি হল।

‘ভেবেছিলাম দরকার পড়লেই বুঝি আপনি নাচেন — গতবার যেমন দেখেছিলাম,’ ভারি মিষ্টি হেসে সে বলল...

গ্রুশ্‌নিৎস্কির অনুপস্থিতি সে লক্ষ্য করেছে বলে একেবারেই মনে হল না।

তাকে বললাম, ‘কাল আপনি এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখে খুশি হবেন।’

‘কী সেটা?..’

‘সেটা গোপনীয় কথা...। আপনি নিজেই নাচের আসরে দেখতে পাবেন।’

রানী লিগোভ্‌স্কায়ার বাড়িতে সন্ধেটা কাটালাম। ভেরা আর ভারি মজাদার এক বৃদ্ধ ছাড়া আর কোনো অতিথি ছিল না। আমার মেজাজ খুব ভালো ছিল, নানা কাল্পনিক গল্প বললাম। আমার বিপরীত দিকে রাজকুমারী মেরি বসেছিল। আমার বাজে গল্পগুলো সে এত গভীর ও একাগ্রতার সঙ্গে, এমন কি সহানুভূতির সঙ্গে শুনছিল যে ক্ষণিক মর্মপীড়া অনুভব করলাম। তার চাপল্য, তার ছলাকলা, তার খামখেয়ালী ভাব, তার চেহারার ঔদ্ধত্য, তার বিদ্রুপের হাসি আর তার অমনোযোগী দৃষ্টি কোথায় গেল?..

ভেরা সবকিছুই লক্ষ্য করল। তার পাণ্ডুর মুখের উপর গভীর বিষাদের ছায়া প্রতিফলিত হল। জানালার ধারে আলো থেকে আড়ালে বিরাট এক আরাম-কেদারায় সে বসেছিল...। তার জন্য দুঃখ হল আমার।

তারপর আমাদের বন্ধুত্ব ও প্রেমের নাটকীয় কাহিনীর সবটা বললাম, স্বভাবতই কাল্পনিক নাম ব্যবহার করতে হল।

এত হৃদয়গ্রাহীভাবে আমাদের কোমল অনুভূতি, আশঙ্কা এবং গভীর আনন্দের কথা আমি বললাম এবং তার আচরণ ও চরিত্রের এমন অনুকূল চিত্র আঁকলাম যে রাজকুমারী মেরির সঙ্গে আমার প্রেমের অভিনয়কে ক্ষমা না করে সে পারল না।

উঠে পড়ে আমাদের কাছে এসে বসে আবার সে খুশি হয়ে উঠল... এবং রাত্রি দুটোর সময়েই কেবল আমাদের মনে পড়ল যে ডাক্তারের আদেশ এগারটার মধ্যে শুয়ে পড়া।

৫ই জুন

নাচের আসরের আধ-ঘণ্টা আগে পদাতিক বাহিনীর অফিসারের পোশাকের পরিপূর্ণ দীপ্তিতে গ্রুশ্নিৎস্কি আমার বাড়ি এলো। তার জামার তৃতীয় বোতামের সঙ্গে ডবল হাত-চশমা ঝোলানো ব্রোঞ্জের এক চেন আটকানো। এত বড়-বড় সামরিক চিহ্নগুলো সে পরেছে যে সেগুলো ওপরের দিকে দুমড়ে গিয়েছে কিউপিডের ডানার মতো। তার বুটে কিচকিচ শব্দ হচ্ছে। তার বাঁ হাতে বাদামি রঙের এক জোড়া চামড়ার দস্তানা আর টুপি, ডান হাত দিয়ে তার কোঁকড়া চুলকে ছোট-ছোট গুচ্ছে ক্রমাগত পাকিয়ে চলেছে। খানিক বাধো-বাধো ভাবের সঙ্গে আত্মতৃপ্তির ভাব তার মুখের উপর উঠেছে ফুটে। তার উৎসবের বেশভূষা আর দাম্ভিক হাবভাব দেখে আমি হেসে ফেলতাম যদি আমার মতলবের সঙ্গে তা খাপ খেত।

টুপি আর দস্তানাগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার কোটের পিছন দিকটা টেনে-টেনে সে নিজেকে পরিপাটি করে তুলতে লাগল। তার গলাবন্ধের জন্য বিরাট একটা কালো রুমাল উঁচু করে পাকানো, সেটাতে ছোট-ছোট লোম লাগানো। তার উপর ভর দিয়ে রয়েছে তার থুতনি। তার কলার থেকে আধ-ইঞ্চি উঁচু হয়ে রয়েছে রুমালটা। তার মনে হচ্ছিল এই উচ্চতা খুবই কম। টেনে-টেনে কান পর্যন্ত সেটাকে তুলল সে। এই পরিশ্রমে আরক্ত হয়ে উঠল তার মুখ। কারণ সামরিক পোশাকের কোটের কলারটা ভারি আঁট আর অস্বস্তিজনক।

‘লোকে বলছে আজকাল নাকি তুমি আমার রাজকুমারীর পেছন-পেছন সব সময়ে ঘুরছ,’ আমার দিকে না তাকিয়ে খানিক উদাসভাবে সে বলল।

‘আমাদের মতো আহাম্মকদের আবার চা পান!’ আমি বললাম। কথাগুলো অতীতের এক অতি চতুর লম্পটের প্রিয় উক্তি। একদা পুশ্‌কিন তার কথা লিখেছিলেন।*)

‘বল ত, পোশাকটা কি ঠিক হয়েছে?.. জাহান্নামে যাক ইহুদীটা!.. বগলের তলাটা আঁট...। তোমার কাছে এসেন্স আছে?’

'ঈশ্বরের দোহাই, আর বেশী তুমি কী চাও? ইতিমধ্যেই তোমার গা দিয়ে গোলাপ পমেডের গন্ধ বেরুচ্ছে...।'

'তাতে যায় আসে না। আরও খানিক দাও...'

আধ-শিশি সে তার গলাবন্ধ, রুমাল আর জামার আস্তিনে ঢালল।

'নাচতে যাচ্ছ?' সে প্রশ্ন করল।

'না বলেই ত ভাবছি।'

'মনে হচ্ছে রাজকুমারী আর আমাকে মাজুর্‌কা শুরু করতে হবে। বলতে গেলে নাচের একটি ভঙ্গিও চিনি না...'

'মাজুর্‌কা নাচবার জন্যে তাকে অনুরোধ করেছিলে?'

'না, এখনও করি নি...'

'সাবধান, তোমার আগে কেউ যেন না করে বসে...'

'ঠিক বলেছ!' কপাল চাপড়ে সে বলল। 'বিদায়... দরজার কাছে তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।' টুপিটা নিয়ে সে দৌড়ে চলে গেল।

আধ-ঘণ্টা পরে আমিও বেরুলাম। পথগুলো অন্ধকার ও জনশূন্য। ক্লাব-ঘর কিংবা সরাইখানা — যা ইচ্ছে বলতে পারেন — সেখানে ভিড় জমে উঠছে। জানালাগুলো আলোকিত করা হয়েছে। সান্ধ্য বাতাসে সামরিক ব্যাণ্ডের বাজনা ভেসে এলো। বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে ধীরে-ধীরে হেঁটে চললাম। ভাবলাম, বাস্তবিক কি পৃথিবীতে আমার একমাত্র কাজ হল অন্যের আশা চুরমার করা? যেদিন থেকে আমি বাঁচতে আর কাজ করতে শুরু করেছি, যেমন করে হোক ভাগ্য আমাকে জড়িয়ে ফেলেছে অন্যান্য লোকের বিয়োগান্তক নাটকের শেষ অঙ্কের সঙ্গে, আমি না থাকলে কেউ যেন মরতে বা নিরাশ হতে পারে না! সর্বদাই আমি পঞ্চম অঙ্কের চরিত্র, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জল্লাদ বা বিশ্বাসঘাতকের ঘৃণাজনক ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। এই সবের মধ্যে ভাগ্যের উদ্দেশ্য কী?.. আমার ভাগ্য কি পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে মধ্যবিত্ত বিয়োগান্তক নাটকের আর পারিবারিক উপন্যাসের লেখক হওয়া — কিংবা গল্প সরবরাহ করে যাওয়া, ধরা যাক 'রিডার্স লাইব্রেরির'*) জন্য?.. কে জানে?.. এ-ধরনের বহু লোক কি নেই যারা জীবন শুরু করে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট কিংবা লর্ড বাইরনের মতো*) জীবন শেষ করবে বলে, অথচ আজীবন তারা তুচ্ছ কেরানীই থেকে যায়?..

হল-ঘরে ঢুকে পুরুষদের ভিড়ে মিশে গিয়ে আমি লক্ষ্য করে চললাম।

গ্রুশ্‌নিৎস্কি রাজকুমারীর পাশে দাঁড়িয়ে দারুণ আবেগভরে কথা বলে চলেছে। রাজকুমারী তার কথা শুনছে অন্যমনস্কভাবে। হাতপাখাটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে চারিদিকে সে তাকাচ্ছে। তার চেহারায় অধৈর্যের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, আর তার চোখ কাউকে যেন খুঁজছে। নিঃশব্দে তাদের পিছনে এসে দাঁড়ালাম যাতে তাদের কথোপকথন শুনতে পাই।

গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলল, 'আমাকে আপনি গভীর যন্ত্রণা দিচ্ছেন, রাজকুমারী। শেষবার আপনার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে আপনি দারুণ বদলে গেছেন...।'

'আপনিও বদলে গেছেন,' তার উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে সে বলল। গ্রুশ্‌নিৎস্কি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ধরতে পারল না।

'আমি? বদলে গেছি? কখনও না! আপনি ত জানেন তা অসম্ভব। যে-কেউ আপনাকে একবার দেখেছে আপনার দেবীমূর্তি আমরণ তার মনে থাকবে।'

'থামুন...'

'সম্প্রতি যে-কথাগুলো অতবার আপনি শুনতে ভালোবাসতেন এখন কেন তা শুনতে চান না?..'

হাসতে-হাসতে সে উত্তর দিল, 'কারণ পুনরুক্তি আমার ভালো লাগে না...।'

'আমার নিদারুণ ভুল হয়েছে!.. বোকা বলেই আমি ভেবেছিলাম যে অন্তত এই অফিসারের চিহ্নগুলো আমাকে আশা করবার অধিকার দেবে...। বাস্তবিক, বাকি জীবনটা সৈনিকদের সেই জঘন্য গ্রেটকোটটা পরে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভালো হত, যেটার জন্যেই হয়ত আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম...'

'বাস্তবিক, গ্রেটকোটটাই আপনাকে অনেক ভালো মানায়...'

সেই মুহূর্তে আমি এগিয়ে এসে রাজকুমারীকে নত হয়ে অভিবাদন করলাম। সামান্য আরক্ত হয়ে সে দ্রুত বলে চলল:

'মঁসিয়ে পেচোরিন, আপনি কি মনে করেন না ধূসর গ্রেটকোটটাতেই মঁসিয়ে গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে অনেক ভালো মানায়?..'

উত্তরে আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। এই পোশাকে ওকে আরও ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে।'

খোঁচাটা গ্রুশ্‌নিৎস্কির বরদাস্ত হল না, কারণ সব বালকের মতোই নিজের

বয়স বেশী বলে সে দেখাতে চায়। সে মনে করে তার মুখের ওপরকার ভাবাবেগের গভীর রেখাগুলো তার বয়সকে বাড়িয়ে দিয়েছে। অত্যন্ত রাগত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে, মাটিতে পা ঠুকে সে দীর্ঘ পদক্ষেপে চলে গেল।

রাজকুমারীকে আমি বললাম, 'আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে বরাবরই সে অত্যন্ত হাস্যকর ধরনের — তবুও কিছুদিন আগেও তাকে আপনার চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়েছিল... তার ধূসর গ্রেটকোটটায়?..'

সে চোখ নামাল, কিছু বলল না।

সমস্ত সন্ধে ধরে গ্রুশ্‌নিৎস্কি রাজকুমারীর পিছন-পিছন ঘুরল, কখনও নাচল তার সঙ্গে, কখনও বা তার vis-a-vis*। চোখ দিয়ে তাকে যেন সে গিলতে লাগল, ফেলতে লাগল দীর্ঘশ্বাস এবং সানুনয় আবেদন ও ভর্ৎসনা দিয়ে তাকে করে তুলল ক্লান্ত। তৃতীয় কোয়াড্রিল শেষ হবার পর রাজকুমারী তাকে ঘৃণা করতে শুরু করল।

'তোমার কাছ থেকে এটা আমি আশা করি নি,' কাছে এসে আমার হাত ধরে গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলল।

'কোন বিষয়ে কথা বলছ?'

'ওর সঙ্গে তুমি মাজুর্‌কা নাচবে নাকি?' গম্ভীর স্বরে আমাকে সে প্রশ্ন করল। 'আমাকে সেই কথাটা বলেছে...'

'তাতে কী?.. এটা কি গুপ্ত কথা?'

'নিশ্চয়ই না... ওই বেহায়া মেয়ে... ওই ছেনালটার কাছ থেকে এটাই আশা করা উচিত ছিল...। যেতে দাও, আমিও শোধ তুলব!'

'তোমার গ্রেটকোট কিংবা তোমার অফিসারের চিহ্নগুলোর ঘাড়ে দোষ চাপাও, কিন্তু ওকে দোষী করছ কেন? তোমাকে আর যে তার ভালো লাগে না এটা কি তার দোষ?..

'কেন আমাকে সে হাবেভাবে আশা দিয়েছিল?'

'কেন তুমি আশা করেছিলে? কিছু চাওয়া আর সেটা পাবার চেষ্টা করা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু আশা করে কে বসে থাকে?'

শ্লেষের হাসি হেসে সে বলল, 'বাজিটা তুমি জিতেছ, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়।'

মাজুর্‌কা শুরু হল। রাজকুমারী ছাড়া গ্রুশ্‌নিৎস্কি আর কাউকেই আমন্ত্রণ জানাল না, অন্যান্য পুরুষরাও প্রতি মিনিটেই তাকেই বেছে নিতে

---

* সামনা-সামনি (ফরাসী ভাষায়)।

লাগল; স্পষ্টতই এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র — কিন্তু তাতে ভালোই হল। আমার সঙ্গে রাজকুমারী কথা বলতে চেয়েছিল। তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে — ভালোই! এখন সে দ্বিগুণ চাইবে।

দুয়েকবার তার হাতে চাপ দিলাম; দ্বিতীয়বার কোনো কথা না বলে সে হাতটা টেনে নিল।

মাজুর্কা শেষ হবার পর সে বলল, 'আজ রাতে আমার ভালো ঘুম হবে না।'

'এর জন্যে দায়ী গ্রুশ্‌নিৎস্কি।'

'না, না!' আর তার মুখ এত চিন্তাযুক্ত, এত বিষণ্ণ হয়ে উঠল যে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সে-রাত্রেই তার হাত চুম্বন করব।

সবাই চলে যেতে শুরু করল। রাজকুমারীকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করার সময় চট করে তার ছোট্ট হাতটা আমার ঠোঁটে চেপে ধরলাম। চারিদিকে অন্ধকার। কেউই দেখতে পেল না।

নিজের ওপর দারুণ খুশি হয়ে হল-ঘরে ফিরলাম।

বিরাট একটা টেবিলের চারিদিকে বসে তরুণের দল রাত্রির শেষ আহার খাচ্ছিল। গ্রুশ্‌নিৎস্কি ছিল তাদের মধ্যে। আমি প্রবেশ করার সঙ্গে-সঙ্গে তারা চুপ করল। নিশ্চয়ই তারা আমাকে নিয়ে কথা বলছিল। আগের নাচের আসরের পর থেকেই তাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ করে অশ্বারোহীবাহিনীর সেই ক্যাপ্টেন, আমার সঙ্গে কোন ছুতোয় ঝগড়া বাধাতে চাইছিল। এখন মনে হল গ্রুশ্‌নিৎস্কির অধিনায়কত্বে আমার বিরুদ্ধে একটি দল গঠিত হতে চলেছে। তার মধ্যে দারুণ দাম্ভিক আর বেপরোয়া ভাব...

এতে আমি খুব খুশি, কারণ শত্রু আমি ভালোবাসি, যদিও খ্রীষ্টানদের মতো নয়।*) তারা আমাকে ফুর্তি দেয়, আমার রক্তে দোলা দেয়। সর্বদাই সতর্ক থাকা, প্রতিটি চাউনি এবং কথার তাৎপর্য ধরা, অভিপ্রায় অনুমান করা, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, প্রতারিত হবার ভাব দেখানো আর তারপর এক আঘাতে অত কষ্টে সৃষ্ট সমস্ত চাতুরী ও পরিকল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া — একেই আমি বলি জীবন।

খাবার সময় সমস্তক্ষণ ধরে গ্রুশ্‌নিৎস্কি অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে চলল এবং কটাক্ষ বিনিময় করল।

৬ই জুন

আজ সকালে ভেরা তার স্বামীর সঙ্গে কিস্‌লভোদ্‌স্কে চলে গেল। আমি যখন রানী লিগোভ্‌স্কায়ার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম তাদের গাড়ি আমার পাশ দিয়ে গেল চলে। আমাকে উদ্দেশ্য করে সে মাথা নাড়াল; তার চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি।

শেষ পর্যন্ত কাকে দোষ দেওয়া যায়? কেন একলা তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ সে আমাকে দেয় না? ইন্ধন না থাকলে আগুনের মতোই প্রেমও নিভে যায়। হয়ত আমার অনুনয় যেখানে ব্যর্থ, ঈর্ষা সেখানে সফল হবে।

রানীর বাড়িতে পুরো এক ঘণ্টা ছিলাম। মেরি নামে নি — সে অসুস্থ। সন্ধেয় বুল্‌ভারেও তাকে দেখা গেল না। নব-গঠিত দল হাত-চশমার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। বাস্তবিক তাদের ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে! রাজকুমারী যে অসুস্থ এতে আমি খুশি। কারণ কোনো-না-কোনো ছুতোয় তাকে তারা প্রকাশ্যে অপমান করত। গ্রুশ্‌নিৎস্কির চুল এলোমেলো, তাকে বেপরোয়া দেখাচ্ছে। আসলে মনে হচ্ছে তার মন তিক্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে তার অহঙ্কার হয়েছে আহত। কিন্তু কতকগুলো লোককে দেখলে বাস্তবিক মজা লাগে, এমন কি যখন তারা হতাশ হয়ে ওঠে তখনও!..

বাড়ি ফিরে একটা অস্পষ্ট ঔৎসুক্য অনুভব করলাম। তার দেখা পাই নি! তার অসুখ হয়েছে! বাস্তবিক প্রেমে পড়লাম নাকি?.. কী সব বাজে কথা!

৭ই জুন

সকাল এগারোটায় — এই সময়ে রানী লিগোভ্‌স্কায়া সর্বদাই যখন ইয়েরমোলভের স্নানের জায়গায় ঘাম ঝরাতে যান — আমি তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে গেলাম। চিন্তামগ্ন হয়ে রাজকুমারী মেরি জানালায় বসেছিল। আমাকে দেখে সে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

অলিন্দে আমি প্রবেশ করলাম। কাছেপিঠে কেউ নেই। স্থানীয় রীতির স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে নিজের নাম ঘোষিত না করেই আমি বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম।

রাজকুমারীর সুন্দর মুখে নিষ্প্রভ পাণ্ডুর আভা ছড়িয়ে পড়েছে। এক

হাত দিয়ে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে পিয়ানোটার পাশে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতটা মৃদু কাঁপছে। নিঃশব্দে তার কাছে গিয়ে বললাম:

'আমার ওপর রাগ করেছেন?..'

গভীর, কোমল-ক্লান্ত দৃষ্টি-ভরা তার চোখগুলো আমার দিকে তুলে সে মাথা নাড়াল। তার ঠোঁটগুলো চাইল কিছু বলতে, কিন্তু পারল না। চোখগুলো ভরে উঠল তার জলে। একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাত দিয়ে সে মুখ ঢাকল।

তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'আমাকে আপনি সম্মান করেন না!.. আমাকে একলা থাকতে দিন!..'

কয়েক পা পিছিয়ে গেলাম...। চেয়ারে সে আড়ষ্ট হয়ে উঠল, জ্বলতে লাগল তার চোখগুলো...

দরজার হাতলে হাত রেখে থেমে আমি বললাম:

'রাজকুমারী, আমাকে ক্ষমা করুন! না-ভেবে-চিন্তে আমি কাজ করেছি... এ-ঘটনা আর ঘটবে না, আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখব...। আমার মনের মধ্যে এক মুহূর্ত আগে কী হচ্ছিল সে-কথা জানার আপনার কী দরকার? সে-কথা কোনোদিন আপনি জানবেন না, আপনার পক্ষে তা ভালোই। বিদায়।'

বেরিয়ে আসবার সময় মনে হল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ যেন শুনতে পেলাম।

সন্ধে পর্যন্ত মাশুকের নানা অঞ্চলে এলোমেলো ঘুরে বেড়িয়ে, নিজেকে একেবারে পরিশ্রান্ত করে, বাড়ি ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম একেবারে ক্লান্ত হয়ে।

আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভের্নের এলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কথাটা কি সত্যি যে রাজকুমারী মেরিকে আপনি বিয়ে করতে চান?'

'কেন এ-কথা জিগ্গেস করছেন?'

'সমস্ত শহর এটাই আলোচনা করছে। আমার সব রোগীরা এই গুরুতর বিষয় ছাড়া অন্য কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। এই খনিজ-জলের উৎসের জনতা সবকিছুই জানে!'

আমি ভাবলাম, 'এটা গ্রুশ্নিৎস্কির রসিকতা!'

'কথাটা যে কতটা ভিত্তিহীন সেটা আপনার কাছে প্রমাণ করার জন্যে চুপিচুপি আপনাকে জানাব যে কালকেই আমি কিস্লভোদ্স্কে যাচ্ছি...'

'আর রাজকুমারী মেরিও যাচ্ছেন?..'

'না, এখানে আরও এক সপ্তাহ তিনি থাকবেন...'

'তা হলে আপনি বিয়ে করতে চান না?..'

'ডাক্তার, ডাক্তার! আমার দিকে চেয়ে দেখুন: আমাকে কি বর বা সে-জাতীয় কিছু বলে মনে হয়?'

'আমি বলছি না আপনাকে সে-রকম দেখাচ্ছে...। কিন্তু জানেন ত, মাঝে মাঝে এ-রকম ঘটনা ঘটে থাকে,' ধূর্ত হাসি হাসতে-হাসতে তিনি বলে চললেন, 'ভদ্রলোকদের মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়। এমন অনেক স্নেহশীলা মায়ের দল আছেন যাঁরা এ-রকম পরিণাম-ঘটায় বাধা দেন না...। অতএব বন্ধু হিসেবে আপনাকে আরও সাবধান হতে উপদেশ দেব। এখানকার ঝর্ণার কাছের আবহাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। অনেক চমৎকার যুবককে, যাদের কপাল আরও অনেক ভালো হবার কথা, দেখেছি বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে...। বিশ্বাস করুন চাই না-ই করুন — এরা আমার বিয়ে দিতেও চেয়েছিল। এক মফঃস্বলের মা'র চক্রান্ত ছিল সেটা, তাঁর ছিল এক অতিশয় ফ্যাকাশে রঙের মেয়ে। আমার দুর্ভাগ্য, তাঁকে বলেছিলাম যে বিয়ের জল গায়ে পড়লে মেয়েটির স্বাস্থ্য ভালো হবে। ফলে কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখে জল এসে গেল। তিনি তাঁর মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইলেন, সেই সঙ্গে দিতে চাইলেন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি — যতদূর মনে পড়ে তার পরিমাণ পঞ্চাশ ভূমিদাস। যাই হোক আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম বিয়ে করার উপযুক্ত একেবারেই আমি নই...'

সময়মতো আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ভের্নের বিদায় নিলেন।

তিনি যা বললেন তা থেকে বুঝলাম রাজকুমারী এবং আমার সম্বন্ধে শহরে নানা বিদ্বেষপরায়ণ গুজব রটানো হচ্ছে: এর জন্য গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে ভুগতে হবে!

১০ই জুন

কিস্‌লভোদ্‌স্কে তিন দিন হল আমি পেঁাছেছি। হয় কুয়োটার ধারে না হয়ত বেড়াবার জায়গায় ভেরার সঙ্গে প্রত্যহই আমার দেখা হয়। সকালে উঠে জানালার পাশে বসে তার বারান্দাটা দেখি হাত-চশমার ভিতর দিয়ে। অনেক আগে সেজেগুজে আমার সংকেতের জন্য সে অপেক্ষা করে। আমাদের

বাড়িগুলোর কাছ থেকে যে-উদ্যান ঢালু হয়ে নেমেছে কুয়োটার দিকে সেখানে আমাদের সাক্ষাৎ হয় যেন আকস্মিকভাবে। স্বাস্থ্যকর পার্বত্য বাতাসে তার মুখের উপর আরক্ত আভা ফিরে এসেছে, শক্তিও সঞ্চারিত হয়েছে দেহে। মিথ্যেই নারজানকে দানবের মতো শক্তিদায়ী ঝর্ণা লোকে বলে না।*) স্থানীয় অধিবাসীরা বলে থাকে যে কিস্‌লভোদ্‌স্কের বাতাস প্রেমের অনুকূল এবং যে-সমস্ত প্রেমের ঘটনা মাশুকের পদতলে সূচিত হয়েছে সর্বদাই তাদের শেষাংক অভিনীত হয়েছে এখানে। বাস্তবিকই এখানকার সবকিছুই শান্ত; সবকিছুই রহস্যময়। লাইম বীথিকার ঘন ছায়া দুলছে জলস্রোতের ওপর। পাথর থেকে পাথরে সশব্দে এবং সফেন হয়ে সবুজ পর্বতকে দীর্ণ করে ছুটে চলেছে সেই স্রোত। অন্ধকার স্তব্ধ গিরিসংকট এখান থেকে তাদের শাখাপ্রশাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের দীর্ঘ ঘাস এবং শ্বেত এ্যাকেসিয়ার সৌরভে ভরা টাটকা বাতাস বইছে। শীতল ঝর্ণার ক্রমাগত ঘুমপাড়ানি মধুর গান মিশেছে উপত্যকার শেষে। তারপর সেই ঝর্ণা-স্রোত চলেছে পদ্‌কুমক্‌-এ আছড়ে পড়তে*)। খাদের এ-দিকটা বেশী চওড়া। সেটা নেমে গেছে সবুজ নিম্নভূমিতে। তার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে ধুলোয় ভরা এক পথ। যতবারই সে-দিকে তাকাই মনে হয় যেন দেখতে পাই একটা গাড়িকে এগিয়ে আসতে, তার জানালার ভেতর দিয়ে যেন এক আরক্ত-গাল সুন্দর মুখ ঝুঁকে রয়েছে। ইতিমধ্যে সেই পথ দিয়ে অনেক গাড়ি চলে গেছে — কিন্তু সেই বিশেষ গাড়িটির এখনও দেখা নেই। দুর্গ ছাড়িয়ে একটা বস্তি। এখন সেখানে বহুলোক থাকে। আমার বাড়ি থেকে খানিক দূরে এক পাহাড়ের ওপর যে-রেস্তোরাঁটা, সেখান থেকে দু'সারি পপলার গাছের ভেতর দিয়ে সন্ধেবেলায় আলো ঝলমল করে এবং অনেক রাত পর্যন্ত কলরব আর গেলাস ঠোকাঠুকির ঝনঝন শোনা যায়।

এখানকার মতো অন্য কোথাও এত বেশী খনিজ-জল এবং কাখেতীয় মদ লোকেরা পান করে না।

এই দুই কৌশল মেশাতে
অনেকেই আগ্রহী: তবে আমি নই।*)

প্রত্যহই পানশালায় গ্রুশ্‌নিৎস্কি আর তার দলবল মদ্যপান করে। আমাকে এখন সে প্রায়ই অভিবাদনও জানায় না।

মাত্র গতকালই সে পেঁছেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে সে বচসা করেছে তিন জন বৃদ্ধের সঙ্গে, যাঁরা তার আগে স্নান করতে চেয়েছিলেন। মন্দভাগ্য স্পষ্টতই তাকে বিবাদপ্রিয় করে তুলছে।

১১শে জুন

অবশেষে তাঁরা পেঁছেছেন। জানালার পাশে বসে থাকার সময় তাঁদের গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। আমার বুকটা যেন লাফিয়ে উঠল...। এর মানে কি? আমি কি প্রেমে পড়েছি?.. আমি এমন নির্বোধভাবে সৃষ্ট, যে বাস্তবিকই আমার পক্ষে তা সম্ভব।

তাঁদের সঙ্গে আমি নৈশভোজে যোগ দিলাম। রানী লিগোভ্স্কায়া ভারি কোমলভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। কন্যার পাশ-ছাড়া তিনি হলেন না... এটা দুর্লক্ষণ! ভেরা কিন্তু রাজকুমারী মেরিকে ঈর্ষা করে। এ-ধরনের সুষ্ঠু অবস্থা সৃষ্টি করায় শেষ পর্যন্ত আমি সফল হয়েছি! প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত দেবার জন্য মেয়েরা কী না করতে পারে! মনে পড়ছে একটি মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছিল শুধু এই কারণে যে অন্য একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম। মেয়েদের মনের মতো এমন পরস্পরবিরোধী জিনিস আর নেই। কোনোকিছুই মেয়েদের বোঝানো যায় না। এমন অবস্থায় তাদের আনা প্রয়োজন যাতে নিজে থেকেই তারা বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করার পদ্ধতি, যা দিয়ে তারা নিজেদের কুসংস্কারকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে, অতিশয় মৌলিক। তাদের দ্বন্দ্বতত্ত্বের কথা জানতে হলে মন থেকে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত তর্কশাস্ত্রের আইন-কানুনগুলিকে ঝেড়ে ফেলা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাধারণ পদ্ধতি হল এই রকম:

এই ব্যক্তি ভালোবাসে; কিন্তু আমি বিবাহিতা, অতএব তাকে ভালোবাসা উচিত নয়।

মেয়েলি পদ্ধতি হল এই রকম:

তাকে ভালোবাসা উচিত নয়, কারণ আমি বিবাহিতা; কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে, তাই...

এখানে এক অর্থপূর্ণ বিরতি, কারণ বিচারবুদ্ধি এখন মূক হয়ে

গেছে এবং সব কথোপকথন চলে প্রধানত জিহবা, চোখ এবং শেষ পর্যন্ত হৃদয় দ্বারা, যদি হৃদয় বলে কিছু থেকে থাকে।

কোনো দিন এই লেখাগুলো কোনো মেয়ের হাতে পড়লে কী হবে? ক্রুদ্ধ হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠবে, 'নিছক কুৎসা'।

যেদিন থেকে কবিরা লিখতে শুরু করেছে এবং মেয়েরা শুরু করেছে সেগুলো পড়তে (তার জন্যে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন), এত বেশীবার শেষোক্তদের স্বর্গীয় জীব বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে নিজেদের সরল মনের দরুন এই স্তুতিবাক্যকে তারা বাস্তবিক বিশ্বাস করে ফেলেছে। তারা ভুলে গেছে যে অর্থের জন্য নিরো'কেও*) সেই একই কবিরা প্রশংসা করেছে প্রায় দেবতা বলে উল্লেখ করে...

তাদের প্রতি এ ধরনের বিদ্বেষজনক কথা বলা আমার উচিত নয় — কারণ পৃথিবীতে তাদের ছাড়া আর কিছুই আমি ভালোবাসি নি, তাদের জন্য সর্বদাই আমি মানসিক শান্তি, উচ্চাশা এবং জীবন জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলাম...। তবু রাগের বশবর্তী হয়ে বা আমার অহংকার আহত হয়েছে বলেই যে চেষ্টা করছি সেই যাদুময় আবরণকে সরাতে, যাকে অভিজ্ঞ দৃষ্টিই শুধু ভেদ করতে পারে, এমন নয়। না, তাদের সম্বন্ধে যা-কিছু বলছি তা হল:

হৃদয়ের তিক্ত অন্তর্দৃষ্টি
এবং আবেগশূন্য মনে বিচারের ফল।*)

আমি তাদের যে-রকম ভালোভাবে চিনি সব লোকই তাদের সে-রকম জানুক — মেয়েদের এই কামনা হওয়াই উচিত। কারণ তাদের সম্বন্ধে ভয় জয় করার এবং তাদের ছোটছোট দোষ-ত্রুটিগুলি আবিষ্কার করার পরেই তাদের আমি একশ' গুণ বেশী ভালোবেসেছি।

প্রসঙ্গত ভের্নের সেদিন মেয়েদের তুলনা করেছিলেন 'মুক্ত জেরুসালেমে' তাসো-বর্ণিত যাদুময় অরণ্যের সঙ্গে।*)

তিনি বলেছিলেন, 'তার মধ্যে আপনি যদি এগুতে শুরু করেন চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করবে কদর্য আতঙ্ক: কর্তব্য, অহংকার, মান-সম্ভ্রম, জনমত, বিদ্রূপ, ঘৃণা...। সেগুলোকে আমল দেবার দরকার নেই, শুধু এগিয়ে যেতে হবে। ক্রমশ-ক্রমশ দৈত্য-দানা অদৃশ্য হবে, আর আপনার সামনে বিস্তারিত হবে শান্ত, রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠ, যেখানে চির সবুজ গাছ

ফুলে ছেয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপের পর ভয়ে যদি বুক কেঁপে ওঠে আর পিছনে মাথা ফেরে তা হলে কপালে আপনার দুঃখ আছে!'

১২ই জুন

আজকের সন্ধেটা নানা ঘটনা দিয়ে ঠাসা। কিস্‌লভোদ্‌স্ক থেকে ভার্স্ট তিনেক দূরে যে-খাদ দিয়ে পদ্‌কুমক*) বয়ে চলেছে সেখানে এক পাহাড় আছে, নাম আংটি। এই স্বাভাবিক প্রবেশ-পথটি এক উঁচু পাহাড়কে ছাপিয়ে রয়েছে। তার ভেতর দিয়ে অস্তগামী সূর্য পৃথিবীর ওপর শেষ জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে। এই পাথুরে জানালার ভিতর দিয়ে সূর্যাস্ত দেখার জন্য বেশ বড় গোছের এক অশ্বারোহী দল বেরিয়ে পড়ল। সত্যি বলতে কি যারা এসেছে তাদের মধ্যে কেউই সূর্যাস্ত দেখার কথা ভাবে নি। রাজকুমারী মেরির পাশেই আমি ঘোড়ায় চড়ে চলেছিলাম। ফিরতি পথে আমাদের পদ্‌কুমক পার হতে হল। এমন কি ক্ষুদ্রতম পাহাড়ী স্রোতগুলোও বিপজ্জনক, তার বিশেষ কারণ এই যে স্রোতের ফলে তাদের তলদেশ প্রতিদিন নানাভাবে বদলে উঁচু-নীচু হয়ে থাকে। গতকাল যেখানে একটা পাথর ছিল আজ হয়ত সেখানে একটা গর্ত। রাজকুমারীর ঘোড়ার লাগাম ধরে জলে নামলাম। সেখানকার জল এক হাঁটুর বেশী নয়। কোণাকুণিভাবে স্রোতটা ধীরে-ধীরে পার হতে আমরা শুরু করলাম। এ-কথা সবাই জানে যে তীব্র স্রোত পার হবার সময় জলের দিকে তাকাতে নেই, কারণ তাতে মাথা ঘুরে ওঠে। রাজকুমারী মেরিকে এ-বিষয়ে সাবধান করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যেই তখন আমরা মাঝখানে পৌঁছেছি স্রোতের বেগ যেখানে সবচেয়ে বেশী। অকস্মাৎ সে ঘোড়ার উপর টলমল করতে লাগল। হাঁপাতে-হাঁপাতে সে বলল, 'মাথা ঘুরছে!..' দ্রুতবেগে তার দিকে ঝুঁকে তার নমনীয় কটিদেশ আমি জড়িয়ে ধরলাম।

ফিসফিস করে তাকে বললাম, 'ওপর দিকে চেয়ে দেখুন। ভয় পাবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার কাছে আমি আছি।'

কিছু সুস্থ বোধ করে আমার আলিঙ্গন মুক্ত হতে সে চাইল। আমি কিন্তু তার কোমল ক্ষীণ কটিদেশে আলিঙ্গন আরও শক্ত করলাম। তার

গাল প্রায় স্পর্শ করছিল আমার গাল। তার উত্তপ্ত আভা আমি অনুভব করতে লাগলাম।

'হা ভগবান!.. আপনি কী করছেন?..'

তার শিহরণ ও বিহ্বলতা আমি লক্ষ্য করলাম না। তার কোমল গালে আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করল। সে চমকে উঠল, কিন্তু কিছু বলল না। অন্যদের পিছন-পিছন আমরা যাচ্ছিলাম। কেউই আমাদের দেখতে পেল না। তীরে উঠে সবাই ঘোড়া ছোটাল। রাজকুমারী কিন্তু লাগাম টেনে ধীরে-ধীরে চালনা করতে লাগল তার ঘোড়াকে। আমি তার সঙ্গে রইলাম। আমাকে নিরুত্তর দেখে সে যে দুর্ভাবনায় পড়েছে সে-কথাটা স্পষ্ট বোঝা গেল। নিছক কৌতূহলের খাতিরে আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলাম যে একটা কথাও বলব না। আমি দেখতে চাইলাম এই বিব্রত ভাব কী করে সে কাটিয়ে ওঠে।

অবশেষে সে কথা বলতে লাগল, কান্নায় কেঁপে-কেঁপে উঠল তার স্বর: 'হয় আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, নয়ত খুব ভালোবাসেন! হয়ত আমাকে ব্যঙ্গ করতে চান আপনি, চান আমার সুখ-দুঃখ নিয়ে খেলা করতে, আর তারপর আমাকে ছেড়ে চলে যেতে...। সে-ব্যাপারটা এত জঘন্য, এত নীচ হবে যে তার কথা ভাবলেই... না, না!' কোমল বিশ্বাসের সুরে সে বলে চলল, 'আমার মধ্যে এমন কিছু নেই যা অসম্মানের, আছে কি? আপনার প্রগল্‌ভ ব্যবহার... আমার উচিত হবে আপনাকে ক্ষমা করা, কারণ কোন বাধা আমি দিই নি...। আমার কথার উত্তর দিন, আমার সঙ্গে কথা বলুন, আপনার স্বর আমি শুনতে চাই!..' তার শেষ কথাগুলোর মধ্যে নারীসুলভ এমন অসহিষ্ণুতা ছিল যে আমি হাসি চাপতে পারলাম না। সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠছিল। আমি কিছু বললাম না।

সে বলে চলল, 'আপনার কিছুই বলার নেই। হয়ত আমার মুখ থেকেই প্রথম আপনি শুনতে চান যে আপনাকে আমি ভালোবাসি?..'

আমি নিরুত্তর রইলাম...

'আপনি চান তাই আমি করি?' বলে দ্রুত সে আমার দিকে মুখ ফেরাল। তার স্বর এবং চোখের মধ্যে এমন দৃঢ়তা ছিল যা লক্ষ্য করলে ভয় হয়...

'কেন তা আমি চাইব?' বলে আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

তার ঘোড়াকে কশাঘাত করে সেই সরু বিপজ্জনক পথে সে পূর্ণ

বেগে ছুটে চলল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন অকস্মাৎ ঘটল যে সহজে তার নাগাল পেলাম না। তার কাছে যখন পেঁছিলাম ইতিমধ্যেই তখন সে দলের অন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বাড়ি পেঁছিনো পর্যন্ত সমস্ত পথ সে অনর্গল বকে চলল, আর হাসতে লাগল। তার ভাবভঙ্গীর মধ্যে এক অসুস্থ ক্ষিপ্রতা। একবারও আমার দিকে সে ফিরে তাকাল না। তার এই অস্বাভাবিক ফুর্তির ভাব প্রত্যেকে লক্ষ্য করল। তার মেয়েকে লক্ষ্য করে রানী লিগোভ্স্কায়া মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁর মেয়ে কিন্তু স্নায়ু তাড়নায় ভুগছে। বিনিদ্র রাত্রি সে কেঁদে কাটাবে। কথাটার কল্পনাতেই আমার অসীম সুখ; মাঝে মাঝে এমন মুহূর্ত আসে যখন আমি ভ্যাম্পায়ারকে বুঝতে শুরু করি।*) তবু ভালো লোক বলে আমার সুনাম আছে আর সেই সুনামের উপযুক্তভাবে আমি বাঁচতে চাই!

ঘোড়া থেকে নেমে মেয়েরা রানী লিগোভ্স্কায়ার বাড়িতে গেল। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম, তাই মনের মধ্যে যে-সব ভাবনা ভিড় করে আসছিল সেগুলো দূর করার জন্য আমি পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ালাম। শিশিরস্নাত সন্ধের বাতাস মধুর ও শীতল। অন্ধকার কালো পাহাড়ের চুড়োগুলোর পিছন থেকে চাঁদ উঠে আসছে। আমার ঘোড়াটার নালহীন প্রতিটি পদশব্দ খাদের স্তব্ধতায় অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলছে। একটা ঝর্ণায় আমার ঘোড়াটাকে জল পান করালাম, এই দক্ষিণ দেশের রাত্রির স্বাস্থ্যকর বাতাস সাগ্রহে দুয়েকবার পান করলাম বুক ভরে, তারপর ফিরে চললাম। গ্রামের ভিতর দিয়ে আমি চললাম। জানালায়-জানালায় বাতিগুলো নিভতে শুরু করেছে। দুর্গ-প্রাকারের উপরকার প্রহরীরা এবং ফাঁড়ির কসাক পাহারাওলারা ক্রমাগত পরস্পরের উদ্দেশে ডাক ছাড়ছে।

গ্রামের মধ্যে একটা খাদের একেবারে পাশের এক বাড়িতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলভাবে আলো জ্বলতে লক্ষ্য করলাম। অল্পক্ষণ ছাড়া-ছাড়া নানা কণ্ঠস্বর ও চিৎকার আমি শুনতে পেলাম। বুঝলাম অফিসাররা মদ্যপান করছে। ঘোড়া থেকে নেমে চুপিচুপি জানালার কাছে গেলাম। একটা জানালার আধ-খোলা খড়খড়ির ভিতর দিয়ে পানোন্মত্তরা কী করছে আর বলাবলি করছে দেখতে ও শুনতে পেলাম। আমাকে নিয়ে তারা আলোচনা করছিল।

অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন সুরায় উত্তেজিত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য টেবিলে ঘুষি মারছিল।

সে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ! এ-ভাবে চলতে পারে না। পেচোরিনকে শিক্ষা দিতে হবে। পিটার্সবুর্গের এ-ধরনের ভুঁইফোঁড়রা চড় না-খাওয়া পর্যন্ত বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করে। সর্বদাই পরিষ্কার দস্তানা আর চকচকে জুতো পরে বলেই সে ভেবেছে এখানে সে-ই বুঝি একমাত্র ভদ্রলোক!'

'আর তার মুখের ওই অহঙ্কারের হাসিটা! কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে কাপুরুষ — হ্যাঁ, কাপুরুষ!'

গ্রুশ্নিৎস্কি বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। সব ব্যাপার নিয়ে সে ঠাট্টা করতে পছন্দ করে। একবার তাকে এমন কথা শুনিয়েছিলাম যে অন্য কেউ হলে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে দু'টুকরো করে ফেলত। পেচোরিন কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিল। আমি অবশ্য তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করি নি, কারণ সেটা তারই করার কথা। তা ছাড়া মাথা ঘামাতেও আমার ইচ্ছে করে নি যে...'

'গ্রুশ্নিৎস্কি ক্ষেপে গেছে কারণ তাকে টপকে রাজকুমারীকে নিয়ে সে ক্রমাগত বেড়াতে শুরু করেছে,' কে একজন বলল।

'কী সব বাজে কথা! কথাটা সত্যি যে রাজকুমারীর পেছন-পেছন আমি খানিক ছুটেছিলাম কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ছোটা আমি বন্ধ করেছিলাম, কারণ বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই আর কোনো মেয়ের নামে কথা রটে সেটাও আমি চাই না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জোর করে আমি বলতে পারি সে দারুণ কাপুরুষ, মানে পেচোরিন — গ্রুশ্নিৎস্কি নয়। গ্রুশ্নিৎস্কি ভালো লোক, তা ছাড়া সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুও!' অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন আবার বলল। 'ভদ্রমহোদয়গণ! এখানে কেউ কি তার পক্ষ অবলম্বন করতে প্রস্তুত আছে? কেউ না? বেশ, ভালো কথা! তার সাহস পরখ করে দেখতে চান? সেটা মজাদার ব্যাপার হবে...'

'আমরা ত তাই চাই। কিন্তু কী করে?'

'আমার কথাগুলো শুনুন: যে-হেতু গ্রুশ্নিৎস্কির অভিযোগটাই সবচেয়ে বড়, সে-হেতু তিনিই এতে সবচেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করবেন। কোনো ছুতোয় ঝগড়া বাধিয়ে পেচোরিনকে তিনি ডুয়েলে আহ্বান করবেন। দাঁড়ান, এখান থেকেই তামাসার শুরু। তিনি পেচোরিনকে ডুয়েলে আহ্বান করবেন — এ-পর্যন্ত বেশ ভালো! সবকিছুই — অর্থাৎ ডুয়েলে আহ্বান করা, তার তোড়জোড় করা, তার শর্ত ঠিক করা — যথাসম্ভব গাম্ভীর্য আর

ভয়াবহ ভাবে করা হবে। সেটার ভার আমার; বন্ধু, আমিই হব আপনার সহকারী! বেশ, ঠিক ত! এখন, শুনুন, মজাটা হল এই, পিস্তলগুলোয় গুলি ভরব না। আমি কথা দিচ্ছি পেচোরিন তার কাপুরুষতা চেপে রাখতে পারবে না — তাদের দু'জনকে ছ'পা দূরে সরিয়ে দাঁড় করাব! ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা রাজী?'

'দারুণ ভালো মতলব, আমরা রাজী। কী মজাই না হবে!' চতুর্দিক থেকে কলরব ভেসে এলো।

'আর আপনি, গ্রুশ্‌নিৎস্কি?'

কম্পিত বক্ষে আমি গ্রুশ্‌নিৎস্কির উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। দৈবক্রমে এই ইতরদের ষড়যন্ত্রে উপহাসের পাত্র হতে-হতে যে আমি বেঁচে গেছি সে-কল্পনায় ঠাণ্ডা রাগে আমার গা জ্বালা করে উঠল। গ্রুশ্‌নিৎস্কি রাজী না হলে তার ঘাড়ে আমি লাফিয়ে পড়তাম। যাই হোক, অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে চেয়ার থেকে উঠে ক্যাপ্টেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাড়ম্বরে সে বললো, 'বেশ, আমি রাজী!'

এই মাননীয় দলের সবাইকার উল্লাস বর্ণনা করা যায় না।

দুই বিরুদ্ধ আবেগের বশীভূত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। একটি হল বিষণ্ণতা। 'কেন এরা সবাই আমাকে ঘৃণা করে?' আমি ভাবলাম। 'কেন? কাউকে আমি কি চটিয়েছি? না। এটা কি সম্ভব যে আমি সেই জাতের, যাকে দেখলেই লোকের মনে মন্দ ভাব জেগে ওঠে?' ক্রমশ আমি সাঙ্ঘাতিক রেগে উঠলাম। ঘরের মধ্যে এদিকে-ওদিকে পায়চারি করতে-করতে নিজের মনেই বলে উঠলাম, 'সাবধান, মিস্টার গ্রুশ্‌নিৎস্কি! আমাকে নিয়ে এ-জাতের উপহাস করতে পারবে না তুমি। তোমার নির্বোধ বন্ধুদের সমর্থনের জন্য তোমাকে হয়ত সাঙ্ঘাতিক দাম দিতে হবে। আমি তোমার হাতের খেলনা নই!..'

সমস্ত রাত ঘুম এলো না। সকালে লেবুর মতোই হলদে দেখাতে লাগল আমার রঙ।

কুয়োটার কাছে সকালে রাজকুমারী মেরির সঙ্গে দেখা হল।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাকে দেখে সে প্রশ্ন করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে?'

'সমস্ত রাত ঘুমোই নি?'

'আমিও না... আপনাকে দোষ দিচ্ছিলাম... সম্ভবত অন্যায়ভাবে! কিন্তু

আপনি যদি বুঝিয়ে দেন তা হলেই আমি আপনার সবকিছু ক্ষমা করতে পারব...'

'সবকিছু?..'

'হ্যাঁ, সবকিছু... আপনাকে শুধু সত্যি কথাটা বলতে হবে... তাড়াতাড়ি বলুন। শুনুন, বারবার আমি সেটা নিয়ে ভেবেছি, এমন অর্থ খুঁজেছি, যাতে আপনার ব্যবহারকে সমর্থন করা যায়। হয়ত আমার আত্মীয়দের তরফ থেকে আপনি প্রতিকূলতা আশঙ্কা করছেন?.. সেদিক নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। কথাটা যখন তাঁরা শুনবেন... (তার স্বর কেঁপে উঠল) আমি তাঁদের মত করাব। কিংবা হয়ত আপনার নিজের অবস্থার কথা ভাবছেন... কিন্তু জেনে রাখবেন যাকে আমি ভালোবাসি তার জন্যে সবকিছুই বিসর্জন দিতে পারি। তাড়াতাড়ি উত্তর দিন — আমার ওপর দয়া করুন...। বলুন, আমাকে আপনি ঘৃণা করেন না, করেন কি?'

সে আমার হাতটা চেপে ধরল।

ভেরার স্বামীর সঙ্গে রানী লিগোভ্‌স্কায়া আগে-আগে যাচ্ছিলেন। তিনি কিছু দেখতে পেলেন না। কিন্তু যে-সব রোগীরা পায়চারি করছে তারা আমাদের লক্ষ্য করে থাকতে পারে। আর তারা কৌতূহলী গুজবরটনাকারীদের চেয়েও বেশী কৌতূহলী। তাই আমি তার আবেগভরা মুঠো থেকে তাড়াতাড়ি নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম।

আমি রাজকুমারীকে উত্তর দিলাম, 'আপনাকে পুরো সত্যি কথাটাই বলব নিজের পক্ষ না নিয়ে, আর যা করেছি সে সম্বন্ধে জবাবদিহি করার চেষ্টা না করে। আপনাকে আমি ভালোবাসি না।'

তার ঠোঁটদুটো সামান্য ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

প্রায় শোনাই যায় না এ-রকম মৃদু স্বরে সে বলল, 'আমার কাছ থেকে চলে যান।'

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে চলে গেলাম।

১৪ই জুন

মাঝে মাঝে নিজেকে আমি ঘৃণা করি... এ-কারণেই কি অন্যদের ঘৃণা করি আমি?.. মহৎ অনুভূতি বোধ করার আর আমার ক্ষমতা নেই; ভয় হয় নিজের কাছেই নিজে হাস্যকর হয়ে উঠব। আমার জায়গায় অন্য কেউ

পড়লে রাজকুমারীকে জানাত son coeur et sa fortune,* কিন্তু বিবাহ শব্দটা আমাকে অদ্ভুত যাদুময়ভাবে শাসন করে। যতই কেন না কোনো মেয়েকে আমি আবেগ-ভরে ভালোবাসি, সে যদি তার সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব ঘুণাক্ষরেও করে তা হলে — বিদায় প্রেম! আমার হৃদয় প্রস্তরীভূত হয়ে ওঠে, কিছুই আর তাকে উত্তপ্ত করতে পারে না। এটা ছাড়া যে-কোনো ত্যাগস্বীকার আমি করতে পারি। বিশবার করতে পারি নিজের জীবন, এমন কি সুনাম, বিপন্ন... কিন্তু কখন আমার স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিতে পারব না। কেন এত বেশী মূল্য সেটাকে দিই?.. তার মধ্যে কী পাই আমি?.. কী আমার উদ্দেশ্য? ভবিষ্যতের কাছেই বা কী আমি আশা করি?.. কিছু না, একেবারেই কিছু না। এক সহজাত ভয়, এক অপ্রকাশ্য ভাবী পূর্ব-সূচনা...। তবু অনেকেরই অহেতুক ভয় আছে মাকড়সা, আরশোলা আর ইঁদুরের ওপর...। স্বীকার করব?.. তখনও আমি শিশু, এক বৃদ্ধা মা'র হাত গুণে বলেছিল যে আমার মৃত্যু ঘটাবে দুষ্ট এক স্ত্রী। সে-সময় কথাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বিবাহ সম্বন্ধে অজেয় এক বিতৃষ্ণা মনের মধ্যে জন্মে গেছে...। আর তবুও মনে হয় তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবে; কিন্তু সেটাকে যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব।

১৫ই জুন

যাদুকর আপ্‌ফেলবাউম গতকাল এখানে পেঁছেছে। রেস্তোরাঁর দরজার ওপর দীর্ঘ এক প্রাচীরপত্রে মাননীয় জনসাধারণকে জানান হয়েছে যে উক্ত বিস্ময়কর যাদুকর, বাজিকর, রাসায়নিক এবং অপটিশিয়ানের আজ সন্ধে আটটায় নোব্‌ল্‌স্‌ ক্লাবের হলে (অন্যথায় রেস্তোরাঁয়) আশ্চর্য সব অভিনয় দেখাবার সৌভাগ্য হবে। প্রবেশমূল্য আড়াই রুব্‌ল।

প্রত্যেকেই আশ্চর্য যাদুকরকে দেখতে যেতে চায়। এমন কি নিজের জন্য রানী লিগোভ্‌স্কায়াও একটা টিকিট কিনেছেন, যদিও তাঁর কন্যা অসুস্থ।

নৈশভোজের পর ভেরার জানালার পাশ দিয়ে চললাম। বারান্দায় সে একা বসেছিল। আমার পায়ের কাছে একটা ছোট চিঠি পড়ল:

'সদর সিঁড়ি দিয়ে আজ রাত্রি দশটায় এসো। আমার স্বামী গেছেন

---

* তার হৃদয় ও সম্পত্তি (ফরাসী ভাষায়)।

পিয়াতিগোর্স্কে। কাল সকালের আগে ফিরবেন না। আমার ঝি-চাকররাও বাড়িতে থাকবে না। তাদের এবং রানীর চাকরদের প্রদর্শনীর টিকিট দিয়েছি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব: নিশ্চয়ই এসো।'

আমি ভাবলাম, 'যাক্। শেষ পর্যন্ত যেমনটি চাই তেমনটিই ঘটেছে।'

আটটার সময় গেলাম যাদুকরকে দেখতে। প্রায় ন'টার সময় দর্শকরা সমবেত হবার পর অভিনয় শুরু হল। পিছনের সারিতে লক্ষ্য করলাম ভেরা এবং রানীর ঝি-চাকররা রয়েছে। তাদের হিসেব পাওয়া গেল। প্রথম সারিতে গ্রুশ্‌নিৎস্কি বসে, হাতে তার হাত-চশমা। প্রত্যেকবার রুমাল, ঘড়ি, আংটি বা ঐ জাতীয় কিছুর দরকার হলেই যাদুকর গ্রুশ্‌নিৎস্কির শরণাপন্ন হচ্ছিল।

কিছু দিন ধরে গ্রুশ্‌নিৎস্কি আমাকে অভিবাদন জানায় না। আজ বার দু'য়েক আমার দিকে সে উদ্ধতভাবে তাকাল। দেনা-পাওনা বোঝবার সময় এর জন্য তাকে অনুতাপ করতে হবে।

প্রায় দশটার সময় উঠে পড়ে আমি বাইরে এলাম।

বাইরে ঘন অন্ধকার। চতুর্দিকের পাহাড়ের চুড়োয় ঘন, ঠান্ডা মেঘ জমে রয়েছে। ক্বচিৎ রেস্তোরাঁর চারিপাশের পপলার গাছের উপর ঝিমন্ত বাতাস সিরসির করছে। রেস্তোরাঁর জানালাগুলোর কাছে লোকেরা ভিড় করে রয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে ফটক পেরুবার পর আমি দ্রুত পা চালালাম। অকস্মাৎ অনুভব করলাম কেউ একজন আমাকে অনুসরণ করছে। দাঁড়িয়ে পড়ে চারিদিকে তাকালাম। এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। সাবধানতার জন্য বাড়ির চারিদিকে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, যেন পায়চারি করতেই বেরিয়েছি। রাজকুমারী মেরির জানালার পাশ দিয়ে যাবার সময় আবার আমি পেছনে পদশব্দ শুনতে পেলাম এবং গ্রেটকোটে-ঢাকা একটা লোক আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। এতে আমার দুর্ভাবনা হল। তা সত্ত্বেও সদর দরজা পর্যন্ত নিঃশব্দে গিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠলাম। দরজাটা খুলে গেল; ছোট্ট একটি হাত আমার হাতটা চেপে ধরল...

আমার গায়ের কাছে এসে ভেরা ফিসফিস করে বলল, 'কেউ তোমায় দেখে নি ত?'

'না!'

'এখন বিশ্বাস কর ত তোমাকে আমি ভালোবাসি? অনেক দিন আমি

দ্বিধা করেছি, কতদিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছি নিজেকে... কিন্তু তোমার হাতে আমি কাদার মতো।'

জোরে-জোরে ধক-ধক করছে তার বুকটা, তার হাতগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা। তারপর শুরু হল ভর্ৎসনা, আর ঈর্ষান্বিত অভিযোগ। আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি শোনার দাবি সে জানাল। কথা দিল যে আমার প্রতারণাকে সে নিঃশব্দে সহ্য করবে, কারণ তার একমাত্র কামনা আমাকে সুখী দেখা। সেটা সম্পূর্ণ আমি বিশ্বাস করলাম না, তা সত্ত্বেও তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, ইত্যাদি করে।

'তা হলে মেরিকে তুমি বিয়ে করছ না? তাকে তা হলে ভালোবাসো না?.. আর সে কিনা ভাবে... তুমি কি জানো পাগলের মতো তোমাকে সে ভালোবাসে, বেচারা!..'

. . . .

. . . .

রাত্রি প্রায় দু'টোর সময় জানালা খুলে, দুটো শালে গিঁট বেঁধে উপরের বারান্দা থেকে নীচেরটায় নামলাম। নামবার সময় একটা থাম ধরে ছিলাম। রাজকুমারী মেরির ঘরে একটা বাতি জ্বলছিল। সেই জানালার দিকে কী যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল। পর্দাগুলো ভালো করে টেনে দেওয়া হয় নি। ফলে ঘরের ভিতরটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হল। মেরি তার বিছানায় বসে, হাতদুটো তার হাঁটুর উপর আড়াআড়ি করে রাখা। তার ঘন চুলের রাশি লেস লাগান রাত-টুপির নীচে বাঁধা। তার সাদা কাঁধগুলোকে ঢেকেছে বড় লাল রঙের একটা শাল। তার ছোট্ট পাদুটো ঢেকে রেখেছে বিচিত্র রঙের এক জোড়া পারস্য দেশের চটি। স্থির হয়ে সে বসে রয়েছে বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে তার মাথাটা। তার সামনের ছোট টেবিলে খোলা একটা বই, কিন্তু তার স্থির আর অবর্ণনীয় বিষণ্ণ দৃষ্টি মনে হল একটি পাতাকেই যেন একশ'বার ধরে পড়েছে, এদিকে মন তার চলে গেছে অনেক দূরে...

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঝোপের পেছনে কে যেন সরে গেল। বারান্দা থেকে ঘাসে ঢাকা জমিতে আমি লাফিয়ে নামলাম। অদৃশ্য একটা হাত আমার কাঁধ চেপে ধরল। একটা কর্কশ স্বর বলে উঠল, 'ওহে, এইবার ধরেছি!.. রাতের বেলা রাজকুমারীদের ঘরে লুকিয়ে যাবার জন্যে শিক্ষা তোমায় দেব!..'

কোণের পিছন থেকে আর একজন লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জোরে চেপে ধর!'

তারা হল গ্রুশ্‌নিৎস্কি আর অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন।

শেষোক্তের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ছিটকে ফেললাম। তারপর ছুটলাম ঝোপের দিকে। আমাদের বাড়িগুলোর বিপরীত দিকের ঢালু জমির ওপরকার বাগানের সব পথই আমার জানা।

তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'চোর, চোর, বাঁচাও!..' কে একজন গুলি ছুঁড়ল। জ্বলন্ত টিপ্‌লিটা প্রায় আমার পায়ে এসে পড়ল।

এক মিনিট পরে নিজের ঘরে পেঁছে, জামা-কাপড় ছেড়ে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার ভৃত্য দরজায় চাবি দেবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গ্রুশ্‌নিৎস্কি আর ক্যাপ্টেন তাতে জোর ধাক্কা দিতে লাগল।

'পেচোরিন! ঘুমিয়ে পড়েছেন? বাড়ি আছেন কি?..' ক্যাপ্টেন চিৎকার করতে লাগল।

রাগত স্বরে উত্তর দিলাম, 'আমি বিছানায়।'

'উঠে পড়ুন!.. চোর পড়েছে! চের্‌কেসীয়রা!..'

উত্তরে বললাম, 'আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। বাইরে বেরুতে ভয় পাচ্ছি, ঠাণ্ডা আরও বেশী লেগে যেতে পারে।'

তারা চলে গেল। আমার উত্তর দেওয়া উচিত হয় নি। তা হলে বাগানে আরও এক ঘণ্টা তারা আমাকে খুঁজত। ইতিমধ্যে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেছে। দুর্গ থেকে এক কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। সবাই জেগে উঠেছে। প্রতিটি ঝোপঝাড়ে চের্‌কেসীয়দের অনুসন্ধান চলল, অবশ্যই কাউকে পাওয়া গেল না। অনেকেরই অবশ্য দৃঢ় ধারণা হল যে সৈন্যদল যদি বেশী সাহস দেখাত ও তৎপর হত তা হলে অন্তত দু'য়েক ডজন ডাকাতের মৃতদেহ অকুস্থলে পড়ে থাকত।

১৬ই জুন

আজ সকালে কুয়োটার কাছে চের্‌কেসীয়দের নৈশ আক্রমণের কথাটাই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। নারজানের জল নির্ধারিত সংখ্যক গেলাস পান করে এবং দীর্ঘ লিন্ডেন বীথিকা ধরে বার দশ হাঁটাহাঁটি করার পর ভেরার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ঠিক তখনি তিনি পিয়াতিগোর্স্ক

থেকে ফিরেছেন। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমরা প্রাতরাশের জন্য রেস্তোরাঁয় গেলাম। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তিনি অতিশয় চিন্তিত। তিনি বললেন, 'গত রাত্রে সে দারুণ ভয় পেয়েছিল! যখন আমি নেই তখনি কিনা এ-রকম ঘটল!' কোণের ঘরে যাবার দরজার পাশে প্রাতরাশের জন্য আমরা বসলাম। কোণের ঘরে গুটি দশেক যুবক বসে, গ্রুশ্‌নিৎস্কিও তাদের মধ্যে রয়েছে। এবং দ্বিতীয়বার ভাগ্য আমাকে এমন কথোপকথন আড়ি পেতে শোনবার সুযোগ দিল যার ফলে গ্রুশ্‌নিৎস্কির নিয়তি হয়ে গেল স্থির। আমাকে সে দেখতে পায় নি, তাই মনে হল না আমার উপকারের জন্য ইচ্ছে করেই সে কথাগুলো বলেছে। তাতে কিন্তু আমার চোখে তার অপরাধ বাড়িয়ে তুলল।

কে একজন বলল, 'লোকগুলো কি বাস্তবিকই চের্‌কেসীয়? কেউ তাদের দেখেছে?'

গ্রুশ্‌নিৎস্কি উত্তর দিল, 'আপনাদের আমি আসল কথাটা পুরো বলব। আপনাদের কাছে শুধু অনুরোধ আমার নাম করবেন না। ঘটনাটা ঘটেছিল এই রকম: গতকাল একজন — তার নাম আমি করব না — আমার কাছে এসে জানিয়েছিল যে লিগোভ্‌স্কিদের বাড়িতে রাত প্রায় দশটার সময় একটা লোককে উঁকিঝুঁকি দিতে সে দেখেছে। মনে রাখবেন রানী লিগোভ্‌স্কায়া তখন এখানে, আর রাজকুমারী মেরি বাড়িতে। তাই তার সঙ্গে গিয়ে রাজকুমারী মেরির জানালার নীচে ভাগ্যবান লোকটির জন্যে ওত্‌ পেতে রইলাম।'

যদিও আমার সঙ্গী প্রাতরাশ নিয়ে ব্যস্ত তবু, স্বীকার করছি, আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম পাছে, গ্রুশ্‌নিৎস্কি সত্যি কথাটা অনুমান করে থাকলে, তিনি অপ্রীতিকর কিছু শুনে ফেলেন। ঈর্ষায় অন্ধ হয়েছিল বলে কী ঘটেছিল সেটা গ্রুশ্‌নিৎস্কি এমন কি সন্দেহও করে নি।

গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলে চলল, 'শুনুন, তাই আমরা ফাঁকা টোটা-ভরা একটা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম লোকটাকে ভয় দেখানোর জন্যে। দু'টো পর্যন্ত আমরা বাগানে অপেক্ষা করলাম। শেষটায় সে বেরুল, ভগবানই জানেন কোথা থেকে। জানালার ভেতর দিয়ে যে বেরোয় নি সে-কথা বলতে পারি, কারণ জানালাটা খোলে নি — সম্ভবত থামের পিছনকার কাচের দরজাটা দিয়ে সে এসেছিল। অবশেষে, শুনুন, আমরা একজনকে বারান্দা থেকে নামতে দেখলাম...। রাজকুমারী সম্বন্ধে এখন আপনারা কী বলেন শুনি? আমাকে

স্বীকার করতেই হবে এই সব মস্কোর মেয়েদের আমি বুঝি না! এর পর আর কোনো কথা বিশ্বাস করা যায়? তাকে আমরা ধরতে চেষ্টা করেছিলাম, সে কিন্তু আমাদের হাত ছাড়িয়ে খরগোসের মতো তাড়াতাড়ি ঝোপের দিকে দৌড়ল। তখনই তাকে গুলি করেছিলাম।'

গ্রুশ্‌নিৎস্কির চারিধারে অবিশ্বাসের মর্মর উঠল।

সে বলে চলল, 'আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? আমি শপথ করে বলছি যে কথাটা খাঁটি সত্যি, আর সেটা প্রমাণ করার জন্যে যে-ভদ্রলোক সম্বন্ধে আলোচনা করছি তাঁর নামটাও উল্লেখ করতে পারি।'

চারিদিক থেকে প্রশ্ন এলো, 'বলো, বলো, কে সে?'

গ্রুশ্‌নিৎস্কি উত্তর দিল, 'পেচোরিন।'

সেই মুহূর্তে সে চোখ তুলে দেখল দরজায় তার মুখোমুখি আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে। তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে খুব ধীরে-ধীরে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট করে আমি বললাম:

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সবচেয়ে ঘৃণাজনক অপবাদকে সত্যি বলে আপনি শপথ করে বলার পরেই আমি ঘরে ঢুকেছি। আমি উপস্থিত থাকলে এ-ধরনের নীচতার হাত থেকে আপনি হয়ত বাঁচতেন।'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে গ্রুশ্‌নিৎস্কি রাগে ফেটে পড়তে উদ্যত হল। সেই একই স্বরে আমি বললাম, 'আমার অনুরোধ যে আপনি যা বলেছেন এই মুহূর্তে সে-কথা প্রত্যাহার করুন। আপনি ভালো করেই জানেন কথাটা মিথ্যে। আমার মনে হয় না কোনো মহিলা আপনার চোখ ধাঁধানো গুণাবলীকে উপেক্ষা করেছে বলে এ-ধরনের কঠোর প্রতিশোধ পাবার তিনি উপযুক্ত পাত্রী। ভালো করে ভেবে দেখুন: যদি মত না বদলান তা হলে সম্মানিত ব্যক্তির খ্যাতি আপনি হারাবেন, আর নিজের জীবনকেও বিপন্ন করে তুলবেন।'

অত্যন্ত বিচলিতভাবে চোখ নীচু করে গ্রুশ্‌নিৎস্কি আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু অহঙ্কার এবং হৃদয়ের ভেতরকার বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হল না। অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন, যে তার পাশে বসেছিল, কনুই দিয়ে তাকে খোঁচা দিল। চমকে উঠে আমার দিকে না তাকিয়ে সে দ্রুত উত্তর দিল:

'মশাই, আমি যে-কথা বলি ভেবেচিন্তেই বলি, কথাগুলো আবার বলতে আমি প্রস্তুত...। আপনার ভয় দেখানোয় আমি ভয় পাই না, কিছুই আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলতে পারবে না।'

'শেষের কথাটা ইতিমধ্যেই আপনি প্রমাণ করেছেন,' ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিয়ে অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেনের হাত ধরে আমি ঘরের বাইরে নিয়ে এলাম।

ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করল, 'আমার সঙ্গে আপনার কিসের দরকার?'

'আপনি গ্রুশ্‌নিৎস্কির বন্ধু, সম্ভবত আপনি তার সেকেন্ড হবেন?'

অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ক্যাপ্টেন নীচু হয়ে অভিবাদন করল।

উত্তরে সে বলল, 'আপনার অনুমান ঠিকই। তা ছাড়া আপনি তাকে যে-অপমান করেছেন সেটার সঙ্গে আমিও জড়িত, তাই আমাকে তার সেকেন্ড হতেই হবে। গত রাত্রে তার সঙ্গে আমি ছিলাম,' তার কুঁজো পিঠটা সোজা করে সে বলল।

'আরে, আপনার মাথাতেই তা হলে আমি অমন কুৎসিত ঘুষি চালিয়ে ছিলাম?..'

প্রথমে তার মুখ হলদে হয়ে গেল, তারপর নীল। তার মুখের ওপর চাপা আক্রোশ দেখা দিল।

'অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার সেকেন্ডকে আপনার কাছে পাঠাবার সৌভাগ্য আমার হবে,' অত্যন্ত ভদ্রভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন করে, তার রাগ লক্ষ্য করি নি এমন ভাব দেখিয়ে, আমি বললাম।

রেস্তোরাঁর সিঁড়িতে ভেরার স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। মনে হল আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

আনন্দে প্রায় ফেটে পড়ে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন।

'মহানুভব যুবক!' সজল চোখে তিনি বললেন। 'সবকিছু আমি শুনেছি। কী বদমায়েস! কী অকৃতজ্ঞ লোক!.. এর পর ভাবুন ভদ্রলোকেরা নিজেদের বাড়িতে তাদের ঢুকতে দিচ্ছেন! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার মেয়ে নেই। যার জন্যে আপনি জীবন বিপন্ন করছেন সে-মেয়ে আপনাকে পুরস্কার দেবে। আমার বিচার-বুদ্ধির ওপর সাময়িকভাবে আপনি নির্ভর করতে পারেন,' তিনি বলে চললেন। 'এক দিন আমিও যুবক ছিলাম, সৈন্যদলে চাকরি করেছি। আমি জানি এ-ধরনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বিদায়!'

বেচারা! মেয়ে নেই বলে ও খুশি...

সোজা ভের্‌নেরের খোঁজে গেলাম। সে বাড়িতে ছিল। সব কথা তাকে বললাম — ভেরা আর রাজকুমারীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আর

যে-কথোপকথন আড়ি পেতে শুনেছিলাম সেটা, যাতে জানতে পেরেছিলাম ফাঁকা টোটা দিয়ে পরস্পরকে গুলি করতে দিয়ে এই ভদ্রলোকরা আমাকে বোকা বানাবেন বলে সংকল্প করেছেন। এখন কিন্তু ব্যাপারটা ঠাট্টার সীমা পেরিয়ে গেছে। সম্ভবত সেটার এই পরিণাম তারা আশা করে নি।

আমার সেকেণ্ড হতে ডাক্তার সম্মত হলেন। ডুয়েলের সর্তগুলি সম্পর্কে তাঁকে কয়েকটি নির্দেশ দিলাম। তাঁর জোর দিয়ে বলা দরকার যে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে এই ডুয়েল লড়া হবে। কারণ যদিও সর্বদাই জীবন বিপন্ন করতে আমি প্রস্তুত, চিরকালের জন্য এই পৃথিবীতে আমার ভবিষ্যৎকে নষ্ট করতে আমি চাই না।

তারপর বাড়ি ফিরলাম। এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার তাঁর অভিযান থেকে ফিরলেন।

তিনি বললেন, 'বাস্তবিকই আপনার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র চলেছে। গ্রুশ্‌নিৎস্কির বাড়িতে অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং আর একজনকে দেখলাম, তার নামটা মনে নেই। আমার গালোশগুলো খোলার জন্যে হল-ঘরের যাবার পথে মুহূর্তের জন্যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। ভেতরে দারুণ তর্ক আর হৈচৈ হচ্ছিল...। গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলছিল, 'কিছুতেই আমি রাজী হব না! প্রকাশ্যে আমাকে সে অপমান করেছে। সে-সময় একেবারে অন্য কথা ছিল...' উত্তরে ক্যাপ্টেন বলল, 'এটা তোমার ব্যাপার কেন হবে? সবকিছুই নিজের ঘাড়ে নোব। পাঁচবার আমি ডুয়েলে সেকেণ্ড হয়েছি। এ-সব ব্যাপার কী করে সাজাতে হয় জানি। প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত ভেবে ঠিক করেছি। শুধু দয়া করে আমাকে বাধা দিও না। ওকে ভয় দেখাতে পারলেই কাজ হবে। আর এড়াতে পারলে কেন জীবন বিপন্ন করতে যাবে?' সেই সময় আমি ভেতরে এলাম। সঙ্গে-সঙ্গে তারা চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলল, শেষ পর্যন্ত এই নিষ্পত্তি হল: এখান থেকে ভার্স্ট পাঁচেক দূরে একটা নির্জন খাদ আছে। কাল ভোর চারটের সময় সেখানে তারা যাবে। আমাদের যেতে হবে আধ-ঘণ্টা পরে। ছ'পা দূর থেকে আপনি গুলি করবেন — গ্রুশ্‌নিৎস্কি নিজে ওই দূরত্বের ওপর জোর দিয়েছে। বলা হবে নিহত ব্যক্তিকে চের্‌কেসীয়রা মেরেছে। এখন বলব আমার সন্দেহের কথাটা: তারা, অর্থাৎ সহকারীরা পূর্ব পরিকল্পনাকে খানিক বদলেছে, তারা ঠিক করেছে শুধু গ্রুশ্‌নিৎস্কির পিস্তলেই গুলি রাখবে। এটাকে ত হত্যাকাণ্ডের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু

যুদ্ধের সময় চাতুরি চলতে পারে, বিশেষ করে এশিয়ার লড়াইতে। আমার কিন্তু মনে হয় গ্রুশ্‌নিৎস্কি তার বন্ধুদের চেয়ে কিছুটা ভালো। আপনি কী মনে করেন? ওদের কি জানতে দেব যে ওদের মতলবটা আমরা জানতে পেরেছি?'

'না, ডাক্তার, কিছুতেই নয়! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের কাছে আমি হারব না।'

'আপনি কী করতে চান?'

'সেটা আমার গুপ্ত কথা।'

'সাবধান, যেন ফাঁদে না পড়েন... মনে রাখবেন ব্যবধান মাত্র ছ'পার!'

'ডাক্তার, কাল ভোর চারটেয় আপনাকে আশা করব। ঘোড়ায় জিন চড়ানো থাকবে...। বিদায়!'

সন্ধে পর্যন্ত আমি বাড়িতে রইলাম ঘর বন্ধ করে। রানী লিগোভ্‌স্কায়ার কাছ থেকে আমায় নিমন্ত্রণ করার জন্য এক ভৃত্য এসেছিল। তাকে বলতে আদেশ করলাম যে আমি অসুস্থ।

. . . .

রাত দুটো... কিন্তু আমি ঘুমুতে পারি নি...। জানি বিশ্রাম করা উচিত, তা হলে কাল আমার হাত স্থির থাকবে। যদিও ছ'পার ব্যবধানে ফসকানো কঠিন। আঃ! মিস্টার গ্রুশ্‌নিৎস্কি! আপনার ধাপ্পা সফল হবে না...। আমরা ভূমিকা বিনিময় করব, এবার আমার পালা আপনার পাণ্ডুর মুখে গুপ্ত আতঙ্কের চিহ্ন দেখার। কেন আপনি এই মারাত্মক ছ'পা দূরত্বের উপর জোর দিয়েছেন? আপনি মনে করেন আমার কপালকে আপনার লক্ষ্যস্থল হিসেবে বিনা প্রতিবাদে আমি বাড়িয়ে দেব... কিন্তু আমরা ত লটারি করব!.. আর তারপর... তারপর... কিন্তু ভাগ্য যদি তার ওপর প্রসন্ন হয়, তা হলে? শেষ পর্যন্ত ভাগ্য যদি আমার প্রতি বিমুখ হয়, তা হলে?.. আর যদি বিমুখ হয় তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। এত দিন পর্যন্ত আমার সব খামখেয়ালের প্রতি সে সদয় ছিল। এমন কি আকাশেও ধরণীর চেয়ে বেশি স্থিরতা নেই। ভালো কথা! যদি মরতেই হয়, তা হলে মরব! পৃথিবীর সামান্যই লোকসান হবে। আমিও সবকিছু নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমার অবস্থা সেই লোকের মতো নাচের আসরে যে হাই তোলে, আর ঘুমুবার জন্য বাড়ি ফিরতে পারে না, কারণ তার গাড়িটা এসে পৌঁছয় নি। কিন্তু গাড়ি এসে গেছে... বিদায়!..

আমার অতীত জীবনের কথা ভাবি আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে প্রশ্ন করি: কেন বেঁচে ছিলাম? কী উদ্দেশ্যে আমার জন্ম?.. মনে হয় একটা উদ্দেশ্য ছিল, মনে হয় আমার জন্য মহৎ কিছু নিহিত ছিল নিয়তির ভাঁড়ারে। কারণ আমার সীমাহীন ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি সচেতন...। কিন্তু আমার অদৃষ্টের কথা অনুমান করতে পারি নি। নীচ এবং নিষ্ফল আবেগের স্রোতে আমি গা ঢেলে দিয়েছি। তাদের ছাঁচের ভিতর থেকে লোহার মতো ঠাণ্ডা আর কঠিন হয়ে আমি বেরিয়ে এলাম, চিরকালের জন্য বিদায় নিল মহৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা — জীবনের মধুরতম পুষ্প। তারপর থেকে কতবারই না আমি নিয়তির হাতে কুড়ুলের ভূমিকা অভিনয় করেছি! অপরাধীদের মাথায় দণ্ডদায়ী যন্ত্রের মতো পড়েছি আমি, অনেক সময়েই বিদ্বেষভাব ছিল না, কখনই ছিল না অনুতাপ...। আমার প্রেম কখনই কাউকে সুখী করে নি, কারণ যাদের ভালোবেসেছি কখনই তাদের জন্য কোনো ক্ষতি স্বীকার করি নি। ভালোবেসেছি শুধু নিজের জন্য, নিজের আনন্দের জন্য। হৃদয়ের এক বিচিত্র আকাঙ্ক্ষাকে শুধু তৃপ্তি দিয়েছি, পেটুকের মতো আত্মসাৎ করেছি তাদের আবেগ, তাদের কোমলতা, তাদের আনন্দ ও বেদনাকে — কিন্তু কখনই তৃপ্তি পাই নি। আমার অবস্থা সেই ক্ষুধিত ব্যক্তির মতো যে নিছক ক্লান্তিতে হতচেতন হয়ে দামী খাবার আর সফেন সুরার স্বপ্ন দেখে চলে। তার কল্পনার এই ক্ষণস্থায়ী দানগুলো সে সানন্দে গোগ্রাসে গিলে চলে আর মনে করে ভালো বোধ করছে। কিন্তু জেগে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে স্বপ্ন মিলিয়ে যায়... পড়ে থাকে দ্বিগুণ ক্ষুধা আর হতাশা!

হয়ত কাল আমার মৃত্যু হবে!.. পৃথিবীতে এমন একটি প্রাণীও থাকবে না যে আমাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝেছিল। আমি বাস্তবিক যে-রকম, কেউ আমাকে তার চেয়ে ভালো ভাবে, কেউ ভাবে খারাপ...। কেউ বলবে: সে মানুষটা ভালো ছিল; অন্যরা বলবে: সে ছিল বদমায়েস। এই দুই মতামতই ভুল হবে। এর পরেও বেঁচে থাকার কষ্ট ভোগের মানে আছে? তবুও বেঁচে থাকি — কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে, নতুন কিছুর আশায়...। কী হাস্যকর, কী বিরক্তিকর!

আমি ন... দুর্গে আসবার পর দেড় মাস কেটে গেছে। মাক্সিম মাক্সিমীচ শিকারে বেরিয়েছে...। আমি একেবারে একা। জানালার ধারে বসে আছি।

বাইরে ধূসর মেঘ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে। কুয়াশার ভিতর দিয়ে সূর্যকে দেখাচ্ছে যেন হলদে একটা ছোপ। এখন ঠাণ্ডা; বাতাস আর্তনাদ করছে, খড়খড়িগুলো শব্দ করছে...। এ-সব কী একঘেয়ে!.. আবার আমার ডায়েরি লিখে চলব। নানা অদ্ভুত ঘটনা ঘটায় সেটা লেখায় বাধা পড়েছিল।

শেষ পাতাটা আবার পড়ে হাস্যোদ্দীপক মনে হল। ভেবেছিলাম মারা যাব, কিন্তু সেটা ছিল অসম্ভব, কারণ দুঃখের পেয়ালার শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমি তখনও পান করি নি। এখন মনে হয় আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে হবে।

যা সব ঘটেছে কী পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ ভাবে আমার স্মৃতিতে সেগুলো আঁকা হয়ে গেছে! সময় তার একটি রেখা বা পোঁচও মুছতে পারে নি!

মনে পড়ছে ডুয়েলের আগের রাত্রে একবারও দু'চোখের পাতা বন্ধ করতে পারি নি। বেশীক্ষণ ধরে লিখতে পারি নি, কারণ এক রহস্যময় অস্বস্তি আমার ওপর ভর করেছিল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছিলাম। তারপর বসে পড়লাম। টেবিলের ওপর ছিল ওয়ালটার স্কটের একটি উপন্যাস। বইটা খুললাম। সেটির নাম 'ওল্ড মর্টালিটি*)। প্রথমে কষ্ট করে পড়তে হচ্ছিল, তারপর কল্পনার যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে দেখতে-দেখতে সবকিছু ভুলে গেলাম।

স্কটল্যাণ্ডের চারণকবির গ্রন্থ যে এককেটি প্রীতিকর মুহূর্ত দান করে, তার প্রতিদানস্বরূপ কি তিনি পরলোকে কিছুই পান না?..

অবশেষে ভোর হল। আমার স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে গেছে। আয়নায় নিজের মুখ পরীক্ষা করলাম। মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে ফ্যাকাশে পাণ্ডুর রঙ, তখনও সেখানে বিচিত্র উৎকণ্ঠিত রাত্রির আভাস রয়েছে। কিন্তু আমার চোখগুলো ঘিরে বাদামি গোল দাগ পড়া সত্ত্বেও সেগুলো নিষ্ঠুর ও দাম্ভিকভাবে জ্বলছে। নিজের উপর সন্তুষ্ট হয়ে উঠলাম।

ঘোড়াগুলোয় জিন চড়াবার আদেশ দিয়ে, পোশাক পরে তাড়াতাড়ি স্নানের জন্য চললাম। গ্যাসের বুদ্বুদে জ্বলুনি-ধরা ঠাণ্ডা নারজানের জলে ডুব দেবার সময় অনুভব করলাম আমার শারীরিক ও মানসিক বল ফিরে আসছে। এমন অবসাদশূন্য ও সতেজ হয়ে স্নান সেরে বেরুলাম যে মনে হতে লাগল বুঝি নাচের আসরে চলেছি। এর পরেও বলবেন যে শরীরের সঙ্গে আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই!..

বাড়ি ফিরে দেখি ডাক্তার পেঁছেছেন। পরনে তাঁর ঘোড়ায় চড়ার ধূসর ব্রিচেস, আর্‌হালুক*, আর মাথায় একটা চের্‌কেসীয় টুপি। এই বিরাট লোমশ টুপির তলায় তাঁর শীর্ণ, ছোট্ট শরীরটা দেখে আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম। তাঁর মুখের ভাবটা মোটেই রণপ্রিয় নয়; সাধারণত তাঁর মুখটা যে-রকম লম্বা দেখায় তার চেয়ে বেশী লম্বা এখন দেখাচ্ছে।

তাঁকে বললাম, 'এত বিষণ্ণ কেন, ডাক্তার? সম্পূর্ণ উদাসভাবে শ'খানেকবার কি আপনি লোকদের অন্য জগতে বিদায় জানান নি? কল্পনা করুন আমার পিত্তঘটিত জ্বর হয়েছে আর বাঁচবার কিংবা মরবার সম্ভাবনা আমার সমান। দুটি ঘটনাই স্বাভাবিক। আমাকে এমন এক রোগী বলে কল্পনা করতে চেষ্টা করুন যার অসুখটা আপনি ধরতে পারছেন না — তাতে আপনার কৌতূহল সম্পূর্ণভাবে জেগে উঠবে। আপনি এখন নানা গুরুত্বপূর্ণ শরীরবিদ্যা সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ আমাকে নিয়ে করতে পারেন...। অপঘাত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকাটাই কি একটা আসল অসুখ নয়?'

এই কথাটা ডাক্তারের মনে ধরল, তিনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন।

আমরা ঘোড়ায় চাপলাম। ভের্‌নের দু'হাত দিয়ে লাগাম চেপে ধরলেন। যাত্রা শুরু হল। চক্ষের নিমেষে গ্রামের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গের পাশ দিয়ে গিরিসংকটে প্রবেশ করলাম। তার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটি পথ। তার অর্ধেকটা দীর্ঘ ঘাসে ঢাকা। খানিক ছাড়া-ছাড়া তার ভেতর দিয়ে কোলাহল করতে-করতে চলে গেছে ছোটো-ছোটো স্রোত। সেগুলো আমাদের পার হতে হল। ডাক্তার অত্যন্ত অস্বস্তি পেলেন, কারণ তাঁর ঘোড়াটা প্রতিবারেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ছিল।

এর চেয়ে নীল আর তাজা সকাল কখনও দেখেছি বলে মনে হল না! সবুজ পাহাড়ের চুড়োগুলোর উপর সূর্য সবে উঁকি দিয়েছে। তার রশ্মির প্রথম উত্তাপের সঙ্গে রাত্রির মিলিয়ে-আসা শীতলতা সমস্ত চেতনার উপর এক মধুর অবসাদ ছড়িয়ে দেয়। তখনও গিরিসংকটে তরুণ দিনের প্রফুল্ল রশ্মি প্রবেশ করে নি। আমাদের দু'দিকে যে-সব পাহাড় উঠেছে তাদের শুধু চুড়োগুলোয় সেগুলো সোনালী রঙ ধরাচ্ছিল। পাহাড়ের গভীর ফাটলের ভিতরকার ঘন ঝোপের গাছপালাগুলো সামান্য বাতাস বইলেই আমাদের উপর রুপোলী বৃষ্টিপাত করছিল। মনে পড়ছে সেই মুহূর্তে

* এশিয়াবাসী পুরুষদের খাটো পোশাক। — সম্পাঃ

প্রকৃতিকে যে-রকম ভালোবেসেছিলাম সে-রকম কখনও বাসি নি। কী কৌতূহল নিয়েই না আমি লক্ষ্য করছিলাম চওড়া আঙুর পাতার ওপরকার প্রতিটি শিশির-বিন্দুর কম্পন, যার ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল লক্ষ-লক্ষ রামধনু-রঙের রশ্মি! কী আগ্রহ নিয়েই না অস্পষ্ট দিগন্তকে ভেদ করে যেতে চাইছিল আমার দৃষ্টি! পথ সেখানে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠেছে, পাহাড়গুলো হয়ে উঠেছে আরও নীল আর ভয়ঙ্কর — মনে হয় অবশেষে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরে গিয়ে মিশেছে। নির্বাক হয়ে আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম।

হঠাৎ ভের্নের প্রশ্ন করলেন, 'আপনি উইল করেছেন?'

'না।'

'আপনি যদি মারা যান তা হলে কী হবে?..'

'উত্তরাধিকারীরা নিজে থেকেই হাজির হবে।'

'আপনার এমন কোনো বন্ধু নেই যার কাছে আপনার শেষ-বিদায়ের কথা পাঠাতে চান?..'

আমি মাথা নাড়লাম।

'পৃথিবীতে এমন কোনো মহিলা নেই যাঁর কাছে আপনি কোনো স্মারক-চিহ্ন রেখে যেতে চান?..'

উত্তরে বললাম, 'ডাক্তার, আপনি কি চান আপনার কাছে আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করি?.. আপনি ত জানেন আমার সে-বয়স নেই যখন লোকে প্রেমিকদের নাম বলতে-বলতে এক-এক গোছা সুগন্ধী, কিংবা গন্ধহীন, মাথার চুল বন্ধুকে উইল করে দিয়ে মারা যায়। যখন আমি আসন্ন এবং সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা ভাবি তখন শুধু নিজের কথাই স্মরণ করি; কেউ-কেউ তা-ও করে না। যে-সব বন্ধুরা কাল আমাকে ভুলে যাবে কিংবা, যেটা আরও খারাপ — আমার নামে ঈশ্বরই জানেন, কী ধরনের আজগুবি গল্প রটাবে, আর মেয়েরা, যারা অন্য পুরুষদের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমাকে উপহাস করবে, যাতে মৃত-ব্যক্তির ওপর তাদের ঈর্ষা না জাগে — তাদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা কেন? জীবনের আলোড়ন থেকে কয়েকটি ধারণা আমি গড়ে তুলেছি, কিন্তু কোনো অনুভূতি নয়। বহুদিন থেকে বুদ্ধি দিয়ে বেঁচে আছি, হৃদয় দিয়ে নয়। আমার নিজের আবেগ ও কাজকে আমি ওজন করি, বিশ্লেষণ করি কঠোর কৌতূহল দিয়ে, কিন্তু কোনো সহানুভূতি তার মধ্যে থাকে না। আমার মধ্যে দুটি মানুষ আছে: একজন বাঁচে পুরোপুরি,

অন্যজন যুক্তিতর্ক করে, আর প্রথমজনের ওপর রায় দেয়। প্রথমজন সম্ভবত এখন থেকে ঘণ্টা খানেক পরে আপনার এবং পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবে, আর দ্বিতীয়জন... দ্বিতীয়জন?.. চেয়ে দেখুন, ডাক্তার, ডানদিকের পাহাড়ের ওপর তিনটে কালো-কালো মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন কি? মনে হচ্ছে ওরা আমাদের প্রতিপক্ষ?..'

আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম।

পাহাড়ের নীচের ঝোপে তিনটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। আমাদের ঘোড়াগুলোকেও সেখানে বেঁধে সরু পথ ধরে পাহাড়ের এক সমতল কিনারের দিকে চললাম। গ্রুশ্‌নিৎস্কি সেখানে অপেক্ষা করছিল অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং ইভান ইগ্‌নাতিয়েভিচ নামে আর একজন সেকেণ্ডের সঙ্গে। তার পদবীটা কখনও শুনি নি।

শ্লেষের হাসি হেসে অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

আমার ঘড়িটা বার করে তাকে দেখালাম।

সে ক্ষমা চাইল। বলল তার ঘড়িটা এগিয়ে চলছে।

তারপর কয়েক মিনিট ধরে অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। অবশেষে গ্রুশ্‌নিৎস্কির দিকে ফিরে ডাক্তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন।

তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় আপনারা দু'জনে লড়াই করবার আগ্রহ দেখিয়ে সম্মানের কাছে ঋণ-মুক্ত হয়েছেন। এখন আপনারা কোনো এক শর্তে রাজী হয়ে ব্যাপারটার আপসে নিষ্পত্তি করতে পারেন।'

বললাম, 'আমি রাজী।'

ক্যাপ্টেন গ্রুশ্‌নিৎস্কির দিকে চোখ টিপল। সে ভাবল আমি ভয় পেয়েছি। তাই তার হাবভাব হয়ে উঠল উদ্ধত, যদিও সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তার মুখে ছিল ফ্যাকাশে পাণ্ডুর আভা। আমাদের পৌঁছবার পর এই প্রথমবার আমার দিকে সে মুখ তুলে তাকাল। তার দৃষ্টিতে অস্বস্তি, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ধরা পড়ল।

সে বলল, 'আপনার শর্ত কী বলুন এবং নিশ্চিত হতে পারেন যে আমি আপনার জন্যে যথাসাধ্য করব...'

'আমার শর্তগুলো এই: এখন আপনি সবাইকার সামনে আপনার রটানো অপবাদগুলোকে মিথ্যে বলে স্বীকার করবেন এবং আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন...'

'মশাই, এ-ধরনের প্রস্তাব করার সাহস আপনার কী করে হল তা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি...'

'এ-ছাড়া আর কী প্রস্তাব আমি করতে পারি?..'

'গুলি চালিয়ে এর নিষ্পত্তি আমরা করব।'

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম।

'তাই হোক; শুধু মনে রাখবেন আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনকে মরতেই হবে।'

'আশা করি সে-ব্যক্তি হবেন আপনি...'

'আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ যে ঠিক তার বিপরীত ঘটবে...'

সে ঘাবড়ে গেল, আরক্ত হয়ে উঠল, তারপর অস্বাভাবিকভাবে হাসল।

ক্যাপ্টেন হাত ধরে তাকে এক পাশে নিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে তারা ফিসফিস করে কথা বলল। এখানে যখন পৌঁছেছিলাম তখন বেশ শান্ত ছিলাম, কিন্তু এখন এই সব ঘটনায় চটে উঠতে লাগলাম।

ডাক্তার আমার কাছে এলেন।

স্পষ্টই দুশ্চিন্তা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'শুনুন, এদের ষড়যন্ত্রের কথাটা ভুলে গেছেন?.. পিস্তলে কী করে গুলি ভরতে হয় আমি জানি না, কিন্তু তাই যদি হয়...। আপনি অদ্ভুত লোক! জানিয়ে দিন তাদের মতলবের কথা আপনি জানেন বলে। তা হলে তারা সাহস করবে না...। এর পেছনে কী যুক্তি আছে? তারা আপনাকে মুর্গীর মতো গুলি করে মারবে...'

'দয়া করে শান্ত হোন ডাক্তার, ভয় পাবেন না, খানিক অপেক্ষা করুন...। এমন ব্যবস্থা করব যাতে তারা কোনও সুবিধে না পায়। ওদের ফিসফিস করতে দিন...'

'মশাইরা, ব্যাপারটা ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে!' উচ্চ স্বরে তাদের বললাম। 'যদি লড়তেই হয়, আসুন লড়া যাক। গতকাল ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করার অবসর আপনাদের ছিল...'

ক্যাপ্টেন উত্তর দিল, 'আমরা প্রস্তুত মশাইরা, নিজের-নিজের জায়গায় দাঁড়ান!.. ডাক্তার, অনুগ্রহ করে ছ'পা মেপে দেবেন...'

'নিজের-নিজের জায়গায় দাঁড়ান!' ইভান ইগ্নাতিচ চিঁ-চিঁ করে কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল।

আমি বললাম, 'ক্ষমা করবেন। আরও একটি শর্ত আছে। যে-হেতু মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়তে আমরা প্রস্তুত আমাদের সব রকম ভাবে

সাবধান হতে হবে যাতে এই বিবাদের কথা গোপনীয় থাকে আর আমাদের সেকেণ্ডের ঘাড়ে কোনো দায়িত্ব না পড়ে। আপনারা রাজী?..'

'আমরা সম্পূর্ণ রাজী।'

'আচ্ছা, আমি যা ভেবে দেখেছি, বলি। ডান পাশের ওই খাড়া পাহাড়ের এক সমতল কিনার দেখছেন? সেখান থেকে নীচ পর্যন্ত তিরিশ সাজেন হবে, বেশীও হতে পারে। নীচের পাথরগুলো এবড়ো-খেবড়ো। আমরা প্রত্যেকেই একেবারে ধারে দাঁড়াব, ফলে সামান্য আঘাতও মারাত্মক হয়ে উঠবে। এর সঙ্গে আপনার ইচ্ছের মিলে যাবার কথা, কারণ আপনি নিজেই ছ'পা দূরত্বের কথা প্রস্তাব করেছেন। আমাদের মধ্যে একজন যদি আহত হয় নিঃসন্দেহে নীচে পড়ে সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ডাক্তার গুলি সরিয়ে ফেলবেন আর এই আকস্মিক মৃত্যুকে সহজেই দুর্ঘটনা বলে চালানো যাবে। আমরা লটারি করে দেখব প্রথম কার গুলি চালাবার দান। আমার শেষ কথা হল, অন্য কোনো প্রস্তাবে আমি লড়াই করতে রাজী নই।'

গ্রুশ্‌নিৎস্কির দিকে অর্থপূর্ণভাবে চেয়ে ক্যাপ্টেন বলল, 'তাই হবে।' গ্রুশ্‌নিৎস্কি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। প্রতি মুহূর্তে তার মুখের চেহারা বদলাচ্ছে। তাকে এক কঠিন অবস্থায় ফেলেছি। সাধারণ অবস্থায় আমার পা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে আমাকে সে সামান্য আহত করতে পারত। ফলে তার প্রতিশোধ নেওয়া হত, আবার বিবেকের উপরেও বিশেষ বোঝা চাপত না। এখন কিন্তু হয় তাকে আকাশে গুলি ছুঁড়তে হয়, নয়ত হতে হয় খুনী, কিংবা, শেষ পর্যন্ত তার নীচ মতলব ত্যাগ করে আমার মতোই সমান ঝুঁকি নিতে হয়। সে-মুহূর্তে তার অবস্থায় পড়তে আমি চাইতাম না। ক্যাপ্টেনকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। আমি লক্ষ্য করলাম কী রকম তার ঠোঁটগুলো এখন নীল হয়ে উঠে কাঁপছে। ক্যাপ্টেন কিন্তু তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ঘৃণার হাসি হাসল। বেশ জোরেই গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে সে বলল, 'বোকা কোথাকার! তুমি কিচ্ছু বোঝো না। চলুন, মশাইরা, যাওয়া যাক!'

ঝোপের ভেতর দিয়ে সরু এক আঁকাবাঁকা পথ সেই খাড়াই জায়গাটার দিকে চলে গেছে। এই স্বাভাবিক সিঁড়ির বিপজ্জনক ধাপগুলো পাথরের ভাঙা টুকরো দিয়ে সৃষ্ট। ঝোপঝাড়গুলো মুঠো করে ধরে আমরা উঠতে লাগলাম। আগে-আগে চলল গ্রুশ্‌নিৎস্কি, পিছনে তার দুই সেকেণ্ড। ডাক্তার আর আমি চললাম সবচেয়ে শেষে।

আন্তরিকভাবে আমার হাতটা চেপে ধরে ডাক্তার বললেন, 'আপনি আমাকে অবাক করেছেন। দেখি আপনার নাড়িটা। ওহো, দারুণ লাফাচ্ছে!.. কিন্তু আপনার মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। শুধু চোখদুটো আপনার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী জ্বলজ্বল করছে।'

হঠাৎ ছোটো-ছোটো পাথর আমাদের পায়ের কাছে সশব্দে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কী ঘটেছে? গ্রুশ্‌নিৎস্কি হোঁচট খেয়েছে; যে-ডালটা সে ধরেছিল সেটা গেছে ভেঙে আর তার সেকেণ্ডরা ধরে না ফেললে সে পিছন দিকে পড়ত।

আমি চেঁচিয়ে তাকে বললাম, 'সাবধান। ঠিক সময়ের আগে পড়বেন না। এটা অশুভ লক্ষণ। জুলিয়াস সিজারের কথা*) ভেবে দেখুন!'

শেষ পর্যন্ত আমরা সেই খাদের উপর বেরিয়ে-থাকা পাহাড়ের চুড়োয় পেঁছিলাম। জায়গাটা মিহি বালিতে ছেয়ে রয়েছে, যেন ডুয়েলের জন্যই বিশেষ করে তাদের ছড়ানো হয়েছে। চারিদিকে সকালের সোনালী কুয়াশা-মণ্ডিত হয়ে পাহাড়ের চুড়োগুলো অসংখ্য পশুপালের মতো যেন জড় হয়েছে। দক্ষিণে শ্বেত এল্‌ব্রুস*) উঠেছে তুষার-মণ্ডিত পাহাড়ের চুড়োর সারির শেষে। সেই চুড়োগুলোর মধ্যে পুবে বাতাসে উড়ে এসে পালকের মতো মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের এক সমতল কিনারের ধারে এসে নীচে তাকালাম। মাথাটা প্রায় ঘুরে উঠল। কবরের মতো ঠাণ্ডা আর অন্ধকার নীচেটা। সময় আর ঝড়ে ছুঁড়ে-ফেলা শ্যাওলামোড়া এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলো শিকারের জন্য ওত্‌ পেতে রয়েছে।

যে-জায়গায় আমাদের লড়াই করার কথা সেটা প্রায় নিখুঁত এক ত্রিভুজের আকারের। বেরিয়ে-থাকা কোণ থেকে ছ'পা মাপা হল। স্থির হল বিপক্ষের গুলির সম্মুখীন প্রথম যাকে হতে হবে তাকে দাঁড়াতে হবে একেবারে ধারে, খাদের দিকে পিছন করে। যদি সে নিহত না হয় তা হলে প্রতিদ্বন্দ্বীরা স্থান পরিবর্তন করবে।

গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে সব রকম সুবিধে দিতে আমি স্থির করলাম, কারণ তাকে আমি পরখ করতে চাই। তার হৃদয়ে ঔদার্যের কোনো স্ফুলিঙ্গ হয়ত জাগতে পারে। তা হলে সবকিছুই ভালো হবে। কিন্তু অহংকার আর চারিত্রিক দুর্বলতার জিৎ হতে হবেই । যদি নিয়তি আমাকে বাঁচায় তা হলে তাকে যে দয়া করি নি তার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে চাইলাম। নিজের বিবেকের সঙ্গে এ-ভাবে লাভজনক চুক্তি কে না করে?

ক্যাপ্টেন বলল, 'ডাক্তার, ভাগ্য নির্ণয় করতে*) শুরু করুন!'

ডাক্তার পকেট থেকে রুপোর একটি মুদ্রা বার করে উঁচু করে তুলে ধরলেন।

'টেল,' হঠাৎ যেন বন্ধুর কাছ থেকে খোঁচা খেয়ে জেগে উঠে গ্রুশ্‌নিৎস্কি চিৎকার করে উঠল।

'হেড,' আমি বললাম।

বাতাসে মুদ্রাটি উৎক্ষিপ্ত হয়ে ঠং করে মাটিতে পড়ল। সেটাকে দেখার জন্য সবাই আমরা ছুটলাম।

গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে আমি বললাম, 'আপনার কপাল ভালো। আপনাকেই প্রথম গুলি ছুঁড়তে হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমাকে নিহত না করলে আমি কিন্তু ফস্‌কাব না — শপথ করে বলছি।'

সে আরক্ত হয়ে উঠল। নিরস্ত্র লোককে হত্যা করার কল্পনায় সে উঠল লজ্জিত হয়ে। গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম আর মুহূর্তের জন্য মনে হল সে বুঝি আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু এ-ধরনের জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা কী করে সে স্বীকার করতে পারে?.. তার কাছে শুধু একটিমাত্র পথ খোলা আছে: আকাশে গুলি ছোঁড়া। আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে সে আকাশে গুলি ছুঁড়বে! একমাত্র কারণ তাকে সে-কাজে বাধা দিতে পারে: সে হয়ত ভাবতে পারে আমি দ্বিতীয়বার ডুয়েল লড়ার দাবি জানাব।

আমার জামার আস্তিন ধরে টেনে ডাক্তার বললেন, 'সময় হয়ে গেছে! এখনও যদি না বলেন যে এদের মতলব আপনি জানেন তা হলে মৃত্যু নিশ্চিত। দেখুন, ইতিমধ্যেই সে গুলি ভরতে শুরু করেছে। আপনি না বললে, আমি বলব...'

'না, না, ডাক্তার!' তাঁর হাত ধরে আমি বললাম। 'সবকিছুই আপনি ভণ্ডুল করে ফেলবেন। আপনি কথা দিয়েছিলেন বাধা দেবেন না বলে...। এতে আপনার মাথা ব্যথারই বা কী কারণ? হয়ত আমি নিহত হতেই চাই...'

বিস্মিত হয়ে ডাক্তার আমার দিকে তাকালেন।

'সে-কথা স্বতন্ত্র!.. শুধু পরপারে গিয়ে আমাকে দুষবেন না...'

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন তার পিস্তলগুলোয় গুলি ভরে ফেলেছে। একটা সে গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে দিল, হেসে ফিসফিস করে কী যেন বলে, অন্যটা আমাকে।

পাহাড়ের এক সমতল কিনারের সবচেয়ে দূর-কোণে দাঁড়ালাম, বাঁ পা

দিয়ে পাথরটা শক্ত করে ধরে, সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে, যাতে সামান্য আহত হলে পিছন দিকে না পড়ি।

মুখোমুখি দাঁড়াল গ্রুশ্‌নিৎস্কি এবং সঙ্কেত দেবার পর তুলতে লাগল তার পিস্তলটা, তার হাঁটু কাঁপতে লাগল। সে সোজা টিপ করল আমার কপালে...

আমার বুকের মধ্যে পাশবিক ক্রোধ চাগিয়ে উঠল।

অকস্মাৎ পিস্তলের নলটা নামিয়ে কাগজের মতো সাদা হয়ে উঠে তার সহকারীর দিকে সে তাকাল।

ভাঙা গলায় সে বলল, 'আমি পারব না।'

ক্যাপ্টেন উত্তর দিল, 'কাপুরুষ!'

গুলির শব্দটা শোনা গেল। গুলিটা আমার হাঁটু ঘেঁষে গেছে। আপনা থেকে কয়েক পা এগিয়ে এলাম কিনার থেকে যথাসম্ভব শীঘ্র সরে যাবার জন্য।

ক্যাপ্টেন বলল, 'ভাই গ্রুশ্‌নিৎস্কি, দুঃখের কথা তুমি ফস্‌কেছ! এবার তোমার পালা! ওখানে গিয়ে দাঁড়াও। যাবার আগে আমাকে আলিঙ্গন কর, কারণ আর আমাদের দেখা হবে না!' তারা আলিঙ্গন করল। ক্যাপ্টেন বহু কষ্টে হাসি চাপল। 'ভয় পেও না,' গ্রুশ্‌নিৎস্কির দিকে ধূর্তভাবে চেয়ে সে বলল, 'পৃথিবীর সবকিছুই একেবারে বাজে!.. প্রকৃতি, নিয়তি, এমন কি জীবনেরও দাম নেই!'

সমুচিত গাম্ভীর্যের মধ্যে এই বিষাদময় উক্তি করার পর ক্যাপ্টেন নিজের জায়গায় ফিরে গেল। ইভান ইগ্‌নাতিচও সজল নয়নে গ্রুশ্‌নিৎস্কিকে আলিঙ্গন করল। এখন গ্রুশ্‌নিৎস্কি একা দাঁড়াল আমার মুখোমুখি। যে-আবেগ আমার বুকের মধ্যে তখন তোলপাড় করেছিল আজ পর্যন্ত তাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি: আহত অহঙ্কারের বিরক্তি, ঘৃণা এবং ক্রোধ মেশানো ছিল সেই আবেগ; কারণ এ-কথা উপলব্ধি করেছিলাম যে এই লোকটা, যে এখন অমন ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে এবং শান্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, দু'মিনিট আগে সে কুকুরের মতো আমাকে গুলি করতে গিয়েছিল নিজেকে বিন্দু মাত্র বিপদগ্রস্ত না করে — কারণ পায়ে আর সামান্য বেশী আহত হলে নিঃসন্দেহে আমি পাহাড় থেকে নীচে নিক্ষিপ্ত হতাম।

কয়েক মিনিট ধরে সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, চেষ্টা করলাম সেখানে সামান্যতম অনুশোচনার চিহ্ন আবিষ্কার করতে। তার

পরিবর্তে মনে হল যেন দেখলাম সে হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

তাকে তখন বললাম, 'মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে উপদেশ দিচ্ছি।'

'নিজের চেয়ে আমার আত্মা সম্বন্ধে আপনাকে বেশী দুর্ভাবনা করতে হবে না। আপনার কাছে অনুরোধ, আর কাল-বিলম্ব না করে গুলি চালান।'

'আপনি তা হলে আপনার অপবাদ প্রত্যাহার করবেন না? কিংবা ক্ষমা চাইবেন না আমার কাছে?.. ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনার বিবেক কি কিছুই আপনাকে বলছে না?'

অশ্বারোহীবাহিনীর ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, 'মিস্টার পেচোরিন! বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উপদেশ দেবার জন্যে এখানে আপনি আসেন নি। ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলুন। গিরিসঙ্কট দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় কেউ আমাদের দেখে ফেলতে পারে।'

'ভালো কথা। ডাক্তার, আমার কাছে আসবেন!'

ডাক্তার কাছে এলেন। বেচারা ডাক্তার! দশ মিনিট আগে গ্রুশ্‌নিৎস্কি যে-রকম ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল তার চেয়েও তিনি বেশী ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন।

উচ্চকণ্ঠে, স্পষ্টভাবে ধীরে-ধীরে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা যে-ভাবে ঘোষিত হয়, সেই ভাবে নিম্নোক্ত কথাগুলি আমি বললাম:

'ডাক্তার, এই ভদ্রলোকরা — নিঃসন্দেহেই তাড়াহুড়োয় — আমার পিস্তলের মধ্যে গুলি ভরতে ভুলে গেছেন। আপনাকে অনুরোধ, আবার আপনি ভরে দিন — ভালো করে ভরবেন!'

ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, 'হতেই পারে না! হতেই পারে না! দুটো পিস্তলই আমি ভরেছি; আপনারটা থেকে গুলি হয়ত গড়িয়ে পড়ে গেছে...। সেটা আমার দোষ নয়! আবার ভরবার অধিকার আপনার নেই... একেবারেই অধিকার নেই... এটা একেবারেই নিয়মের বিরুদ্ধে। কিছুতেই এটা আমি হতে দেব না...'

'ভালো কথা!' ক্যাপ্টেনকে আমি বললাম। 'তাই যদি হয় একই শর্তে এ-ব্যাপারের নিষ্পত্তি করা হবে আপনাতে আমাতে গুলি চালিয়ে...'

কী উত্তর দেবে সে ভেবে পেল না।

বুকের ওপর মুখ নামিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বিষণ্ণ মুখে গ্রুশ্‌নিৎস্কি দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তারের হাত থেকে ক্যাপ্টেন পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল। তাকে গ্রুশ্‌নিৎস্কি বলল, 'ওঁদের যা ইচ্ছে করতে দাও। তুমি ত নিজেই জানো যে এঁরা সত্যি কথাই বলছেন।'

অনর্থক ক্যাপ্টেন তাকে ইশারা করতে লাগল; গ্রুশ্‌নিৎস্কি মুখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে ডাক্তার পিস্তলে গুলি ভরে আমাকে দিলেন।

এটা দেখে ক্যাপ্টেন মাটিতে থুথু ফেলে পা ঠুকল। সে বলল, 'বন্ধু, তুমি নির্বোধ! দারুণ নির্বোধ!.. আমাকে যখন বিশ্বাস করেছিলে, আমার সব কথাই শোনা তোমার উচিত ছিল...। তোমার যা পাওয়া উচিত তাই পেতে চলেছ! অতএব যাও, মাছির মতো মর...' সে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেতে-যেতে বিড়বিড় করল, 'এটা কিন্তু একেবারেই নিয়মের বিরুদ্ধে।'

আমি বললাম, 'গ্রুশ্‌নিৎস্কি! এখনও সময় আছে। তোমার রটানো মিথ্যে অপবাদগুলো প্রত্যাহার কর। তা হলে সবকিছু আমি ক্ষমা করব। আমাকে বোকা বানাতে তুমি পারো নি, এতেই আমার অহঙ্কার তৃপ্ত। ভেবে দেখ এক সময় আমরা বন্ধু ছিলাম...'

তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোতে লাগল।

উত্তরে সে বলল, 'গুলি করুন! নিজের ওপর বিতৃষ্ণা এসে গেছে, আর আপনাকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে আপনি হত্যা না করলে কোনো-না-কোনো রাতে আপনার পিঠে আমি ছোরা বসাব। পৃথিবীতে আমরা দু'জনা বাঁচতে পারি না...'

আমি গুলি চালালাম...

ধোঁয়া যখন সরে গেল তখন আর কিনারে গ্রুশ্‌নিৎস্কি নেই। উঁচু জায়গাটার ধারে শুধু সামান্য ধুলো উড়ছে।

একই সঙ্গে সবাই চিৎকার করে উঠল।

ডাক্তারকে বললাম, 'Finita la comedia!'*

তিনি উত্তর দিলেন না। আতঙ্কে মুখ ফেরালেন।

আমি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে গ্রুশ্‌নিৎস্কির সেকেণ্ডদের নীচু হয়ে অভিবাদন করলাম।

---

* কমেডি শেষ হল! (ইতালীয় ভাষায়)

পথ দিয়ে নীচে নামবার সময় গ্রুশ্‌নিৎস্কির রক্তাক্ত মৃত দেহটাকে পাথরগুলোর মাঝখানে দেখতে পেলাম। আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে গেল...

ঘোড়াটাকে খুলে ধীরে-ধীরে বাড়ির দিকে চললাম। হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। মনে হল সূর্য তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, তার আলো আমাকে উত্তপ্ত করতে পারল না।

গ্রামে পেঁছিবার আগে ডান দিকের এক গিরিসংকটে প্রবেশ করলাম। ঠিক সেই সময় কারুর সঙ্গ আমি সহ্য করতে পারতাম না। একলা থাকতে চাইলাম। লাগামগুলো আলগা করে ঝুলিয়ে, বুকের ওপর মাথাটা নামিয়ে বহুক্ষণ চললাম। অবশেষে একেবারে অপরিচিত এক জায়গায় নিজেকে আবিষ্কার করলাম। ঘোড়াটাকে পিছনে ফিরিয়ে বড় রাস্তাটা খুঁজতে লাগলাম। ইতিমধ্যেই তখন সূর্যাস্ত হয়েছে। যখন কিস্‌লভোদ্‌স্কে পেঁছিলাম তখন আমি ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে ক্লান্ত এক মানুষ।

আমার ভৃত্য জানাল যে ভের্‌নের এসেছিলেন। দুটি চিঠি সে দিল: একটি তাঁর লেখা, অন্যটি ভেরার।

প্রথমটি খুললাম; তাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি ছিল:

'সব কিছুই যথাসম্ভব ঠিকমতো করা হয়েছে; বিকৃত দেহটা আনিয়ে বুক থেকে গুলিটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রত্যেকেরই বিশ্বাস তার মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত। কম্যান্ডাণ্ট শুধু মাথা নাড়ছিলেন, সম্ভবত আপনাদের বিবাদের কথা তিনি শুনেছিলেন। কিন্তু কোনো মন্তব্য তিনি করেন নি। আপনার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোতে পারেন... যদি পারেন...। বিদায়...'

দ্বিতীয়টি খোলবার আগে অনেকক্ষণ ইতস্তত করলাম... আমাকে সে কী লিখতে পারে?.. ভাবী অমঙ্গলের পূর্ববোধে বুকটা কেঁপে উঠল।

এই সেই চিঠিটা যার প্রতিটি কথা মনের মধ্যে অনপনেয়ভাবে গাঁথা হয়ে গেছে:

'এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে তোমাকে লিখছি যে আমাদের আর দেখা হবে না। কয়েক বছর আগে আমরা যখন বিদায় নিয়েছিলাম এ-কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে হল আমাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করার। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি নি, সেই পরিচিত স্বরে আমার দুর্বল

হৃদয় আবার বিজিত হল... কিন্তু তার জন্যে তুমি আমায় ঘৃণা করবে না, করবে কি? এ-চিঠিটা একাধারে বিদায়ের এবং আত্মস্বীকৃতির: যে-দিন থেকে তোমাকে ভালোবেসেছি সে-দিন থেকে এ-পর্যন্ত আমার হৃদয়ে যা-কিছু জমে আছে তার সবটা তোমাকে বলতে হবে। তোমাকে দোষ দেব না — অন্য যে-কোনো পুরুষ হলে যেমন করত, আমার সঙ্গে তুমি সেই রকমই ব্যবহার করেছ। নিজস্ব সম্পত্তির মতো আমাকে তুমি ভালোবেসেছিলে পারস্পরিক আনন্দ, ভয় এবং দুঃখের উৎস হিসেবে — যা না থাকলে জীবন ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হয়ে ওঠে। সে-কথাটা একেবারে প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম...। তুমি কিন্তু অসুখী হয়েছিলে, আর আমি নিজেকে বলি দিয়েছিলাম এই আশায় যে একদিন তুমি আমার আত্মত্যাগকে উপলব্ধি করবে, একদিন হয়ত বুঝতে পারবে আমার অসীম ভালোবাসাকে, যাকে কোনোকিছুই বদলাতে পারে না। তারপর থেকে অনেক সময় কেটে গেছে। তোমার হৃদয়ের সমস্ত গোপন কথা আমি জানতে পেরেছি... আর দেখছি আমার আশাটা মিথ্যে। ভাবতে কী দারুণ কষ্ট হয়! কিন্তু আমার প্রেম আর হৃদয় গলে এক হয়ে গেছে: শিখা আগের চেয়ে নিষ্প্রভ, কিন্তু এখনও সেটা নেভে নি।

'চিরকালের জন্যে আমরা বিদায় নিচ্ছি। তবু নিশ্চিত থেকো আর কাউকে আমি ভালোবাসব না। আমার হৃদয় তোমার ওপর তার সমস্ত ঐশ্বর্য, তার অশ্রু এবং আশা উজাড় করে দিয়েছে। তোমাকে যে একদিন ভালোবেসেছিল অন্য পুরুষদের সে খানিক ঘৃণার দৃষ্টিতে না দেখে পারে না। তার কারণ এই নয় যে তাদের চেয়ে তুমি ভালো — না, না! তার কারণ এই যে তোমার চরিত্রের মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে, এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, যা আছে শুধু তোমারই মধ্যে, এমন কিছু যা উদ্ধত, যা রহস্যময়। তুমি যা-কিছুই বল না কেন, তোমার স্বরে থাকে এক অজেয় ক্ষমতা। তোমার মধ্যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই এমন বর্তমান, যা অন্য কারুর মধ্যে নেই; অন্য কারুর মধ্যে মন্দের এমন আকর্ষণী শক্তি নেই। কারুর চোখের দৃষ্টিতে এমন পূর্ণ-পরিতৃপ্তির আশ্বাস আমি পাই না। তোমার চেয়ে ভালো কেউই জানে না কী করে তার শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে লাগাতে হয়, আর তোমার মতো কেউই অমন আন্তরিক অসুখী হতে পারে না, কারণ তোমার মতো তার উল্টোটা নিজেকে বোঝাতে কেউই চেষ্টা করে না।

'আমার এই অকস্মাৎ চলে যাবার কারণটা এবার বলব। তোমার মনে

হবে ব্যাপারটা সামান্যই, কারণ তার সঙ্গে আমি একাই শুধু সংশ্লিষ্ট।

'আজ সকালে আমার স্বামী এসে গ্রুশ্নিৎস্কির সঙ্গে তোমার ঝগড়ার কথা বললেন। আমার মুখ দেখে নিশ্চয়ই কিছু বোঝা গিয়েছিল, কারণ অনেকক্ষণ তীক্ষ্নভাবে আমার চোখের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন। এই চিন্তায় আমার মূর্ছার উপক্রম হল যে তোমাকে এক ডুয়েল লড়তে হবে, আর তার কারণটা আমি। মনে হল বুঝি আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে...। এখন যখন পরিষ্কার করে ভাবতে পারছি, তখন আমি নিশ্চিত যে তুমি বেঁচে থাকবে। আমাকে ছাড়া মরা তোমার পক্ষে অসম্ভব, অসম্ভব! ঘরের মধ্যে আমার স্বামী অনেকক্ষণ পায়চারি করলেন। তিনি আমাকে কী বলেছিলেন মনে নেই, মনে নেই আমিই বা কী উত্তর দিয়েছিলাম... সম্ভবত তাঁকে বলেছিলাম তোমাকে ভালোবাসি...। শুধু এটা মনে আছে যে আমাদের কথোপকথনের শেষে সাঙ্ঘাতিক একটা কথা বলে আমাকে অপমান করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে শুনলাম গাড়ি প্রস্তুত করতে আদেশ দিতে...। তিন ঘণ্টা হল জানালার পাশে বসে তোমার প্রত্যাগমন আশা করছি...। নিশ্চয়ই তুমি বেঁচে আছ, তুমি মরতে পার না!.. গাড়ি প্রায় প্রস্তুত...। বিদায়, বিদায়... আমার উদ্ধার নেই — কিন্তু তাতে কী?.. শুধু যদি নিশ্চিত হতে পারতাম যে সর্বদাই আমাকে তোমার মনে থাকবে — আমাকে ভালোবাসার কোনো কথাই বলছি না, না — শুধু মনে রেখো...। বিদায়! ওরা আসছে... চিঠিটা লুকিয়ে ফেলতে হবে...

'মেরিকে তুমি ভালোবাসো না, বাসো কি? তাকে তো তুমি বিয়ে করবে না? আমার জন্যে এই ত্যাগ স্বীকার তোমায় করতেই হবে। তোমার জন্যে পৃথিবীর সবকিছু আমি ত্যাগ করেছি...'

উন্মাদের মতো দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আমার ঘোড়ার জিনের উপর লাফিয়ে বসলাম। উঠোন দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পিয়াতিগোর্স্কের পথে তাকে পূর্ণ গতিতে ছোটালাম। নির্মমভাবে ক্লান্ত ঘোড়াটাকে জুতোর কাঁটা দিয়ে আঘাত করে চললাম। পাথুরে পথ দিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে ও দারুণ ঘামতে-ঘামতে আমাকে নিয়ে সে ছুটল।

পশ্চিমের পাহাড়গুলোর ওপর বিশ্রামরত কালো একটা মেঘের মধ্যে সূর্য অদৃশ্য হল। গিরিসঙ্কট হয়ে উঠল অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। পাথরের ভিতর দিয়ে পদ্কুমক নিষ্প্রভ একঘেয়ে গর্জনে বয়ে চলেছে। অধৈর্য হয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে আমি ছুটে চললাম। হয়ত পিয়াতিগোর্স্কে

তার দেখা পাব না — এই চিন্তা হাতুড়ির বাড়ির মতো বুকের মধ্যে আঘাত করতে লাগল। হায়, শুধু এক মিনিটের জন্য যদি তার দেখা পাই, শুধু আর এক মিনিটের জন্য, বিদায় জানাতে, তার হাতটা মুঠো করে ধরতে...। আমি প্রার্থনা করলাম, অভিশাপ দিলাম, কাঁদলাম, হাসলাম... না, কোনো কথাই আমার উদ্বেগ, আমার হতাশাকে প্রকাশ করতে পারবে না!.. এখন যখন বুঝলাম তাকে চিরকালের মতো হারাতে বসেছি, পৃথিবীর মধ্যে ভেরা তখন আমার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হয়ে উঠল — জীবন, সম্মান অথবা আনন্দেরও চেয়ে! একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কী সব অদ্ভুত, উন্মাদের মতো চিন্তা ঝাঁকে-ঝাঁকে আমার মাথার মধ্যে আসতে লাগল...। আর ক্রমাগতই ছুটে চলেছি, জুতোর কাঁটা দিয়ে নির্দয়ভাবে ঘোড়াটাকে আঘাত করতে-করতে। অবশেষে লক্ষ্য করলাম ঘোড়াটা আরও কষ্ট করে নিশ্বাস টানছে, দুয়েকবার সমতল জমিতে সে হোঁচট খেল...। এসেন্‌তুকি*) নামে কসাকদের একটি গ্রাম, যেখানে আর একটা ঘোড়া পেতে পারি, তখনও পাঁচ ভার্স্ট দূরে।

আরও দশ মিনিট ধরে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবার শক্তি ঘোড়াটার থাকলে সবদিক বজায় থাকত। কিন্তু অকস্মাৎ পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসার সময় সংকীর্ণ এক গিরিসংকটের পথের বাঁকে মাটির ওপর সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে আমি জিন থেকে নামলাম। কিন্তু যতই কেন না তাকে ওঠাবার চেষ্টা করি, যতই কেন না তার লাগাম ধরে টানি, আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। তার দু' পাটি আটকে-যাওয়া দাঁতের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এলো অস্পষ্ট এক ঘড়ঘড় শব্দ আর কয়েক মিনিট পরে সে মারা গেল। স্তেপে আমি একা, শেষ আশাটাও ঘুচেছে। পায়ে হেঁটে যাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার হাঁটু দুমড়ে যেতে লাগল। বিনিদ্র রাত্রি আর দিনের উৎকণ্ঠায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে ভিজে ঘাসের ওপর পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ সেখানে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে অশ্রু আর চাপা-কান্নার শব্দ চাপতে চেষ্টা না করে আকুল হয়ে কাঁদলাম। মনে হল বুকটা বুঝি ভেঙে খান-খান হয়ে যাবে। ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গেল আমার সব সংকল্প আর স্থৈর্য। আমার মানসিক শক্তি তখন অসাড়, বিচারশক্তি পঙ্গু। সে-সময় কেউ আমাকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফেরাত।

নৈশ শিশির এবং পার্বত্য বাতাস আমার মাথাকে ঠাণ্ডা এবং চিন্তাকে

সুসংবদ্ধ করার পর আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম যে যে-আনন্দের মৃত্যু ঘটেছে তার পশ্চাদ্ধাবন নিরর্থক আর মূঢ়তা। এর চেয়ে বেশী কী আমি চাই? তাকে দেখতে চাই কী? কেন? আমাদের মধ্যে সবকিছুই কি শেষ হয়ে যায় নি? বিদায়ের তিক্ত এক চুম্বন আমার স্মৃতিকে মধুরতর করে তুলবে না — তা ছাড়া তাতে বিদায় নেওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

যাই হোক আমার পক্ষে এটা ভালো লাগবার কথা যে আমি কাঁদতেও পারি! যদিও আসল কারণ, সম্ভবত, ক্লান্ত স্নায়ু, বিনিদ্র রাত্রি, যে-দু-মিনিট পিস্তলের নলের দিকে চেয়ে ছিলাম সেটা আর শূন্য পাকস্থলী।

যা-কিছু ঘটে তা ভালোর জন্যই! যদি এই নতুন দুঃখের অনুভূতির কথা ধরা যায় তা হলে বলব — সামরিক ভাষায় যাকে বলে — আক্রমণ-কেন্দ্র থেকে শত্রুর মন আকর্ষণ করা। কাঁদলে ভালোই হয়। যদি ঘোড়াটাকে না ছোটাতাম আর তারপর পনেরো ভার্স্ট হেঁটে ফিরতে বাধ্য না হতাম, তা হলে সম্ভবত সে-রাত্রে দু-চোখের পাতা এক করতে পারতাম না।

ভোর পাঁচটায় কিস্‌লভোদ্‌স্কে ফিরলাম। তারপর বিছানায় পড়ে ওয়াটারলুর পর নেপোলিয়ন যে-রকম ঘুমিয়েছিলেন*) সে-রকম ঘুমুলাম।

যখন ঘুম ভাঙল, বাইরেটা তখন অন্ধকার। আর্‌হালুক খুলে খোলা এক জানালার পাশে বসলাম — পাহাড় থেকে বয়ে-আসা বাতাস ঠাণ্ডা করল আমার হৃদয়কে, যাকে ক্লান্তির গভীর নিদ্রাও তখন পর্যন্ত শান্ত করতে পারে নি। দীর্ঘ ও ঘন লিণ্ডেন গাছগুলো নদীর ওপর ছায়া ফেলেছিল। তাদের চুড়োর ভেতর দিয়ে দুর্গ আর গ্রামের বাতিগুলো মিটমিট করছে। উঠোনটা একেবারে স্তব্ধ। রানীর বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে গেছে।

ডাক্তার প্রবেশ করলেন। রেখাঙ্কিত তাঁর কপাল। অভ্যেসমতো হাত তিনি প্রসারিত করলেন না।

'ডাক্তার, কোথা থেকে আসছেন?'

'রানী লিগোভ্‌স্কায়ার বাড়ি থেকে। তাঁর কন্যা অসুস্থ — স্নায়বিক বিকার...। কিন্তু সে-জন্যে আসি নি। মুশকিল হয়েছে কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করতে শুরু করেছে। যদিও নিশ্চিতভাবে কিছুই প্রমাণ করা যায় না, তবুও আপনাকে আরও সাবধান হতে উপদেশ দিচ্ছি। এইমাত্র রানী বললেন যে তিনি জানেন যে তাঁর কন্যার জন্যে আপনি ডুয়েল লড়েছেন। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, নামটা কী? — তাঁকে বলেছেন। রেস্তোরাঁতে গ্রুশ্‌নিৎস্কির সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি তিনি শুনেছিলেন। আপনাকে সাবধান করতে

এসেছিলাম। বিদায় — সম্ভবত আমাদের আর দেখা হবে না — খুব সম্ভব আপনাকে বদলি করে দেবে।'

দরজার কাছে মুহূর্তের জন্য তিনি থামলেন; আমার করমর্দন করতে তিনি চেয়েছিলেন...। তাকে সামান্যতম ইচ্ছে দেখালেই আমার গলা তিনি জড়িয়ে ধরতেন। কিন্তু পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি চলে গেলেন।

মনুষ্য চরিত্রের নির্ভুল দৃষ্টান্ত এটা! সবাই তারা সমান। যদিও আগে থেকেই তারা এই ঘটনার মন্দ দিকটা জানত, তবুও তারা এতে সাহায্য করেছে, উপদেশ দিয়েছে, উপায়ান্তর না-দেখে এমনকি তাদের সমর্থনও জানিয়েছে — আর তারপর তারা কিনা নিজেদের এ-ব্যাপার থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় এবং অননুমোদনের ভঙ্গীতে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে মুখ ফেরায় যে সমস্ত দায়িত্ব নিজে ঘাড় পেতে নিয়েছিল। সবাই সমান, এমন কি সবচেয়ে দয়ালু থেকে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি পর্যন্ত!..

পরের দিন সকালে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন... দুর্গে যাবার আদেশ পাবার পর রানীর বাড়িতে গেলাম বিদায় জানাতে।

জরুরি কিছু বলার আছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে রানী লিগোভ্‌স্কায়াকে যখন জানালাম যে আমি শুধু বিদায় নিতে এসেছি, তিনি থতমত খেয়ে গেলেন।

'আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার দারুণ দরকারী কথা আছে।'

কোনো কথা না বলে আমি বসলাম।

স্পষ্টই বোঝা গেল কোথা থেকে তিনি শুরু করবেন বুঝতে পারছেন না। মুখ তাঁর আরক্ত হয়ে উঠল। মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে তিনি টেবিল চাপড়াতে লাগলেন। অবশেষে বাধো-বাধো স্বরে বললেন:

'মঁসিয়ে পেচোরিন, মনে হয় আপনি মানী লোক।'

আমি মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানালাম।

তিনি বলে চললেন, 'এ-বিষয়ে আমি একেবারেই নিঃসন্দেহ, যদিও আপনার আচার-ব্যবহার খানিকটা সন্দেহজনক। সম্ভবত আপনার নিজের দিক থেকেও তার যুক্তি আছে, যেটা আমি জানি না। তাই যদি থাকে এখন সে-কথা আমাকে বলা দরকার। অপমানের হাত থেকে আমার মেয়েকে আপনি বাঁচিয়েছেন, তার জন্যে ডুয়েল লড়ে আর নিজের জীবনকে বিপন্ন করে...। উত্তর দেবেন না, কারণ জানি সে-কথা স্বীকার করবেন না, যে-হেতু

গ্রুশ্‌নিৎস্কি মারা গেছে (তিনি নিজের ওপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন)। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করুন, আশা করি আপনাকেও তিনি ক্ষমা করবেন!.. এ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। আপনাকে তিরস্কার করার অধিকার আমার নেই, কারণ এর মূলে হল আমার মেয়ে, যদিও তার কোনও দোষ নেই। সব কথাই আমাকে সে বলেছে... সব কথাই, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আপনি বলেছিলেন তাকে আপনি ভালোবাসেন... সে-ও স্বীকার করেছে আপনাকে ভালোবাসে বলে। (এই জায়গায় রানী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন)। সে অসুস্থ, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেটা সাধারণ অসুখ নয়! কোন গোপন দুঃখ তাকে মেরে ফেলছে। সে স্বীকার করে না, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে আপনিই তার কারণ...। আমার কথা শুনুন: হয়ত আপনার ধারণা যে আমি অনেক টাকা-পয়সা আর বড় চাকুরে পছন্দ করি — তাই-ই যদি হয়, আপনি ভুল করছেন। আমি শুধু চাই আমার মেয়ে সুখী হোক। আপনার বর্তমান অবস্থা খুব সুখের নয়। কিন্তু সেটা বদলাতে পারে। আপনি ধনী; আমার মেয়ে আপনাকে ভালোবাসে। তাকে এমনভাবে মানুষ করা হয়েছে যে সে তার স্বামীকে সুখী করতে পারে। আমি ধনী, আর সে আমার একমাত্র মেয়ে...। এখন বলুন, কিসে আপনার বাধা?.. এ-সব কথা আপনাকে বলা উচিত হয় নি, কিন্তু আপনার সম্মান আর হৃদয়কে আমি বিশ্বাস করি — মনে রাখবেন আমার কেবল একটি মেয়েই আছে... মাত্র একটি...'

তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন।

আমি বললাম, 'রানী, আপনার কথার জবাব দিতে আমি পারব না। আপনার মেয়ের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে দিন...'

'হতেই পারে না!' চিৎকার করে বলে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

বিদায় নিতে উদ্যত হয়ে বললাম, 'আপনার যা অভিরুচি।'

তিনি খানিক ভেবে, আমাকে অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করে, ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল। বুকের ভিতরটা তোলপাড় করছে। কিন্তু আমার চিন্তাধারা সুসম্বদ্ধ, মাথাটাও ঠাণ্ডা। মনোরম মেরির প্রতি প্রেমের ক্ষুদ্রতম স্ফুলিঙ্গকে হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্কার করার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

দরজা খুলল; সে প্রবেশ করল। হা ভগবান! তাকে শেষ দেখার পর কী দারুণ সে বদলে গেছে — মাত্র অল্প ক'দিন আগেই তো তাকে দেখেছিলাম!

ঘরের মাঝখানে পেঁাছে সে টলে উঠল। লাফিয়ে তার কাছে গেলাম, আমার হাতটা দিলাম তাকে ধরতে, তারপর এক আরাম-কেদারায় তাকে বসালাম।

তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ কেউই আমরা একটা কথা বললাম না। অবর্ণনীয় বেদনায় ভরা তার বড়-বড় চোখদুটো মনে হল যেন খানিক আশা নিয়ে আমার চোখের উপর তাকিয়ে আছে। তার ফ্যাকাশে ঠোঁটদুটো হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। হাঁটুর ওপর ভাঁজ করে রাখা তার কোমল হাতদুটো এত ভঙ্গুর আর স্বচ্ছ যে তার জন্য আমার দুঃখ হল।

আমি বললাম, 'রাজকুমারী, আপনি জানেন আপনাকে আমি বিদ্রূপ করেছি, জানেন ত?.. আমাকে নিশ্চয়ই আপনি অবজ্ঞা করবেন।'

তার গালদুটি অসুস্থ লোকের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠল।

'অতএব আমাকে আপনি ভালোবাসতে পারেন না...' আমি বলে চললাম।

সে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের উপর কনুই রেখে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল আর আমার মনে হল যেন তার চোখে জল চিকচিক করতে দেখলাম।

'হা ভগবান!' এত মৃদু স্বরে সে বলল, যা প্রায় শোনাই যায় না।

অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠল। এ-ভাবে আর এক মিনিট কাটলে তার পায়ের ওপর নিশ্চয়ই লুটিয়ে পড়তাম।

'অতএব নিজেই বুঝতে পারছেন,' অস্বাভাবিকভাবে হেসে যথা সম্ভব দৃঢ়ভাবে আমি বলে চললাম, 'নিজেই বুঝতে পারছেন যে আপনাকে আমি বিয়ে করতে পারি না। যদিই বা আপনি বিয়ে করতে চান, অল্প দিনের মধ্যে তার জন্যে আপনি অনুশোচনা করবেন। আপনার মায়ের সঙ্গে যে-কথা হয়েছে তার জন্যেই এ-রকম খোলাখুলি আর নির্দয়ভাবে কথা বলতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার মনে হয় তিনি ভুল বুঝেছেন। আপনি কিন্তু সহজেই তাঁর ভুল ভাঙতে পারবেন। আপনি ত দেখতেই পাচ্ছেন আপনার চোখে আমি এক নীচ আর জঘন্য ভূমিকা অভিনয় করছি। সে-কথা আমিও স্বীকার করছি। আপনার জন্যে এর বেশী আর কিছু করতে পারি না। আমার সম্বন্ধে আপনার মতামত যত খারাপই হোক না কেন, আমি তা মেনে নেব...। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনার সামনে নিজেকে আমি হেয়

করছি। আমাকে যদি বা ভালোও বেসে থাকেন, এই মুহূর্ত থেকে আমাকে আপনি অবজ্ঞা করবেন — এখন থেকেই, তাই না?..'

মার্বেলের মতো ফ্যাকাশে মুখ আমার দিকে সে ফেরাল, কিন্তু তার চোখদুটো অদ্ভুত রকম জ্বলজ্বল করছে।

'আপনাকে আমি ঘৃণা করি...' সে বলল।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে, সসম্ভ্রমে নত হয়ে অভিবাদন করে আমি বেরিয়ে গেলাম।

এক ঘণ্টা পরে ডাকবাহী এক ত্রয়কায় দ্রুতবেগে আমি কিস্‌লভোদ্‌স্ক ছেড়ে চললাম। এসেন্‌তুকি থেকে কয়েক ভার্স্ট দূরে পথের ধারে আমার ঘোড়াটার মৃতদেহ চোখে পড়ল। জিনটা নেই — সম্ভবত এ-পথ দিয়ে যাবার সময় কোনো কসাক সেটা সরিয়েছে। সেটার জায়গায় ঘোড়াটার পিঠে বসে আছে দুটো দাঁড়কাক। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মুখ ফেরালাম...

আর এখন এই বিষণ্ণ দুর্গে বসে অতীতের কথা ভাবতে-ভাবতে প্রায়ই নিজেকে প্রশ্ন করি: অদৃষ্ট আমার সামনে যে-পথ খুলেছিল, যার ভেতরে ছিল প্রশান্ত আনন্দ আর মানসিক শান্তির আভাস — কেন সে-পথে যাই নি?.. সে-রকম অবস্থার সঙ্গে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতাম না! আমি সেই নাবিকের মতো যে জন্মেছে আর বড় হয়ে উঠেছে এক জলদস্যুদের জাহাজে। ঝঞ্ঝা আর সংঘাতে সে এত অভ্যস্ত যে তাকে যদি তীরে রাখা হয় — সেখানকার কুঞ্জবনের ছায়া যতই আকর্ষণীয় আর সূর্য যতই কেন না কোমল হোক — সে মন-মরা ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ঊর্মিমালার একঘেয়ে গর্জন শুনতে-শুনতে আর অস্পষ্ট দিগন্তের দিকে চাইতে-চাইতে সে বেলাভূমির ওপর সমস্ত দিন ধরে পায়চারি করে। দিগন্তের যে-অস্পষ্ট রেখা নীল সমুদ্র আর ধূসর মেঘকে পৃথক করেছে সেখানে সে দেখতে চায় দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা-করে-থাকা জাহাজের পালের প্রথম ঝলক। প্রথমে তাকে সমুদ্রের পাখির ডানার মতো দেখায় আর তারপর তার নির্জন নঙ্গর-স্থানের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসার সময় জলের সাদা ফেনার মধ্যে তাকে যায় সুস্পষ্টভাবে দেখা...

৩

অদৃষ্টবাদী

সৈন্যবাহিনীর বাঁ পাশের এক কসাক গ্রামে একদা আমাকে দু'সপ্তাহ কাটাতে হয়েছিল। সেখানে মোতায়েন ছিল এক পদাতিক বাহিনী। পালা করে অফিসাররা এক-এক জনের বাড়িতে মিলিত হতেন। সন্ধেবেলায় সেখানে তাস খেলা হত।

একবার মেজর স...এর বাড়িতে বস্টোন খেলায় ক্লান্ত হয়ে তাসগুলো ফেলে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করেছিলাম। সেবার কথোপকথন যেমন চিত্তাকর্ষক ছিল সচরাচর তেমন হয় না। মুসলমানদের যে-বিশ্বাস যে মানুষের অদৃষ্ট আগে থেকে স্বর্গে নির্ধারিত হয়ে থাকে সে-বিষয়ে আমরা আলাপ করছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ছিল সেই বিশ্বাস। তার pro বা contra* আমাদের সবাইকারই নানা অসাধারণ ঘটনার কথা বলার ছিল।

বৃদ্ধ মেজর বললেন, 'আপনারা যে-সব কথা বলছেন তা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। আপনাদের মতামতকে প্রমাণ করার জন্যে যে-সব অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করছেন সেগুলো তো আপনারা কেউই দেখেন নি, তাই না?'

কয়েকজন বলল, 'নিশ্চয়ই না। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য লোকের কাছে শুনেছি...'

একজন বলল, 'এক্কেবারে বাজে কথা! সেই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিটি কে, যিনি সেই কাগজটা দেখেছেন যার উপর আমাদের মৃত্যুর দিন-ক্ষণ লেখা আছে?.. আর অদৃষ্ট বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা হলে কেন আমাদের মানসিক শক্তি আর বিচার-বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে? কেন আমাদের কাজের জন্যে জবাবদিহি করতে হয়?'

---

* স্বপক্ষে বা বিপক্ষে (লাতিন ভাষায়)।

ইতিমধ্যে একজন অফিসার, যে ঘরের এক কোণে বসেছিল, উঠে ধীরে-ধীরে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে আমাদের সবাইকার দিকে শান্ত গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাল। সে জন্মসূত্রে সার্বীয়, তার নাম থেকে সে-কথা জানা যায়।

লেফ্‌টেনাণ্ট ভুলিচ-এর চেহারার সঙ্গে চরিত্রের মিল আছে। তার দীর্ঘ দেহ, রোদেপোড়া গায়ের রঙ, কালো চুল, তীক্ষ্ন কালো চোখ, তার জাতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দীর্ঘ অথচ সুগঠিত নাক, ঠোঁটের ওপর সদা-বর্তমান ঠাণ্ডা বিষণ্ণ হাসি — এ-সমস্তই যেন তার চেহারাটাকে অসাধারণ করে তুলেছে। অদৃষ্টক্রমে যে-সব লোক তার সহকারী হয়েছে তাদের কাছে নিজের ভাবনা ও আবেগের কথা বলতে সে চায় না।

সে সাহসী, কথা বলে কম, কিন্তু তীক্ষ্নভাষী। কারুর কাছেই সে তার নিজের বা নিজের পরিবারের গোপন কথা বলত না। ক্বচিৎ সে মদ্যপান করত, তরুণী কসাক মেয়েদের কাছে কখনও প্রেম নিবেদন করত না। এই তরুণীদের না দেখলে জানা যায় না কী অপরূপ সুন্দরী তারা। লোকে কিন্তু বলত যে তার জ্বলজ্বলে চোখ দেখে কর্ণেলের স্ত্রী তার প্রেমে পড়েছে; কিন্তু এ-নিয়ে কেউ কোনো ইঙ্গিত করলে সর্বদাই সে চটে উঠত।

তার একটিমাত্র নেশাকে সে কখনও লুকোয় নি — জুয়াখেলার নেশা। সবুজ কাপড়-ঢাকা টেবিলের সামনে বসলে সে বিশ্বসংসার ভুলে যেত। সাধারণত সে হারত, কিন্তু ক্রমাগত মন্দভাগ্য তার একগুঁয়েমিকে শুধু বাড়িয়ে তুলত। গল্প আছে এক অভিযানের রাত্রে একটি বালিশের ওপর সে জুয়ার ব্যাঙ্ক রাখছিল, তার ভাগ্য দারুণ ভালো চলছিল। এমন সময় হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা যায়, বিপদের সঙ্কেত বেজে ওঠে এবং প্রত্যেকেই লাফিয়ে উঠে যার যার বন্দুক নিতে ছোটে। ভুলিচ নড়ে নি। একজন অতি আগ্রহী জুয়াড়ীকে সে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'ব্যাঙ্কের সব টাকা বাজি ধর।' সে দৌড়ে যাবার সময় উত্তর দিয়েছিল, 'সাতা!' চতুর্দিকের হৈচৈ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ভুলিচ তাস দিয়ে চলেছিল; দেখা গেল সেই লোকটি জিতেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন সে পেঁছিল ইতিমধ্যেই তখন দারুণ গোলাগুলি চলছে। গুলি কিংবা চেচেনীয়দের তরোয়ালের দিকে ভুলিচ ভ্রূক্ষেপ করল না। ভাগ্যবান জুয়াড়ীটির খোঁজ সে করছিল।

সে তখন অন্যদের সঙ্গে লড়ছিল। শত্রুদের তারা তখন বন থেকে তাড়াতে শুরু করেছে। অবশেষে তার দেখা পেয়ে ভুলিচ চেঁচিয়ে উঠল, 'সাতা উঠেছে!' তারপর তার কাছে গিয়ে সে টাকার থলি বার করে তাকে দিয়ে দিল এই অসময়ে হিসেব-নিকেশ করতে তার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। এই অপ্রিয় কর্তব্য পালন করার পর ভুলিচ ছুটে গেল সৈন্যদের পুরোভাগে এবং যতক্ষণ না লড়াই থামল অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চেচেনীয়দের সঙ্গে সে গুলি বিনিময় করে চলল।

লেফ্‌টেনাণ্ট ভুলিচ যখন টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো সবাই চুপ করল সচরাচর সে যে-রকম মৌলিক মন্তব্য করে থাকে সে-রকম কিছু শোনবার আশায়।

'ভদ্রমহোদয়গণ!' সে বলল (তার স্বর শান্ত, যদিও সাধারণত সে যে-রকম ভাবে কথা বলে তার চেয়ে নীচু গলায়)। 'ভদ্রমহোদয়গণ, কেন অনর্থক এই বাদানুবাদ? আপনারা প্রমাণ চান: আমি প্রস্তাব করছি নিজেদের ওপর পরীক্ষা করে দেখা যাক মানুষ নিজের জীবন নিজে নিতে পারে কিনা কিংবা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে কিনা...। কে পরীক্ষা করে দেখতে চান?'

চতুর্দিক থেকে উত্তর এলো, 'আমি না! আমি না! কী অদ্ভুত লোক! এমন আজগুবি কথা কে কবে ভেবেছে!..'

ঠাট্টাচ্ছলে বললাম, 'আমি প্রস্তাব করছি একটা বাজি ধরা যাক।'

'কী ধরনের বাজি?'

'আমি বলছি অদৃষ্ট বলে কোনো কিছু নেই,' বলে আমার পকেট থেকে কুড়িটি স্বর্ণ মুদ্রা টেবিলে রাখলাম — আমার কাছে এ-ছাড়া আর কিছু ছিল না।

'বাজি,' ভোঁতা গলায় ভুলিচ উত্তর দিল। 'মেজর, আপনি বিচারক হবেন? এখানে পনেরটি স্বর্ণ মুদ্রা রইল। আপনার কাছে পাঁচটা পাই, অতএব বাকিটা আপনি দয়া করে পুষিয়ে দেবেন কি?'

মেজর বলল, 'বেশ, যদিও কী হচ্ছে সে-সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই নেই। কী ভাবেই বা আপনারা এর মীমাংসা করতে চান?..'

কোনো কথা না বলে ভুলিচ মেজরের শোবার ঘরে গেল। আমরা চললাম পিছন-পিছন। যে-দেয়ালে অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো তার কাছে গিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে সে একটা পিস্তল তুলে নিল — সেখানে নানা ধরনের নলের

পিস্তল ছিল। প্রথমে আমরা বুঝতে পারি নি সে কী করতে চায়। কিন্তু গুলি চালাবার জন্য পিস্তলটা প্রস্তুত করে যখন সে সেটার ঘোড়ার চাবি সরিয়ে দিল আমাদের মধ্যে কয়েকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠে তার হাত চেপে ধরল।

'কী করতে চাও? তুমি কী পাগল হলে?' তাকে উদ্দেশ্য করে তারা চেঁচিয়ে উঠল।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' হাত ছাড়াতে-ছাড়াতে স্থিরভাবে সে বলে চলল। 'আপনাদের মধ্যে কে আমার হয়ে কুড়িটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত?'

প্রত্যেকেই চুপ হয়ে সরে গেল।

পাশের ঘরে ভুলিচ এসে টেবিলের পাশে বসল। আমরা বাকী সবাই তার অনুসরণ করলাম। টেবিলের চারিপাশে বসার জন্য সে ইঙ্গিত করল। আমরা নিঃশব্দে তার আদেশ মানলাম, কারণ সেই মুহূর্তে আমাদের ওপর তার এক রহস্যময় প্রভাব বিস্তারিত হয়েছিল। তীব্র দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকালাম, কিন্তু আমার সন্ধানী দৃষ্টির দিকে সে শান্ত ও অবিচলিতভাবে তাকাল। তার ফ্যাকাশে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু প্রশান্তি সত্ত্বেও তার পাণ্ডুবর্ণ মুখের ওপর মৃত্যুর ছাপ আমি দেখতে পেলাম। আমি লক্ষ্য করেছি, এবং অনেক অভিজ্ঞ সৈনিক সে-কথাকে অনুমোদন করেছে যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে-ব্যক্তির মৃত্যু ঘটবে তার মুখের উপর তার অনিবার্য নিয়তি সম্পর্কে এমন কতকগুলো অদ্ভুত চিহ্ন ফুটে ওঠে অভিজ্ঞ চোখ সর্বদাই যা ধরতে পারে।

তাকে আমি বললাম, 'আপনি আজ মারা যাবেন।'

চমকে আমার দিকে ফিরল সে, কিন্তু শান্ত স্থির স্বরে উত্তর দিল:

'হয়ত যাব, আবার না যেতেও পারি...'

তারপর মেজরের দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল পিস্তলটায় গুলি ভরা আছে না নেই। নিজের বিহ্বলতার দরুন মেজর সেটা ঠিক স্মরণ করতে পারল না।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ভুলিচ যথেষ্ট হয়েছে। নিশ্চয়ই ওতে গুলি ভরা, কারণ বিছানার মাথার কাছে ওটা ছিল। কী জাতের রসিকতা এটা!..'

আর একজন বলে উঠল, 'বোকার মতো রসিকতা!'

'পাঁচের ওপর পঞ্চাশ বাজি আমি ধরব — পিস্তলটায় গুলি ভরা নেই বলে!' তৃতীয় একজন চেঁচিয়ে উঠল।

নতুন করে আবার বাজি ধরা শুরু হল।

এই সুদীর্ঘ অনুষ্ঠানে আমার বিরক্তি ধরে গেল।

আমি বললাম, 'শুনুন, হয় আপনার মাথার ওপর গুলি চালান, নয় ত পিস্তলটাকে দেয়ালে তার জায়গায় ঝুলিয়ে দিয়ে শুতে যাওয়া যাক।'

অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক কথা, শুতে যাওয়া যাক।'

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের কাছে অনুরোধ নড়বেন না!' বলে ভুলিচ পিস্তলের নলটা নিজের কপালে চেপে ধরল। সবাই আতঙ্কে পাথর হয়ে গেল।

'মিস্টার পেচোরিন,' সে বলে চলল, 'একটা তাস নিয়ে ওপরে ছুঁড়ুন।'

টেবিলের ওপর থেকে, এখন মনে পড়ছে, হরতনের টেক্কা তুলে উপর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। রুদ্ধ নিশ্বাসে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে এবং অস্পষ্ট কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমরা একবার পিস্তলটার একবার সেই মারাত্মক টেক্কাটার দিকে তাকিয়ে চললাম। সেটা তখন ধীরে-ধীরে কাঁপতে-কাঁপতে নীচে নেমে আসছে। যে-মুহূর্তে সেটা টেবিল স্পর্শ করল, ভুলিচ ঘোড়াটা টানল... কিন্তু পিস্তল থেকে গুলি বেরুল না।

অনেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ওটায় গুলি ভরা ছিল না...'

ভুলিচ বলল, 'সেটা আমরা পরখ করে দেখব।' আবার সে ঘোড়ার চাবি সরিয়ে দিয়ে জানালার ওপরকার ঝুলন্ত এক অফিসারের টুপির উপর নিশানা করল; গুলির শব্দ হল আর ধোঁয়ায় ভরে গেল ঘরটা! সেটা মিলিয়ে যাবার পর টুপিটাকে নামানো হল — ঠিক তার মাঝখানটা ফুটো হয়ে গেছে আর দেয়ালের মধ্যে গভীরভাবে গুলিটা গেছে গেঁথে।

পুরো তিন মিনিট ধরে কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। শান্তভাবে আমার টাকাগুলো ভুলিচ নিজের থলিতে ভরল।

আলোচনা হতে লাগল প্রথম বার পিস্তলটা দিয়ে গুলি ছোটে নি কেন। কেউ বলল পিস্তলের রঞ্জক ঘরের ফুটোটা নিশ্চয়ই বুজে গিয়েছিল, অন্যরা ফিসফিস করে বলল যে প্রথমে বারুদটা স্যাঁতসেঁতে ছিল, পরে ভুলিচ তার ওপর খানিক তাজা বারুদ ছড়িয়ে দিয়েছে। আমি কিন্তু তাদের জোর দিয়ে বললাম যে শেষোক্ত অনুমান ঠিক নয়, কারণ পিস্তলের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যও আমি চোখ সরাই নি।

ভুলিচকে বললাম, 'জুয়া-খেলায় আপনার ভাগ্য ভালো!'

আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে সে বলল, 'জীবনে এই প্রথম। ফারো কিংবা শ্‌টোসের চেয়ে এটা ভালো।'

'কিন্তু একটু বেশী বিপজ্জনক।'

'তা হলে আপনি অদৃষ্টে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন ত?'

'আমি তাতে বিশ্বাস করি। শুধু বুঝতে পারছি না কেন আমার মনে হয়েছিল আজ রাতেই আপনার মৃত্যু ঘটবে বলে...'

সেই একই ব্যক্তি, মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে শান্তভাবে পিস্তলের নলটা নিজের কপালের উপর টিপ করেছিল, এখন অকস্মাৎ রাগে জ্বলে উঠল, বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে উঠে সে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে! আমাদের বাজি শেষ হয়েছে। আমার মনে হয় আপনার কথা আপনি অসময়ে বলছেন...' নিজের টুপিটা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। তার ব্যবহারটা অদ্ভুত মনে হল — ঠিকই মনে হয়েছিল!..

অল্পক্ষণের মধ্যেই সবাই বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ি ফেরার পথে সবাই ভুলিচের পাগলাটে ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে নিজের মতামত জানাতে লাগল, আর সম্ভবত, আমাকে স্বার্থপর বলে সবাই এক মত হল — কারণ যে-লোক নিজের ওপর গুলি চালাতে চায় তার সঙ্গে সেই নিয়ে বাজি ধরেছিলাম বলে; যেন আমার সাহায্য ছাড়া তার আর কোনো সুযোগ ছিল না!..

গ্রামের জনহীন গলি-পথ দিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। প্রকাণ্ড অগ্নিদাহের আভার মতো পূর্ণ চন্দ্র বাড়িগুলোর মাথার খাঁজ-কাটা দিগন্ত থেকে সবে উঠে আসছে। কালচে-নীল আকাশে শান্তভাবে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে, আর এ-কথা ভেবে আমার মজা লাগল যে একদা এমন জ্ঞানী ব্যক্তিরা ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সামান্য এলাকা কিংবা অন্যান্য কাল্পনিক অধিকার নিয়ে আমাদের তুচ্ছ বিবাদ-বিসংবাদের ওপর নক্ষত্রদের প্রভাব আছে...। তবু এই বাতিগুলো, যেগুলোকে তাঁরা মনে করতেন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তাঁদের যুদ্ধ এবং যুদ্ধজয়ের কারণে, এখনও জ্বলে চলেছে অম্লান দীপ্তিতে, যদিও তাঁদের আবেগ আর আশাগুলো নিভে গেছে তাঁদের সঙ্গে বহুকাল আগে অমনোযোগী পথিক-পরিত্যক্ত অরণ্যপ্রান্তের শিবিরাগ্নির মতো। কিন্তু এই নিশ্চয়তা থেকে তাঁরা কী মানসিক শক্তিই না পেতেন যে স্বর্গ এবং সেখানকার সংখ্যাহীন অধিবাসীরা তাঁদের সর্বদা লক্ষ্য করছেন নিঃশব্দ সহানুভূতির দৃষ্টিতে!..

এদিকে আমরা, তাঁদের তুচ্ছ বংশধররা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াই কোনো রকম বিশ্বাস এবং গর্ব না নিয়ে, কোনো আনন্দ কিংবা আতঙ্ক না নিয়ে, আমাদের একমাত্র ভয় হল অনিবার্য মৃত্যুর, যার নামহীন আতঙ্কে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য, এমন কি ব্যক্তিগত আনন্দের জন্যও, মহৎ ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা পারি না, কারণ আমরা জানি আনন্দিত হওয়া অসম্ভব। উদাসীন হয়ে আমরা এক সংশয় থেকে অন্য সংশয়ে উপনীত হই, ঠিক যেমন আমাদের পূর্বপুরুষরা এক ভ্রান্তি থেকে অন্য ভ্রান্তির ওপর আছড়ে পড়তেন নিরাশ হয়ে, এবং মানুষ কিংবা নিয়তির সঙ্গে লড়াই করার ফলে আত্মা যে অস্পষ্ট অথচ গভীর আনন্দের আভাস পেয়ে থাকে সেটাকেও বাদ দিয়ে...

এ-ধরনের নানা চিন্তা আমার মনের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তাদের বাধা দিলাম না, কারণ বস্তুনিরপেক্ষ ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমার ভালো লাগে না — কোথায় তারা পৌঁছতে পারে?.. প্রথম যৌবনে আমি কল্পনাপ্রবণ ছিলাম। আমার অশান্ত উৎসুক মন যে-সব প্রতিমূর্তি আঁকত — কখনও বিষণ্ণ, কখনও উজ্জ্বল — সেগুলোকে সস্নেহে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসতাম। কিন্তু সেগুলো থেকে কী আমি পেয়েছি? কেবল ক্লান্তি, রাত্রে ভূতের সঙ্গে লড়াই করার পর কিংবা অনুশোচনায় ভরা অস্পষ্ট স্মৃতি যে-রকম অবসাদ আনে সেই রকম। এই অনর্থক সংগ্রামে আমি হারিয়েছি হৃদয়ের উত্তাপ এবং মানসিক শক্তির একাগ্রতা — কর্মঠ জীবনের জন্য যেগুলো অত্যাবশ্যক। যখন জীবন শুরু করলাম তার আগেই কল্পনায় সে জীবন অতিক্রম করেছি। তাই সেটায় আমার ক্লান্তি আর বিতৃষ্ণা এসে গেছে — অতিপরিচিত বইয়ের জঘন্য অনুকরণের মতো।

সন্ধের ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, আমার স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করেছে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি না এখনও আমি নিয়তিতে বিশ্বাস করি কিংবা করি না। সে-রাত্রে কিন্তু নিয়তির ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল। প্রমাণটা বিস্ময়কর! যদিও আমাদের পূর্বপুরুষদের এবং তাঁদের সবজান্তা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ করেছিলাম তবুও আবিষ্কার করলাম তাঁরা যে-ভাবে ভাবতেন আমিও সে-ভাবেই ভেবে চলেছি। কিন্তু এই বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হবার আগে সময়মতো আমি নিজেকে সামলে নিলাম। কোনো কিছু সুনিশ্চিতভাবে অস্বীকার করব না বা অন্ধভাবে মেনে নোব না — মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা করে

তত্ত্ববিদ্যা ছেড়ে পায়ের নীচের পথ লক্ষ্য করতে শুরু করলাম। এই সাবধানতা সময়োপযোগী হয়েছিল, কারণ একটা পুরু আর নরম কিন্তু স্পষ্টতই নিষ্প্রাণ জিনিসের ওপর হোঁচট খেলাম। আমি নীচু হলাম — জ্যোৎস্নায় পথটা এখন দেখা যাচ্ছে — আর দেখলাম তরোয়াল দিয়ে দু'টুকরো করা একটা শুয়োর আমার সামনে পড়ে রয়েছে...। সেটাকে ভালো করে লক্ষ্য করার আগেই পদধ্বনি শুনতে পেলাম: পাশের গলি থেকে দু'জন কসাক দৌড়ে আসছে। তাদের একজন আমার কাছে এসে প্রশ্ন করল মত্ত এক কসাককে তরোয়াল নিয়ে একটা শুয়োর তাড়া করে যেতে দেখেছি কিনা। তাদের জানালাম উক্ত কসাকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি, কিন্তু তার হিংস্র পৌরুষের ভাগ্যহীন বলিটাকে দেখালাম।

দ্বিতীয় কসাক বলল, 'কী ভয়ঙ্কর খুনে লোক! আকণ্ঠ চিখির* পান করার পরেই সে বেরিয়ে পড়ে সবকিছু টুকরো-টুকরো করে কাটতে। তার খোঁজে যাওয়া যাক, ইয়েরেমেইচ। তাকে বেঁধে রাখা দরকার নইলে...'

তারা চলে গেল। আগেকার চেয়ে আরও সাবধানে পথ চলতে লাগলাম। অবশেষে নিরাপদে বাড়ি পেঁছিলাম।

আমি এক বৃদ্ধ সার্জেন্টের বাড়িতে থাকতাম। তাকে পছন্দ করতাম তার ভদ্র স্বভাব এবং বিশেষ করে তার সুন্দরী কন্যা নাস্তিয়ার জন্য।

ফার কোট জড়িয়ে ফটকের কাছে মেয়েটি যথারীতি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। রাতের ঠাণ্ডায় নীল-হয়ে-যাওয়া তার সুন্দর ঠোঁটদুটির উপর জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। আমাকে দেখে সে হাসল। কিন্তু আমার মনে তখন অন্য সব ভাবনা ঘুরছে। 'শুভরাত্রি নাস্তিয়া,' তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বললাম। উত্তরে কী যেন বলতে গিয়ে সে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমার ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে একটা মোমবাতি জেব্লে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সাধারণত যে-রকম দেরি করে ঘুম আসে আজ কিন্তু তার চেয়েও বেশীক্ষণ ধরে ঘুম এলো না। যখন ঘুমোলাম পুব দিকটা ইতিমধ্যেই তখন ফর্সা হতে শুরু করেছে। স্পষ্টই কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল না সে-রাত্রে আমি ঘুমোই। ভোর চারটেয় আমার জানালায় দুটো ঘুসি পড়ল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ব্যাপার কী?.. নানা কণ্ঠস্বর চিৎকার

* অপরিপক্ক মদ্য বিশেষ। — সম্পাঃ

করে উঠল, 'উঠে পড়, জামা-কাপড় পরে নাও!' তাড়াতাড়ি পোশাক পরে বাইরে এলাম। 'কী হয়েছে জান?' যে-তিনজন অফিসার আমাকে ডাকতে এসেছিল সমস্বরে তারা বলল; মড়ার মতো তারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

'কী ব্যাপার?'

'ভুলিচ নিহত হয়েছে।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

তারা বলে চলল, 'হ্যাঁ, নিহত হয়েছে। তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক।'

'কোথায়?'

'যেতে-যেতে বলব।'

আমরা চললাম। যা ঘটেছে তার সবটাই তারা বলল, তার সঙ্গে যোগ করল মৃত্যুর আধ-ঘণ্টা আগে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে নিয়তি তাকে যে-ভাবে বাঁচিয়েছিল সে-সম্বন্ধে নানা মতামত। ভুলিচ অন্ধকার পথে একলা চলেছিল এমন সময় সেই মত্ত কসাক, শুয়োরটাকে সবে দু'টুকরো করে যে আসছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা খায়। সে হয়ত ভুলিচকে লক্ষ্য না করেই চলে যেত যদি না ভুলিচ অকস্মাৎ থেমে তাকে প্রশ্ন করত:

'কাকে খুঁজছ, ভাই?'

'তোমাকে,' উত্তরে তরোয়াল দিয়ে তাকে আঘাত করে কসাক বলল। তার কাঁধ থেকে প্রায় হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত কাটা গেল...। যে-দু'জন কসাককে আগে দেখেছিলাম, যারা খুনী ব্যক্তিকে অনুসরণ করছিল, ঘটনাস্থলে পেঁছে, তারা আহত ব্যক্তিকে তুলে নিয়েছিল। ইতিমধ্যেই কিন্তু তার শ্বাস-যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। সে বলেছিল মাত্র এই তিনটি কথা, 'তার কথাই ঠিক!' আমি শুধু কথাগুলোর অশুভ ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম; আমাকে উল্লেখ করেই সে বলেছিল। কিছু না ভেবেই বেচারার নিয়তির কথা বলেছিলাম। সহজাত অনুমানক্ষমতা ভুল করে নি। বাস্তবিকই তার বিকৃত অবয়বের ওপর আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ আমি আবিষ্কার করেছিলাম।

গ্রামের শেষ প্রান্তে খালি এক কুটিরে খুনে নিজেকে বন্ধ করে রেখেছিল। সেখানে আমরা গেলাম। অনেক মেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে সেদিকে ছুটছিল। প্রায়ই এক-একজন কসাক দেরি করে-করে কুটির থেকে লাফিয়ে পড়ে ক্ষিপ্রভাবে কোমরবন্ধে তরোয়াল আটকাতে-আটকাতে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। চারিদিকে সাঙ্ঘাতিক হৈচৈ।

অবশেষে ঘটনাস্থলে পেঁছলাম। দেখলাম কুটিরের চারিদিকে ভিড়

জমে উঠেছে। ভেতর থেকে তার দরজা জানালাগুলো ছিটকিনি-আঁটা। অফিসার আর কসাকরা উত্তেজিত হয়ে তর্ক করে চলেছে। মেয়েরা আর্তনাদ আর বিলাপ করছে। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করলাম। মুখে তার দারুণ হতাশার ছায়া। মোটা একটা কাঠের উপর বসেছিল সে, কনুই দুটো হাঁটুর ওপর, হাত দিয়ে ধরে ছিল নিজের মাথাটা: সেই ছিল খুনীর মা। মাঝে মাঝে ঠোঁটদুটো তার নড়ছে। প্রার্থনা করছে না অভিসম্পাত দিচ্ছে?

ইতিমধ্যে কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং অপরাধীকে ধরা প্রয়োজন হয়ে উঠল। প্রথমে যেতে কিন্তু কারুরই সাহস হল না।

জানালার কাছে গিয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আমি ভেতরে তাকালাম। ডান হাত দিয়ে একটা পিস্তল চেপে ধরে লোকটা মেঝেয় পড়ে রয়েছে। পাশে রয়েছে রক্তাক্ত একটা তরোয়াল। মুখটা তার ফ্যাকাশে, অর্থবোধক চোখগুলো ভয়াবহভাবে ঘুরছে। মাঝে মাঝে শিউরে উঠে মাথাটাকে সে চেপে ধরছে, যেন মনে পড়ে যাচ্ছে পূর্বদিনের স্মৃতি। তার অশান্ত দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো দৃঢ়তার আভাস নেই। মেজরকে বললাম কুটিরের দরজা ভেঙে কসাকদের ভেতরে প্রবেশ করার আদেশ দিতে কোনো বাধা নেই, কারণ — লোকটার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে আসার আগে — এখন যাওয়াই ভালো।

ঠিক তখনি কসাকদের এক বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন দরজার কাছে গিয়ে ভেতরের লোকটিকে নাম ধরে ডাকল। শেষোক্ত ব্যক্তি উত্তর দিল।

কসাকদের ক্যাপ্টেন বললেন, 'ভাই ইয়েফিমীচ, তুমি পাপ করেছ; আত্মসমর্পণ কর। এখন আর করার কিছু নেই!'

কসাক উত্তর দিল, 'কিছুতেই না!'

'ঈশ্বরের ক্রোধের কথা স্মরণ কর! তুমি ত নাস্তিক চেচেনীয় নও, তুমি সরল খ্রীষ্টান। তুমি বিপথে গিয়েছিলে, এখন আর করার কিছু নেই; তোমার অদৃষ্টকে ফাঁকি দিতে পারবে না!'

ভয়ংকর স্বরে কসাক উত্তর দিল, 'কিছুতেই ধরা দোব না!' গুলি চালাতে উদ্যত হয়ে পিস্তলটা সে তৈরি করে নিল, আমরা শুনলাম।

বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে কসাকদের ক্যাপ্টেন বলল, 'শোনো মা! তোমার ছেলের সঙ্গে কথা বল। হয়ত সে তোমার কথা শুনবে...। এ-ধরনের ব্যবহার দেখে ঈশ্বর রাগ করতে পারেন। চেয়ে দেখ, ভদ্রলোকরা দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন।'

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বৃদ্ধা মাথা নাড়াল।

মেজরের কাছে গিয়ে কসাকদের ক্যাপ্টেন বলল, 'ভাসিলি পেত্রোভিচ, ও ধরা দেবে না। ওকে আমি জানি। দরজা ভেঙে ঢুকলে আমাদের অনেককেই সে খুন করবে। গুলি করে ওকে মারবার আদেশ আপনি যদি দেন তা হলে কি ভালো হয় না? খড়খড়িতে একটা বড় রকম ফাটল আছে।'

সেই মুহূর্তে এক অদ্ভুত কল্পনা আমার মাথায় খেলল। ভুলিচের মতোই নিয়তিকে পরখ করতে চাইলাম।

মেজরকে বললাম, 'দাঁড়ান, ওকে আমি জীবন্ত ধরব।'

তাকে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত রাখতে কসাকদের ক্যাপ্টেনকে বলে এবং সঙ্কেত পাবার পর দরজা ভেঙে আমার সাহায্যে ছুটে আসার নির্দেশ জানিয়ে তিনজন কসাককে প্রবেশ পথের কাছে দাঁড় করালাম, তারপর কুটিরের পেছনে গিয়ে সেই ভয়ঙ্কর জানালার দিকে অগ্রসর হলাম। বুকের মধ্যে মারাত্মক তোলপাড় শুরু হল।

কসাকদের ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে হতচ্ছাড়া। আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস? নাকি ভাবছিস তোকে ধরতে পারব না? শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দরজায় ধাক্কা দিতে সে শুরু করল, এদিকে আমি ফুটোর ভিতর দিয়ে কসাকের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চললাম। এ-দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা সে করে নি। অকস্মাৎ খড়খড়িটা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করলাম, মাথাটা রইল সামনে। কানের পাশ দিয়ে তার পিস্তল থেকে গুলি ছুটল আর সেটা আমার কাঁধের উপরকার এক সামরিক চিহ্নকে নিয়ে গেল উড়িয়ে। পিস্তলের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে যাওয়ায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের পাশেই পড়ে-থাকা তরোয়ালটাকে খুঁজে পেল না। তার হাতদুটো চেপে ধরলাম। অন্যান্য কসাকরা দরজা ভেঙে প্রবেশ করল। তিন মিনিটের মধ্যেই অপরাধীকে হাত-পা বেঁধে প্রহরী-বেষ্টিতে অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হল। ভিড় ভেঙে গেল, অফিসাররা আমাকে অভিনন্দন জানালেন — বাস্তবিকই তাদের অভিনন্দন জানাবার কারণ ছিল।

এর পরেও কেউ অদৃষ্টবাদী না হয়ে কী করে পারে? কিন্তু নিশ্চিতভাবে কে বলতে পারে কোনো কিছুতে সে বিশ্বাস করে কিংবা করে না?.. আমরা ত ক্রমাগতই ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি অথবা বুদ্ধিবৃত্তির ভ্রমকে বিশ্বাস বলে মনে করি!..

সবকিছুকেই সন্দেহ করতে আমার ইচ্ছে হয়। এই মনোভাব আমার

চরিত্রের দৃঢ়তাকে প্রতিরোধ করে না। আমার কথা বলতে গেলে বলব যে ভাগ্যে কী হবে জানা না থাকায় নির্ভীকতর হয়ে আমি এগিয়ে যাই। হাজার হোক, মৃত্যুর চেয়ে বেশী ত আর কিছু ঘটতে পারে না — আর মৃত্যুকে ত কেউ পারে না এড়িয়ে যেতে!

দুর্গে ফিরে যা-কিছু দেখেছি আর যা-কিছু আমাকে নিয়ে ঘটেছে তার সব কথাই মাক্সিম মাক্সিমীচকে বললাম, আর জানতে চাইলাম নিয়তি সম্পর্কে তার মতামত। প্রথমে কথাটার মানে সে বুঝতে পারল না। যথাসাধ্য কথাটার মানে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তাতে মাথা দুলিয়ে অর্থপূর্ণভাবে সে বলল:

'শুনুন মশাই! বাস্তবিকই ব্যাপারটা অদ্ভুত...। ভালো কথা — এই সব এশিয়া দেশের পিস্তলগুলো ভালো করে তেল দিয়ে পরিষ্কার না করলে কিংবা আঙুল দিয়ে জোরে চেপে ঘোড়া না টিপলে প্রায়ই গুলি ছোটে না। স্বীকার করতেই হবে চের্কেসীয় বন্দুকগুলোও আমার ভালো লাগে না। আমাদের মতো লোকদের পক্ষে সেগুলো অসুবিধেজনক। বাঁটগুলো এত ছোটো যে খেয়াল না রাখলে আপনার নাকটাও ঝলসে যেতে পারে...। তাদের তরোয়ালগুলোর কথা অবশ্য আলাদা — শ্রদ্ধায় তাদের উদ্দেশ্যে আমি মাথা নোয়াই।'

তারপর অল্প ভেবে সে বলল:

'বেচারার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত...। রাত্রে কেন সে এক মাতালের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল!.. অবশ্য, সেটাই হয়ত ছিল তার ভবিতব্য!..'

তার কাছ থেকে আর কোনো কথা বার করতে পারলাম না। সাধারণত তত্ত্ববিদ্যার আলাপ-আলোচনা সে পছন্দ করে না।

১৮৩৮ — ১৮৩৯

টীকাটিপ্পনী

বেলা

পৃষ্ঠা ১৫

তিফ্‌লিস থেকে... আমি যাচ্ছিলাম। — তিফ্‌লিস — জর্জিয়ার প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (বর্তমানে জর্জিয়া সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী) ত্‌বিলিসি শহরের প্রাচীন নাম।

পৃষ্ঠা ১৫

নীচে আরাগ্‌ভা... — আরাগ্‌ভা (আরাগ্‌ভি) — ককেশাসের উল্লেখযোগ্য নদী।

পৃষ্ঠা ১৬

নিশ্চয়ই আপনি স্তাভ্‌রোপলে যাচ্ছেন? — স্তাভ্‌রোপল লেরমন্তভের আমলে ছিল উত্তর ককেশাসের প্রধান নগর, ককেশাস সেনাবাহিনীর সদর-দপ্তরের অবস্থানস্থল।

পৃষ্ঠা ১৭

...যত দিন ধরে আলেক্সেই পেত্রোভিচ এখানে রয়েছেন। — আলেক্সেই পেত্রোভিচ ইয়েরমোলভ (১৭৭৭-১৮৬১) — রুশ সামরিক ও রাষ্ট্রীয়

কর্মী, জেনারেল, ১৮১৬ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত ককেশাসের সামরিক ও পৌর শাসনক্ষমতার পরিচালক ছিলেন।

পৃষ্ঠা ১৭

লাইনে তিনি যখন আসেন... — লাইন — পাহাড়ীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ককেশাসে রুশ সীমান্তঘাঁটি।

পৃষ্ঠা ১৮

গুডপাহাড় — উত্তর ককেশাসের একটি পাহাড়।

পৃষ্ঠা ১৯

ক্রেস্তোভায়া পাহাড়ে কোনো হিমানী-সম্প্রাত দেখেছ কি — ক্রেস্তোভায়া পাহাড় অথবা ক্রেস্তোভায়া গিরিপথ তেরেক নদীর উপত্যকা থেকে আরাগ্‌ভা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত বৃহৎ ককেশাস পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী গিরিপথ।

পৃষ্ঠা ২০

আপনি কি বহুকাল ধরে চেচ্‌নায় আছেন? — চেচ্‌না — উত্তর ককেশাসের বিস্তীর্ণ প্রদেশের প্রাচীন নাম। ককেশাস যুদ্ধের সময় এই প্রদেশটি বিজিত হয়। বর্তমানে চেচেনো-ইন্‌গুশ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এলাকা।

পৃষ্ঠা ২১

আলেক্সেই পেত্রোভিচ যখন... আবিষ্কার করলেন। — ১৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ২২

...তেরেকের অন্য পারে এক দুর্গে... ছিলাম... — উত্তর ককেশাসে প্রবাহিত তেরেক ও কুবান নদীর পাড়ে পাহাড়ীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশীদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

পৃষ্ঠা ২৩

...ঘোড়ায় চেপে দৌড়ে আসতে-আসতে... — এখানে উল্লেখ করা হয়েছে ওস্তাদ ঘোড়সওয়ারদের একটি রীতির — ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে কৌশলপ্রদর্শন — ঘোড়া যখন পুরোদমে ছুটছে সেই অবস্থায় ঘোড়সওয়ারকে মাটিতে পড়ে থাকা টুপি তুলতে হয়।

পৃষ্ঠা ২৫

...কুবান পেরিয়ে আব্রেকদের সঙ্গে... — ককেশাস যুদ্ধের সময় দুঃসাহসী প্রতিহিংসাপরায়ণ, সশস্ত্র অশ্বারোহী আব্রেকরা রুশদের সঙ্গে অনন্তকালের শত্রুতার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। কুবান ও তেরেক নদীর পারের সীমান্তরেখায় যে সমস্ত রুশ অধিবাসীর বাস ছিল আব্রেকদের আক্রমণে তারা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হত।

পৃষ্ঠা ২৬

...ঘোড়াটা সমস্ত কাবার্দার মধ্যে ছিল বিখ্যাত — কাবার্দা — বৃহৎ ককেশাস পর্বতশ্রেণীর ঢাল এবং তৎসংলগ্ন সমভূমিতে অবস্থিত প্রদেশ। বর্তমানে কাবার্দা-বাল্‌কার স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এলাকাভুক্ত।

পৃষ্ঠা ২৭

...তেরেক ছাড়িয়ে... — ২২ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ২৯

...আসল গুর্‌দা... — গুর্‌দা — ককেশাসে বিশেষ পদ্ধতিতে টেম্পার করা উৎকৃষ্ট তরবারির ফলার নাম (বিখ্যাত অস্ত্র কারিগরের নাম অনুযায়ী)।

পৃষ্ঠা ৩৫

...তার উন্মত্ত জীবন তেরেকের কিংবা কুবানের ওপারে শেষ হয়েছিল। — অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রুশ কেল্লা ও জনবসতির উপর হানা দেবার সময় (২৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ)।

পৃষ্ঠা ৩৬

আপনার তরোয়ালটা সমর্পণ করবেন কি? — অফিসারকে গ্রেপ্তার করার সময় তার তরবারি নিয়ে নেওয়া হত। ঐ তরবারি ছাড়া বাড়ি থেকে বের হবার অধিকার তাঁর থাকত না।

পৃষ্ঠা ৪১

গুড়পাহাড়ের... — ১৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ৪৩

...ক্রেস্তোভায়ার পথে... — ১৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ৪৪

...জ্ঞানী গাম্বা... — গাম্বা — জর্জিয়ায় ফরাসী কন্সাল, ককেশাসে ব্যাপক পর্যটন করেন। তাঁর ভ্রমণ-লিপিতে ক্রেস্তোভায়া পাহাড় ভুলক্রমে মণ্ট সেণ্ট ক্রিস্তোফ নামে আখ্যাত হয়েছে।

পৃষ্ঠা ৪৪

চেরতোভায়া উপত্যকা নামটা এসেছে 'চের্‌তা' থেকে 'চের্‌ত' থেকে নয়... — মূল রচনা ভাষায় কথার মারপ্যাঁচ। 'চের্‌তা' মানে 'রেখা' আর 'চের্‌ত্‌' মানে 'মন্দ আত্মা'।

পৃষ্ঠা ৪৪

...সারাতভ, তাম্বোভ... — সারাতভ, তাম্বোভ — রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত দুটি শহরের নাম।

পৃষ্ঠা ৪৫

...সম্রাট প্রথম পিওতর... — পিওতর প্রথম, পিটার দি গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫) — রাশিয়ার জার, বিশিষ্ট রাষ্ট্রকর্মী ও সেনানায়ক।

পৃষ্ঠা ৪৫

...পিওতর প্রথমত কেবল দাগেস্তানে ছিলেন... — দাগেস্তান — উত্তর ককেশাসের পূর্বাংশের এক সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ। বর্তমানে দাগেস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের এলাকা।

পৃষ্ঠা ৪৫

...জেনারেল ইয়েরমোলভের আদেশে... — ১৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ৪৬

...হে আমার নির্বাসিত... — লেরমন্তভ এখানে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁর সময় ককেশাস ছিল জার সরকারের বিরাগভাজন ব্যক্তিদের (কবি নিজেও তাঁদের একজন) নির্বাসনস্থল।

পৃষ্ঠা ৪৬

...বায়দারা... — বায়দারা — পার্বত্য নদী, তেরেকের ডান দিকের শাখানদী।

পৃষ্ঠা ৪৭

...নোব্‌ল্‌স ক্লাব... — অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজনের ক্লাব। এই ক্লাবের হলঘরে বলনাচের অনুষ্ঠান হত।

পৃষ্ঠা ৫৩

...বাইরন মাতাল ছাড়া আর কিছুই না। — বাইরন জর্জ নোয়েল গর্ডন (১৭৮৮-১৮২৪) খ্যাতনামা ইংরেজ কবি।

মাক্সিম মাক্সিমীচ

পৃষ্ঠা ৬১

...আমি তাড়াতাড়ি চললাম... ভ্লাদিকাভ্‌কাজ-এ। — কাজ্‌বেক — লেরমন্তভের সময় ভ্লাদিকাভ্‌কাজ থেকে ৪২ কিলোমিটার দূরে, ককেশাস পর্বতমালার অন্যতম উচ্চ শীর্ষ কাজবেকের পাদদেশে অবস্থিত স্টেশন। লার্‌স — ভ্লাদিকাভ্‌কাজের ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী স্টেশন। ভ্লাদিকাভ্‌কাজ — ১৭৮৪ সালে তেরেকে প্রতিষ্ঠিত দুর্গ। বর্তমানে ওর্জোনিকিজে শহর।

পৃষ্ঠা ৬১

...ইয়েকাতেরিনোগ্রাদ থেকে... — ইয়েকাতেরিনোগ্রাদ — উত্তর ককেশাসের অন্যতম বৃহত্তম নগর (বর্তমানে ক্রাস্নোদার শহর)।

পৃষ্ঠা ৬২

...ইয়েকাতেরিনোগ্রাদের পথে কাবার্দা অতিক্রম করে। — কাবার্দা — ২৬ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ৬২

...কার্ডিনালের মতো সাদা টুপি পরে... — কাজবেক (ওসেতিন ভাষা থেকে অনুবাদে অর্থ দাঁড়ায় 'ধবলগিরি') — বৃহৎ ককেশাস পর্বতমালার অন্যতম উচ্চ শীর্ষ (উচ্চতা ৫০৩৩ মিটার)।

পৃষ্ঠা ৬৩

...অনেকটা রুশী ফিগারোর মতো। — ফিগারো ফরাসী নাট্যকার পিয়ের বোমার্শের (১৭৩২-১৭৯৯) 'সেভিলের নাপিত' ও 'ফিগারোর বিয়ে' কমেডির মুখ্য চরিত্র — চটপটে, বুদ্ধিমান ভৃত্য।

পৃষ্ঠা ৬৩

...তিফ্‌লিস চলেছেন... — ১৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ৬৭

...বাল্‌জাকবর্ণিত... — ফরাসী লেখক ওনোরে দে বাল্‌জাকের (১৭৯৯-১৮৫০) 'তিরিশ বছরের মেয়ে' (১৮৩৪) উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর 'বাল্‌জাকীয় মেয়েমানুষ', 'বালজাকীয় বয়স' উক্তির চল হয়।

পেচোরিনের ডায়েরি

পৃষ্ঠা ৭৪

রুসোর স্বীকারোক্তির... 'স্বীকারোক্তি' — ফরাসী লেখক ও দার্শনিক জাঁ জাক রুসোর (১৭১২-১৭৭৮) আত্মজীবনীমূলক রচনা।

তামান

পৃষ্ঠা ৭৬

তামান — ককেশাসের পশ্চিম প্রান্তবর্তী প্রত্যন্ত নিম্নভূমির — তামান উপদ্বীপের উপকূলবর্তী জনবসতি (বৃহৎ কসাকপল্লী)।

পৃষ্ঠা ৭৭

কাল আমি গেলেন্‌জিকে যাত্রা করব। — গেলেন্‌জিক — কৃষ্ণ সাগরের তীরে, উত্তর ককেশাসের একটি শহর।

পৃষ্ঠা ৭৮

ক্রিমিয়ার তাতার, কের্চের এক মাঝি। কের্চ — কৃষ্ণসাগর ও আজভ সাগরের সংযোজক কের্চ প্রণালীর তীরবর্তী শহর।

পৃষ্ঠা ৭৯

সেই দিন অন্ধরা পারবে... — বাইবেলের বিকৃত উদ্ধৃতি ('এবং সেই দিন বধিরেরা শুনতে পাবে গ্রন্থের ভাষা আর অন্ধদের চোখ তমিস্রা ও অন্ধকার ভেদ করবে')।

পৃষ্ঠা ৮১

...ফানাগোরিয়া দুর্গের... — ফানাগোরিয়া — তামান উপদ্বীপের প্রাচীন নগর, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এর অস্তিত্ব ছিল। পরবর্তীকালে ককেশাস যুদ্ধের আমলে সেই স্থানে রুশ ঘাঁটি হিশেবে দুর্গ নির্মিত হয়।

পৃষ্ঠা ৮৩

...উন্ডিনা... — জার্মান লোককথার চরিত্র, রূপকথার জীব — জলকন্যা। সম্ভবত ১৮৩৭ সালে জার্মান ভাষা থেকে রুশ কবি ভাসিলি জুকোভ্স্কির অনূদিত প্রাচীন কাহিনী 'উন্ডিনা' প্রকাশিত হওয়ার পর এই চরিত্রটি লেরমন্তভের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পৃষ্ঠা ৮৪

এই আবিষ্কার তরুণ ফ্রান্সের। — তরুণ ফ্রান্স — ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পর রোমান্টিক ধারানুসারী ফরাসী তরুণ লেখকবৃন্দ নিজেদের এই নামে অভিহিত করেন।

পৃষ্ঠা ৮৪

...গ্যেটের মিননকে... — মিনন — জার্মান মহাকবি ও চিন্তাবিদ যোহান ভলফ্‌গাং গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) উপন্যাস 'ভিল্‌হেল্‌ম মেইস্টারের শিক্ষানবিসকাল'-এর (১৮২১-১৮২৯) নায়িকা।

রাজকুমারী মেরি

পৃষ্ঠা ৯৩

...গতকাল পিয়াতিগোর্স্ক-এ পেঁছৈছে... — পিয়াতিগোর্স্ক — উত্তর ককেশাসের একটি শহর, ককেশাসের খনিজ জলসমৃদ্ধ স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রগুলির (কিস্‌লোভোদ্‌স্ক, জেলেজনোভোদ্‌স্ক, এসেন্‌তুকি ইত্যাদি) একটি।

পৃষ্ঠা ৯৩

...মাশুক-এর পাদদেশে... — মাশুক — উত্তর ককেশাসের একটি পাহাড় (উচ্চতা ৯৯৩ মিটার)।

পৃষ্ঠা ৯৩

...পশ্চিমে পাঁচচুড়ো নীল বেশ্‌তুকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে... — বেশ্‌তু (বেশ্‌তাউ) — তাতার ভাষায় 'পাঁচপাহাড়' — উত্তর ককেশাসের অন্যতম উচ্চ পর্বত; এর পাঁচটি শীর্ষ আছে।

পৃষ্ঠা ৯৩

...'অন্তর্হিত ঝঞ্ঝার শেষ মেঘটির' মতো... — মহান রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) 'মেঘ' (১৮৩৫) কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তি।

পৃষ্ঠা ৯৩

...স্বাস্থ্যকর প্রস্রবণগুলো... খনিজ প্রস্রবণে সমৃদ্ধ পিয়াতিগোর্স্কের প্রস্রবণের কথা বলা হয়েছে।

পৃষ্ঠা ৯৩

...দু'চুড়ো এল্‌ব্রুস দিয়ে হয়েছে শেষ... এল্‌বোরুস বা এল্‌ব্রুস — বৃহৎ ককেশাস পর্বতমালার উচ্চতম সানুদেশ (পূর্ব গিরিশিখরের উচ্চতা ৫৬২১ মিটার, পশ্চিম গিরিশিখরের — ৫৬৪২)।

পৃষ্ঠা ৯৪

...আমার কোটের পিটার্সবুর্গ-ছাঁট... বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। — পেচোরিনকে প্রথমে তারা পিটার্সবুর্গের (পিটার্সবুর্গ তখন ছিল রাশিয়ার রাজধানী) বিশেষ অধিকারভোগী রক্ষিবাহিনীর কোন অফিসার বলে ভেবেছিল।

পৃষ্ঠা ৯৪

...ককেশাসে তারা আবিষ্কার করতে শিখেছে যে দস্তার বোতামের নীচে... — লেরমন্তভের সময় টুপি, পোশাকের বোতাম আর কাঁধপটি দেখে আর্মি ইউনিটের নম্বর জানা যেত। লেরমন্তভ এখানে বোঝাতে চাইছেন যে তাঁর সময় ককেশাসে এমন সমস্ত অফিসারের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত, জার

সরকার-বিরোধী কাজের জন্য যাদের রক্ষিবাহিনী থেকে আর্মি রেজিমেণ্টে অপসারণ করা হয়েছে (পেচোরিন এবং স্বয়ং লেরমন্তভের মতো) কিংবা সাধারণ সৈনিকের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে (১৮২৫ সালের ডিসেম্বরে রুশ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অনেকের ভাগ্যে যেমন হয়েছিল)।

পৃষ্ঠা ৯৪

...কলারের উপর বার করে রাখে... — অর্থাৎ সার্টের সাদা কলার। সামরিক পোশাক পরার সময় তার ভেতর থেকে সার্টের গলবন্ধনী বার করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল।

পৃষ্ঠা ৯৫

...এইওলিয়ান হার্প নামে... — এইওলিয়ান হার্প — তারের বাদ্যযন্ত্র, বাতাসের ঝাপটায় এ যন্ত্র থেকে ধ্বনি বেরোত (গ্রীক পুরাকাহিনীতে এইওল হলেন বায়ুদেবতা)। পিয়াতিগোর্স্কের উপকণ্ঠে বিশেষ ধরনের এক তাঁবুর মাথায় এইওলিয়ান হার্প রাখা হয়েছিল।

পৃষ্ঠা ৯৫

গ্রুশ্‌নিৎস্কি য়ুঙ্কার... — লেরমন্তভের সময় অভিজাত বংশের যে-সমস্ত তরুণ নিম্নপদস্থ সৈনিক হয়ে সামরিক বাহিনীর চাকুরীতে প্রবেশ করত কিন্তু বিশেষ অধিকারবশত সাধারণ সৈনিক থেকে বিশিষ্টরূপে গণ্য হত এবং শিক্ষানবিসপর্ব শেষ হওয়ার পর কিংবা যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য অফিসার পর্যায়ে উন্নীত হত।

পৃষ্ঠা ৯৫

...'সেণ্ট জর্জ ক্রস' — বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় সামরিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও সৈন্যদের সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য এই পদকে ভূষিত করা হত।

পৃষ্ঠা ৯৮

...ঠিক যেন রবিনসন ক্রুসোর! — রবিনসন ক্রুসো — ইংরেজ লেখক ডানিয়েল ডিফো (১৬৬০-১৭৩১) রচিত 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের নায়ক — নাবিক, বহু বছর নির্জন দ্বীপে বাস করে।

পৃষ্ঠা ১০৩

...এণ্ডাইমিয়নের সৌন্দর্যও... — এণ্ডাইমিয়ন — গ্রীক পুরাকাহিনীতে — সুদর্শন তরুণ, প্রেমের দেবী তার প্রেমে পড়েছিলেন।

পৃষ্ঠা ১০৩

বাইরনের মতোই... — ৫৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১০৩

...বলত মেফিস্টোফেলিস। — মেফিস্টোফেলিস — দানব, শয়তান, দুরাত্মা ও বিনাশশক্তির নামান্তর।

মেফিস্টোফেলিস — বহু সাহিত্যধর্মী রচনার চরিত্র, বিশেষত গ্যেটের (৮৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ) ট্র্যাজিডি 'ফাউস্ট'-এর।

পৃষ্ঠা ১০৪

...সিসেরোর উক্তিমতো... — প্রাচীন রোমের লেখক, বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ সিসেরোর (খ্রীষ্টপূর্ব ১০৬-৪৩) উক্তিমতো গণকরা গণনা করার সময় মানুষের সহজ বিশ্বাসপ্রবণতায় অবাক হয়ে গিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাত।

পৃষ্ঠা ১০৭

...জীবনের শেষের দিক তিনি মস্কোতে কাটিয়েছেন। — ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মস্কো রাশিয়ায় রাজধানী ছিল না, সেখানকার জীবনযাত্রা ছিল শান্ত।

পৃষ্ঠা ১০৭

...ইংরেজিতে বাইরন পড়েছেন... — ৫৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১১১

...সেই দণ্ড যা দিয়ে আর্কিমিডিস... — আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) — সুপ্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ, দণ্ডের নিয়মের উদ্ভাবক। তিনিই নাকি বলেছিলেন, 'একটা অবলম্বন পেলে আমি পৃথিবীকে স্থানচ্যুত করতে পারি!'

পৃষ্ঠা ১১৩

...**মাশ্‌কের চুড়ো দিয়ে**... — ৯৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১১৮

...**জার্মান উপনিবেশ**... — পিয়াতিগোর্স্ক থেকে জেলেজনোভোদ্‌স্কের পথে একটি জায়গার নাম।

পৃষ্ঠা ১১৮

...**বেশ্‌তু, জ্‌মেইনায়া, জেলেজ্‌নায়া আর লীসায়া'র**... — উত্তর ককেশাসের পর্বতমালার নাম।

পৃষ্ঠা ১১৮

...**চেরকেসীয় আর**...— রুশ নাট্যকার আলেক্সান্দর গ্রিবয়েদভের (১৭৯৫-১৮২৯) 'বুদ্ধি দুঃখ আনে' কমেডির মুখ্য চরিত্র চাৎস্কির একটি উক্তির অদল-বদল — 'ভাষার মিশ্রণেরও আধিপত্য আছে: ফরাসী ও নিঝনি-নোভ্‌গরদের ভাষার।' নিঝনি-নোভ্‌গরদ — রাশিয়ার কেন্দ্রবর্তী অংশের একটি শহর।

পৃষ্ঠা ১২২

নোব্‌ল্‌স ক্লাবের... — ৪৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১২২

...**ছোপ ছোপ দাগগুলো**... — অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৌন্দর্য-তিলকের খুব চল ছিল। তিলের মতো ক্ষুদ্রাকার কালো বিন্দু মুখে লাগানো হত। তাফ্‌তা — ঘন জমিনের রেশমী কাপড়।

পৃষ্ঠা ১২৬

...**যুঙ্কার ছিলাম**। — ৯৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১৩৯

কিস্‌লভোদ্‌স্ক — উত্তর ককেশাসের একটি শহর, ককেশাসের খনিজ প্রস্রবণযুক্ত স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্রগুলির একটি।

পৃষ্ঠা ১৪১

একদা পুশ্‌কিন... — লেরমন্তভ উদ্ধার করেছেন পাভেল কাতেনিনের (১৭৯৪-১৮৫৫) উক্তি; মহান রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭) তাঁর 'ইয়েভ্‌গেনি ওনেগিন' কাব্যোপন্যাসে কাতেনিনকে উল্লেখ করেন। পুশ্‌কিনের কৈশোরে কাতেনিন যে রেজিমেণ্টে চাকরী করতেন পরবর্তীকালে লেরমন্তভও সেখানে ভর্তি হন।

পৃষ্ঠা ১৪২

রিডার্স লাইব্রেরি — সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ১৮৩৪ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা; সরকারী রাজনীতির সঙ্গে মানিয়ে এবং বুর্জোয়া শ্রেণী ও আমলাসম্প্রদায়ের রুচি বুঝে পত্রিকাটি চলত।

পৃষ্ঠা ১৪২

...আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট কিংবা লর্ড বাইরনের মতো... — ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডার (৩৫৬-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) — সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। লর্ড বাইরন — ৫৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১৪৫

...যদিও খ্রীষ্টানদের মতো নয়। — খ্রীষ্টধর্মের দশটি নৈতিক অনুশাসনের একটি — শত্রুর কাছে অপদস্থ হলেও তাকে ক্ষমা করা।

পৃষ্ঠা ১৪৯

মিথ্যেই নারজানকে... শক্তিদায়ী ঝর্ণা লোকে বলে না। — উত্তর ককেশাসের বিখ্যাত খনিজ জলের প্রস্রবণ নারজান (নার্দ-সান্‌না), অনুবাদে যার অর্থ দাঁড়ায় 'মহাবলী-বারি'।

পৃষ্ঠা ১৪৯

...পদ্‌কুমক্‌-এ আছড়ে পড়তে। — উত্তর ককেশাসের নদী, এর তীরে পিয়াতিগোর্স্কের অবস্থান।

পৃষ্ঠা ১৪৯

'এই দুই কৌশল মেশাতে...' — গ্রিবয়েদভের (১১৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ) 'বুদ্ধি দুঃখ আনে' কমেডি থেকে সামান্য ভুল উদ্ধৃতি:

এই দুই কৌশল মেশাতে
নিপুণ অনেকে —
তবে আমি নই।

পৃষ্ঠা ১৫১

...অর্থের জন্য নিরো'কেও... — নিরো ক্লডিয়াস সীজার (৩৭-৬৮) — রোমের সম্রাট, দাম্ভিক, নৃশংস ও লম্পট।

পৃষ্ঠা ১৫১

'হৃদয়ের তিক্ত অন্তর্দৃষ্টি...' — মহান রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) 'ইয়েভ্‌গেনি ওনেগিন' কাব্যোপন্যাসের উৎসর্গপত্রের শেষ দুটি পংক্তি।

পৃষ্ঠা ১৫১

...'মুক্ত জেরুসালেমে'... — তোর্কুয়াতো তাসো (১৫৪৪-১৫৯৫) ইতালীয় মহাকবি। তাসোর কাব্য 'মুক্ত জেরুসালেম'-এর নায়ক নাইট তান্‌ক্রেদ এক মায়াপ্রভাবিত বনে প্রবেশ করে বজ্রগর্জন, অগ্নিশিখা ও অন্ধকারের সম্মুখীন হন।

পৃষ্ঠা ১৫২

পদ্‌কুমক্‌ — ১৪৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১৫৪

...ভ্যাম্পায়ারকে বুঝতে শুরু করি। — ভ্যাম্পায়ার — 'ভ্যাম্পায়ার' নামে ইংরেজিতে লেখা একটি ভয়াবহ কাহিনীর নায়ক। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা ও রহস্যজনক অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনায় পরিপূর্ণ এই কাহিনীটি ১৮২৮ সালে রুশ ভাষান্তরে প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা ১৬৮

...'ওল্‌ড মর্টালিটি'। — ওয়াল্‌টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) — বিখ্যাত ইংরেজ লেখক, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা, জাতিতে স্কচ্‌। 'ওল্‌ড মর্টালিটির' রচনাকাল — ১৮১৬।

পৃষ্ঠা ১৭৪

জুলিয়াস সিজারের কথা... — জুলিয়াস সিজার (১০০-৪৪

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) — প্রাচীন রোমের সম্রাট, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে সিনেটের দালানের অভ্যন্তরে নিহত হন। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, সিজার যে দিন নিহত হন সে দিন সিনেট যাবার পথে তিনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান; এই ঘটনাটি কুলক্ষণ বলে ব্যাখ্যাত হয়।

পৃষ্ঠা ১৭৪

এল্‌ব্রুস — ৯৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রঃ।

পৃষ্ঠা ১৭৫

...ভাগ্য নির্ণয় করতে... — অর্থাৎ মুদ্রা 'টস্‌' করে হেড-টেলের দ্বারা বিতর্কের মীমাংসা করা কিংবা কোন কিছুর পালা বা পর্যায় স্থির করা। অন্যান্য দেশের মতো রাশিয়ায়ও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

পৃষ্ঠা ১৮২

এসেন্‌তুকি — লেরমন্তভের সময়কার এই ক্ষুদ্র বসতিটি (স্টেশন) পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

পৃষ্ঠা ১৮৩

...ওয়াটারলুর পর নেপোলিয়ন যে-রকম ঘুমিয়েছিলেন... — লোকশ্রুতি অনুযায়ী, ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ওয়াটারলুর যুদ্ধের (১৮১৫ সালের ১৮ জুন) পর, অর্থাৎ ইংরেজদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর এতই শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি নিদ্রা যান।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow 119859, Soviet Union

'রাদ্যুগা' প্রকাশন

প্রকাশিত হল

আলেক্সান্দর গ্রিন। রাঙা পাল: গল্প ও উপাখ্যান

রোমাণ্টিক কথাশিল্পী আলেক্সান্দর গ্রিন (১৮৮০-১৯৩২) সাগরের স্বপ্ন দেখতেন, আর দেখতেন সুখ ও নির্মল উষার স্বপ্ন, তাঁর আস্থা ছিল বিশুদ্ধ প্রেমের অপার শক্তিতে। তিনি নিজে স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন এবং তাঁর নিজের কল্পনাশক্তির বলে এমন এক আশ্চর্য জগতের সঙ্গে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘটান, যেখানে মানুষের পূর্বনির্দিষ্ট উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস এবং ন্যায়বিচার জয়লাভ করে। আলেক্সান্দর গ্রিনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপাখ্যান, কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর হৃদয়গ্রাহী 'রাঙা পাল'-এর এই হল মূল বক্তব্য: আসল নামে যে মেয়েটি সাগর-উপকূলে বাস করত তার বিশ্বাস ছিল যে মানুষ যদি মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিতে পারে তাহলে সূর্যোদয়ের' আলোয় ঝলমলে রাঙা পালও রাঙায় থেকে যাবে।

সংকলনটিতে এই সঙ্গে তিনটি গল্পও স্থান পেয়েছি।

ম. লের্মন্তভ আমাদের সময়কার নায়ক

'আমাদের সময়কার নায়ক' উপন্যাসের ঘটনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ — ককেশাস এলাকা উপনিবেশিকীকরণের উদ্দেশ্যে সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীদের বিরুদ্ধে রুশ জারতন্ত্রের যুদ্ধের, অর্থাৎ ককেশাস যুদ্ধের (১৮১৭-১৮৬৪ সাল) সময়। পাহাড়ীরা — ওসেতিন, চেরকেস, কাবার্দিন, চেচেন এবং অন্যান্য জাতিসত্তা রুশ জার বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। ককেশাসের রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্তি জারসরকারের ঔপনিবেশিক রাজনীতি হওয়া সত্ত্বেও প্রগতিশীল তাৎপর্য সূচনা করে — এর ফলে ককেশাসের জাতিসমূহ তুরস্ক ও ইরানের পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কঠোর জোয়াল থেকে অব্যাহতি পেল।

তৎকালীন সমাজপদ্ধতির পাপকে প্রকাশ করে লেরমন্তভ সাধারণের চেতনার অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিলেন, আর এটাই হল 'আমাদের সময়কার নায়কের' প্রধান ঐতিহাসিক তাৎপর্য।



'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো